GHURNISROTE SRIGANI SONGRAGE :
A BOOK OF ESSAYS by ALOKERANJAN DASGUPTA

প্রথম প্রকাশ □ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯

প্রতিভাস-এর পক্ষে বীজেশ সাহা কর্তৃক ১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড
কলকাতা-৭০০০০২ থেকে প্রকাশিত, দিলীপ মুখার্জী কর্তৃক ডি. বি. প্রেস
৮২, কেশব সেন স্ট্রীট কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সুবিমল লাহিড়ী ও অরুণ দে

সংস্কারকের শিল্পচর্যা

শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' শীর্ষক যুগজীবনীতে ডিরোজিও বিষয়ে সমীক্ষণের শেষে স্বতঃসিদ্ধান্তের ভঙ্গিতে লিখেছেন, 'শিক্ষকশ্রেষ্ঠ ডিরোজিওর প্রতিভার জ্যোতির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া হিন্দু কলেজের যুবক ছাত্রগণ কিরূপ তাঁহাকে আবেষ্টন করিয়াছিল এবং তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়াছিল আশা করি তাহা সকলে এক প্রকার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন।' এই 'শিক্ষকশ্রেষ্ঠ' বা গুরুর 'প্রতিভার জ্যোতি'র স্বরূপ উন্মোচন করতে গিয়ে অবশ্যই তিনি টমাস এডোয়ার্ডস-এর প্রতিবেদন থেকে সাহিত্যশিক্ষক হিসেবেও ডিরোজিওর কৃতিত্বদ্যোতক অংশ উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু একবারও তাঁর স্বকীয় শিল্প-সত্তার উল্লেখ করেন নি।

বলা বাহুল্য, এই আদর্শ যুগপুরুষের মহিমার কোন অবমূল্যায়ন ঘটাতে চান নি অপর যুগপুরুষ শিবনাথ শাস্ত্রী। আসল কথা এই যে, ডিরোজিও তাঁর স্বকালে একজন সংস্কারক হিসেবেই সূচিহ্নিত হয়েছিলেন। আর তাঁর সেই ভূমিকা ছিল এতই ভাস্বর যে তাঁর বিচিত্রপথসঞ্চারী প্রতিভার অন্যতর পরিচয়টি তেমন করে চোখে পড়বার কথা ছিল না।

ডিরোজিওর কবিতা পড়ে আজকের পাঠকের কাছে প্রতিভাত হয়, এই কবিও সমকালের জন্যে তাঁর শিল্পীপরিচিতি প্রকাশ করতে চান নি তেমন। তিনি চেয়েছিলেন সমীপসময় তাঁকে সংগঠক হিসাবে জানুক এবং উত্তরকাল তাঁকে একজন কবি বলে মেনে নিক।

কবি ও সংস্কারকের এরকম বিভাজন আমাদের পরিচিত আর কোন সংগঠকের মধ্যেই আমরা দেখতে পাই না। উনিশ শতকের সর্বাগ্রণী সংস্কারকেরা শিল্পকে আপেক্ষিক মাধ্যমে পরিণত করেছিলেন। তাঁদের

কাছে শিল্প কোন স্বনির্ভর গরিমা নিয়ে মূর্ত হবার অধিকার পায়নি। সেই কারণেই ভাবতে অবাক লাগে, অকালমৃত্যুর আগেই কীভাবে কবি-কিশোর ডিরোজিও যুগসময়ের অপরাপর গঠনাত্মক উদ্যম-উদ্যোগ থেকে কবিতাকে বিবিক্ত করে নিতে শিখেছিলেন।

তাঁর প্রসঙ্গে অনেকেই রবার্ট সাদের অনুষঙ্গ এনেছেন। সাদের কবি-অভিপ্রায় ধরতে পারলে ডিরোজিওর স্বাতন্ত্র্যগুণ স্পষ্ট হবে। সাদে এক অর্থে একজন ভ্রান্ত ভারতপথিক ছিলেন। অলীক এক ভারতীয়তার সন্ধানে তিনি মগ্ন থেকে গিয়েছিলেন এবং বন্দিত অনেক ভারততাত্ত্বিকের মতই সেই স্বপ্নার্ত সন্ধানে এতটুকু চিড় লাগলেই তিনি ভারতীয়তাকে আঘাত করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। জর্জ বিয়ার্স সাদের এই বিপন্ন রোমাণ্টিকতা সম্পর্কে British Attitudes Towards India 1784-1858 (১৯৬১) নির্মোহ আলোচনা করেছেন। বিয়ার্স উল্লেখ করেছেন সাদের রচনায় সতীদাহ অথবা রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে কোলাহল কী বীভৎসতায় বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে, আমরা লক্ষ্য করি, প্রচলিত বহুবিধ প্রথা ও ব্যবস্থা সম্পর্কে চূড়ান্ত প্রতিরোধীর মনোভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও কবিতায় ডিরোজিও সেই সমস্ত ভাবাসঙ্গ এলেও কখনও ঘৃণার শিকার হন নি। 'দি ফকির অফ জঙ্গিরা' আখ্যানকাব্যের অন্যতম বিভাব সতীদাহ বিরোধিতা অথবা হিন্দুমুসলমান মৈত্রী যেভাবেই ব্যাখ্যাত হোক না কেন, রচনার কোন পর্যায়েই কবি তাঁর উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপিত হতে দেন নি। পল্লব সেনগুপ্ত যথার্থই বলেছেন, 'সহমরণের পূর্বে চিতাপ্রদক্ষিণ, বেদমন্ত্রপাঠ, স্ত্রী-আচার, মুখাগ্নি, ভবিষ্যদ্বাণী প্রমুখ যাবৎ ধর্মানুষ্ঠানের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি ডিরোজিও এঁকেছেন, যাতে তাঁর অভিনিবিষ্ট এবং পূর্ণায়ত একটি সামাজিক দৃষ্টির পরিচয় স্পষ্ট হয়' (ঝড়ের পাখি; কবি ডিরোজিও পৃ ২০)। এই 'পূর্ণায়ত' দৃষ্টি থাকার দরুনই প্রথানুগত সমাজের পুরোধাবর্গকে তিনি তিরস্কারে জর্জরিত করেন নি। পক্ষান্তরে সতীদাহ প্রথার নৃশংস ব্যবস্থাপকের বিশ্বাসের জগৎটিকেও অনন্যনিরপেক্ষ শিল্পলাবণ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই কাব্যের প্রথম সর্গের নবম স্তোত্রটি প্রধান ব্রাহ্মণের উদাত্ত উচ্চারণ হিসেবে স্মৃতিধার্য ঃ

> সূর্য! তোমার আলোর অয়নপথে
> কখনোও ছাখোনি এমন জ্যোতিষ্মতী
> আর কোন নারী যেজন অচিরে হবে
> সংবৃত এক অশর্ত বৈভবে ;
> শোনো সেবকের আর্তি ঊর্ধ্বপুরে,
> হে রাজন্ ঐ নীল দিগন্ত জুড়ে!
> ভ্রমণ্ডলের শীর্ষে কিরীট আর

এখন তোমার মুখের শোভা অপার,
তোমার দ্যুতি ও তোমার শক্তি আর
এই প্রহরের গরিমা আর তোমার
প্রতি আমাদের অর্চনানুষ্ঠান
মনে রেখে তুমি সুচির বিবস্বান্!
শোন সন্ততিবর্গের এ বিনতি
এ নারীকে দাও তোমার শরণাগতি।

সাদে যদি এই স্তোত্র রচনার ভার নিতেন, তাহলে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র সম্পর্কে শ্লেষাত্মক কিছু পংক্তি আমরা পেতাম ঠিকই, এবং তার দ্বারা এই ভয়াবহ প্রথার প্রবক্তাদের সম্পর্কে আমাদের বক্তব্যও চরিতার্থ হত সন্দেহ নেই, কিন্তু উচ্চাবচ নির্বিশেষে এরকম অসামান্য সহানুভূতির সৌন্দর্যে আমরা কখনোই অভিষিক্ত হতে পারতাম না।

এই সহানুভূতিই তাঁর কবিতার কেন্দ্রশক্তি, টমাস এডোয়ার্ডস-এর Henry Derozio rhe Eurasian Poet, Teacher, and Journalist (১৮৮৪) বই থেকে আমরা আঁচ করে নিতে পারি। তিনি এই প্রসঙ্গে 'প্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির সহানুভূতি' (Sympathy between Nature and Human Nature) সূত্রটি উপহার দিয়ে আমাদের জানিয়েছেন : 'আমাদের মনে হয় যে ডিরোজিওর কবিতা এক নিবিড় অনুভূতি ও আবেগে দ্রব্য হয়ে আছে। এরি সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে রয়েছে সুন্দর চিন্তনের ঐশ্বর্য-সম্ভার, হয়ত বা একটু বেশি পরিমাণেই অবাস্তব···সমস্ত প্রকৃত কবির সঙ্গে তার এই জায়গায় মিল দেখা যায় যে ডিরোজিও শুধু সঞ্চারী মর্জি-মুহূর্ত ও মানবজীবনের সঙ্গে পরিবর্তমান প্রকৃতির বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে আত্মীয়তা অনুভব এবং প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হন নি, সৃষ্ট সমস্ত কিছুর ভিতরে একটি সহানুভূতির সংযোগসূত্র পেয়ে গিয়েছেন। সেটাই প্রকৃতিকে ঘিরে মানবিক প্রেমের উষ্ণ কিরণজাল রচনা করে।' (পৃঃ ২০৩)

'দি ফকির অফ্ জাঙ্গিরা'র পিছনে ডিরোজিওর সংগৃহীত কিছু কাহিনী কাজ করেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু এই কাব্যকাহিনীর উদ্দীপন ও আলম্বন ভাগলপুরে দেখা গাঙ্গেয় নিসর্গ। এই নিসর্গকে শিশুর মতই ভালবেসে-ছিলেন তিনি এবং কাহিনীর নরনারী যেন তাঁর প্রিয় এই প্রকৃতি থেকেই সঞ্জাত হয়েছে। 'দি ফকির অফ্ জাঙ্গিরা'য় অবশ্যই একটি স্পর্শগ্রাহ্য কাহিনী-সূত্র রয়েছে, কিন্তু কবি-কাহিনীকার প্রায়শই গল্পের খেই যেন হারিয়ে ফেলেছেন আর তখন উপমাপ্লাবী বন পাহাড় কীট-পতঙ্গ নদী ও আকাশের অসম দাক্ষিণ্যকে ধরে রেখেছেন তিনি বিভিন্ন মাপের ফ্রেমে। কবিতায় এরকম ল্যান্ডস্কেপ তাঁর সময়ের আর কোন ভারতীয় কবির রচনায় আমরা দেখি না। ডিরোজিওর প্রকৃতিচিত্রণে একটি প্রধান বিশেষত্ব এর

অন্তর্লীন বিষাদযোগ। এই কারণেই তাঁর হাতে সন্ধ্যা বা রাত্রির চিত্রলহরী সহজেই ধরা দিয়েছে—

নিশীথের ছায়াপুঞ্জ নেমে আসে, গোধূলিও মরে,
পাখি উড়ে যায় তার পাতাঢাকা আশ্রয়বিবরে,
চন্দ্রলেখা উঠে আসে ম্লায়মান, শিশির পতন
আশীর্বাদের মত, আর গুণে রাখার মতন
অদূর গগনে শুভ্র, দীপ্র, ঝিকিমিকি তারা রয়,
চিন্ময় সুখের দ্বীপ, ক্ষমাস্পদদের দিব্যালয়।

(অগস্টের সন্ধ্যা / Evening in August)

সেমিকোলন দিয়ে বিভাজিত স্পষ্টরেখায়িত বিষণ্ণ হৃদয়ের এই মানচিত্রটি আমাদের ধরে রাখে। এই স্তব্ধতা প্রমাণ করে, স্তরে-স্তরে তাঁর বেদনাকে সুবিন্যস্ত করতে চেয়েছিলেন তিনি। চিত্রার্পিত আবেগের প্রত্যক্ষতা রচনায় এখানে উপমার অপব্যয় ঘটেনি এবং এরকম অনতিরেকের সাহায্যে তিনি আধুনিক পাঠকের হৃদয় জয় করে নেন। সদ্যোদ্ধৃত কবিতার শুরুতেই গঙ্গার স্রোতে মুকুরিত অস্তসূর্যের এই উপমাছবি আছে :

Smiling, like Hope's ray—and then it dies

আশার এই রেখা 'দি ফকির অফ জঙ্গিরা'র উপসংহারে 'অন্তিম রশ্মিপাত' (hope's latest ray/২-২২) হয়ে যখন এসেছে তখন 'Hope' শব্দটি 'hope' হিসেবে লেখা হয়েছে, আশা তার রূপকঋদ্ধি পরিহার করে একটি নশ্বর চরিত্রশরীর অর্জন করেছে। এরই মাঝখানে কখনও সূর্য কখনও চন্দ্রের কাছ থেকে এই রশ্মি ঋণ করা হয়েছে। এক-এক জায়গায় অরূপ রূপক ও উপমেয়কে দুই চরিত্রের সন্নিবেশে যুক্ত করা হয়েছে। এর সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ :

Hope's and the moon's rays quiver o'er them still (২-১০)।

আমার এক ডিরোজিওভক্ত তরুণবন্ধু রমাপ্রসাদ দে তাঁর বইটির এই জায়গাটির ঠিক নিচে 'সোনার তরী'র নিকষোপম পংক্তিটি লিখে রেখেছেন :

চঞ্চল আলো আশার মতন / কাঁপিছে জলে।

এই সাদৃশ্যের প্রতিভাস যতই তীব্র হোক, দুই কবির প্রতিভা বা প্রবণতার মধ্যে তুলনায়নের প্রলোভন অচিরেই নিবৃত্ত হতে বাধ্য। ডিরোজিওর নিরুদ্দেশ যাত্রায় স্বগত স্বভাবের নিঃশর্ত সমর্পণ নেই। সন্দেহ নেই, প্রথম-পর্যায়ী রবীন্দ্রনাথের মতই তাঁর কবিতায় রাত্রির এলাকা ও নৈরাশ্য-বিবেকের ক্ষমতা প্রসারিত হয়ে চলেছিল, কিন্তু ডিরোজিও বারংবার তাঁর নষ্ট নিরাশাকে অত্যন্ত বিশদভাবে বুঝতে চেয়েছেন এবং সেই কারণেই ঐ আবেগের দ্বারা অধিকৃত হবার মুহূর্তে তাকে সমান্তর কয়েকটি চূর্ণালেখ্যে পরিণত করেছেন। একথা ঠিকই, কোনো মতবাদের ক্রীড়নক করে তিনি তাঁর

নৈরাশ্যনিসর্গকে ব্যবহার করেন নি। হিন্দু কলেজ থেকে বিতাড়নের পর উইলসনকে তিনি তাঁর দ্রাঢ়িষ্ঠ অজ্ঞেয়বাদের ধরনটি এভাবে জানিয়েছিলেন: 'বিশ্বাস করুন আমার মনে মিশে আছে এক অনপনেয় মানবিক অজ্ঞতার বোধ আর বিভিন্ন ধ্যানধারণার চিরন্তন বিপর্যয়ের ব্যাপারটি। এর ফলে তুচ্ছতম বিষয় সম্পর্কেও যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমি কোন রায় দিতে পারি না। সংশয় আর অনিশ্চয়তা আমাদের মানস এতই জুড়ে রয়েছে যে পাথুরে কোন তাত্ত্বিকতাকে সন্ধানী মনে অনুপ্রবেশের অধিকার দেওয়া সম্ভব নয়। (২৬ এপ্রিল, ১৮৩১)।' এই 'মানবিক অজ্ঞতা' তাঁর কবিতার মর্মে-মর্মে ওতপ্রোত হয়ে আছে। তাকেই তিনি তাঁর স্বল্পায়ত-শিল্পজীবনে নিপুণ মিতালেখ্যের সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করেছেন। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথের কাছে অনুরূপ ভাবনা কখনই নিয়ন্ত্রীর মর্যাদা পায় নি, তিনি কবিস্বভাবের দুজ্ঞেয় রূপান্তরের ছন্দে তাকে অনবরতই ক্রমবিসারী বিবর্তনের দিকে নিয়ে গিয়েছেন।

স্বদেশবিষয়ে প্রাণিত অথবা তাঁর ছাত্রদের জন্যে প্রণীত সনেটগুলিতে ডিরোজিও তাঁর শিল্পভাবনার দৃপ্ত কিছু নিদর্শন রেখে গিয়েছেন। কিন্তু এসব ক্ষেত্রেও সংস্কারকের 'প্রভুসম্মিত' ভূমিকা তিনি প্রদর্শন করেন নি। আশা-নিরাশায় স্পন্দমান এই সব কবিতায় ধরা আছে সৎ শিল্পীর সৌজন্য। এদের মধ্যেও এই শিল্পীর স্বভাবসুলভ সহানুভূতির ছাপ অব্যক্ত থাকে নি। বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হৃদয়কে সনাক্ত করার এরকম সুবিনীত উদাহরণ আমাদের পরিচিত দেশাত্মবোধক বা উপলক্ষভিত্তিক কবিতায় খুব বেশি নেই। কিন্তু মহৎ শিল্পী বিষয় এবং বিষয়ীকে মিলিয়ে দেবার পরেও তদ্গত ও স্বগত যাবতীয় বর্গীকরণ অতিক্রম করে অন্যতর উত্তরণের দিকে চলে যান। ডিরোজিওর বাইশ বছরের শীর্ণায়ু জীবনের কাছে মহত্ত্বের সেই প্রত্যাশা অবশ্যই শিল্পসম্মত নয়।

এক ঔপনিবেশিক শক্তি
ও ভারতীয় সৃজনশক্তির দুটি মাত্রা

প্রতিটি ঔপনিবেশিক শক্তিই স্বীয় স্বার্থে দীর্ঘমেয়াদী কিছু মনস্তাত্ত্বিক পন্থা অবলম্বন করে। বোধহয় সাম্রাজ্যপরায়ণ ইংরেজরাই এ ব্যাপারে সর্বাগ্রণী ছিলেন। বলপ্রয়োগ করে যে ক্ষমতা এ'রা আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন, ছলে-কৌশলে তাকে বজায় রাখার পদ্ধতিটি করায়ত্ত করতেও এ'দের বিশেষ কোনো অসুবিধে হয়নি। এ ব্যাপরে তাঁদের ভাবনাচিন্তার ঘরানা অনেকদিন ধরেই রপ্ত ছিল। ব্রিটিশ ভাবুকেরা তাঁদের আপাতঅরাজনৈতিক চিন্তনেও এর একটা জমিন তৈরি করে রেখেছিলেন। সহজেই হাতের কাছে এই প্রণোদনার প্রধানতম দীক্ষাগুরু ফ্রান্সিস বেকনকে (১৫৬১-১৬২৬) আমরা পেয়ে যাই। এ'রই জীবদ্দশায় রাণী এলিজাবেথের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদ (১৬০০) প্রণীত এবং জেম্‌সের আমলে (১৬০৩-২৫) 'আমাদের নেশনের মর্যাদা ও আমাদের জনগণের সম্পদের' সৌজন্যে প্রাথমিক পনেরো বছর থেকে অনন্তকালে প্রসারিত হয়। ইতিহাসের বিজন দলিল না ঘেঁটেও আমরা লক্ষ করি, ঐ সময়েই বেকন তাঁর নিখিল বীক্ষা 'নোভা আটলাণ্টিসে'র পত্তন করেন। ঐ বীক্ষণে সর্ব মানবের বাসনার দ্বন্দ্বমুক্ত চরিতার্থতা এবং গঠনাত্মক রাজনীতির আওতায় সারা বিশ্বে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারের প্রতিশ্রুতি ছিল। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় ঐ গঠনাত্মক রাজনীতির এলাকা ও ধরন সংজ্ঞায়িত করবার ভার তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর দেশবাসী ইংরেজদের উপরেই ন্যস্ত করেছিলেন। তাঁর ঐ সময়ের বিবিধ গূঢ়পরামর্শে কান পাতলে স্পষ্টই ঠাহর করা যায় ইংরেজদের তিনি মানবজাতির ভাগ্য-বিধাতা ঠাউরে নিয়েই স্বস্তি পাননি. কীভাবে ঐ ক্ষমতায় কায়েমী থেকে যাওয়া সম্ভব, সেই মর্মে, বেশ কিছু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নিবন্ধে নানাবিধ রীতি পদ্ধতিও বাৎলে দিয়েছেন। 'বিষয়ের পতনঅভ্যুদয়' (Vicissitudes of Things) শীর্ষক সন্দর্ভের দ্বিতীয় পাঠে আমরা টের পেয়ে যাই, কল্যাণকর

উচ্চারণের আড়ালে যে-প্রবর্তনা লুকিয়ে আছে সেটি ঔপনিবেশী। সামাজিক রূপান্তরের মুখে যে সমস্ত সম্প্রদায় ও ভাবগোষ্ঠী উদ্ভূত হয় তাদের সংস্কার-সাধনের জন্য তিনি অতীব নিপুণ কৌটিল্যের বিধান করেছিলেন : 'নতুন সব সম্প্রদায়' গোষ্ঠী প্রতিহত করবার শ্রেষ্ঠ উপায় হল পুনর্বিন্যাস... মৃদুভাবে এগোনো, নিষ্ঠুর হানাদার না হয়ে, হিংসা ও তিক্ততায় উত্তেজিত না করে, তাদের প্রধান প্রণেতাদের সৌজন্যমূলকভাবে জয় করে নেওয়া।

কার্ল মার্কস, যিনি সিপাহীদের সহজাত বর্বরতা এবং সিপাহীবিদ্রোহ দমনকারীদের পরিকল্পিত নৃশংসতা দুয়েরই প্রতিবেদন দিয়ে গিয়েছেন, তাঁর ভারতইতিহাসের অনুপুঙ্খ বিবরণীতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পৌঁছিয়ে দুটি বাক্যে, মন্তব্য ছাড়াই, সৌজন্যমূলকভাবে জয় করে নেওয়ার বৃত্তান্ত ধরে রেখেছেন : 'দোসরা অগস্ট লর্ড স্টানলির আয়োজিত ভারত বিল প্রবর্তনের ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পালা শেষ হল। আর ভারতবর্ষ হল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সাম্রাজ্যের একটি অঞ্চলে পর্যবসিত।' অন্যত্র, ভারতীয় অভ্যুত্থানের বিশদ আলেখ্য আঁকতে গিয়ে মার্কস অনেকক্ষণ টমাস ব্যাবিংটন মেকলের (১৮০০-১৮৫৯) নামটিতে থমকে দাঁড়িয়েছেন, ভাবতে চেষ্টা করেছেন, ইনি কেমন ধরনের কূটনীতিজ্ঞ। গভর্ণর জেনারেলের উপদেষ্টা হিসেবে তাঁর প্রণীত ভারতীয় শান্তিসংবিধান মার্কসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৮৮৮-র হুইগ বিপ্লব এবং ১৮৩২-র হুইগ রিফর্ম বিলের সমর্থক মেকলে কীভাবে হঠাৎ টোরিদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলেন, সে বিষয়ে তিনি দ্রুত মনস্থির করে নিতে পারেননি। আসল কথা, একদা প্রগতিশীল প্রবণতা কী করে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হয়ে ওঠে, সে সম্পর্কে বেশিক্ষণ মাথা ঘামানোর সময় তিনি পাননি। কিন্তু মার্কসের রচিত ভারতীয় ইতিহাসের পাঠক ওই প্রসঙ্গে মার্কসের অস্বস্তি অনায়াসেই লক্ষ করবেন। বঙ্কিমচন্দ্র এক্ষেত্রে তাঁর 'মেকলে রেটরিকের পঞ্চম লাগাইয়া জিতিয়া গেলেন' মন্তব্যে কার্ল মার্কসের মনের কথা ব্যক্ত করে থাকবেন।

এই মেকলে, ফ্রান্সিস বেকনের স্বকপোলকল্পিত ভাবশিষ্য, ১৮৩০ থেকে হাউস অফ কমন্সের ক্ষুরধার বক্তা হিসেবে অর্জিত সুনামের ভিত্তিতে, প্রথমে ভারতসংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ পরিষদের সদস্য (১৮৩২) এবং পরবর্তীকালে সুপ্রীম কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়ায় (১৮৩৪) বিশিষ্ট নিয়ামক হয়ে উঠেছেন। ইনিই ব্রিটিশ এবং ভারতীয় ইণ্টেলিজেন্সিয়ার ঘোষকের ভূমিকায় কার্ল মার্কস অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের বিপন্ন বিস্ময়ের আধার ('মেকলের এসের পরিশিষ্ট লিখিয়া দিলে আপনার কার্য হইতে পারে কি? সেও নবেল বটে'—কমলাকান্ত)। সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক, যদিও কৌতুকাবহ, তথ্য হল এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র এঁরই পথে বিসর্পিত হয়ে গিয়েছেন। যাকে আমরা সমালোচনা করি, তারই চরিত্রলক্ষণ আমাদের উপর বর্তায়, এই লোকধারণা যদি অংশতও গ্রহণ করি, তাহলে

নিঃসন্দেহে বলা যায়, বঙ্কিমের ধ্যানধারণার ক্রমবিবর্তনে টমাস ব্যাবিংটন মেকলে প্রধানতম নিয়ামক প্রাণপুরুষ। মেকলে, বঙ্কিমের মতোই, ইতিহাসকে প্রগতি ও আত্মসংরক্ষণের অন্তর্বর্তী এক সুবিধাজনক সামঞ্জস্য হিসেবে দেখেছেন। সতেরো শতকের বুর্জোয়া বিপ্লবের ভিতরে মেকলে এবং বঙ্কিম তাঁদের সামগ্রিক আশা-ভরসা ন্যস্ত করেছিলেন। মেকলে ঐ বৈপ্লবিক শতকের প্রাণবন্ত মুখপাত্র হিসেবে 'পরম প্রীতি ও শ্রদ্ধার জন মিল্টনের পারমিতা ও প্রতিভা'র বন্দনাগান করেছিলেন। এই মিল্টন, মেকলের ভাষায়, 'কবি, রাষ্ট্রদূত, ইংরেজদের স্বাধীনতার গরিমায় শহিদ'। তাঁর প্রতি নিবেদিত স্তোত্রগীতি, মেকলের মনে হয়েছিল, বর্তমান যুগের শান্তি ও শৃঙ্খলার পূর্ব-শর্ত বলে বিবেচিত হতে পারে। 'এ ছিল এক বিপ্লব, যা উনিশ শতকের সংরক্ষণশীল ইংল্যান্ডের নিরাপত্তাপ্রিয় বুর্জোয়া মানসের আবহভূমিকা।' এখানে একটি নতুন প্রস্থানকোণ সূচিত হল যা ভারতবর্ষের নিয়তিকে বিভাবিত করেছে। যে-ভাবুক শুরুতে মুক্তি ও বিপ্লবের জয়গাথা উচ্চারণ করেছেন, তিনিই পরবর্তীকালে, ভারতবর্ষে নিজের দেশের ঘাঁটি দৃঢ়তর করে তুলবার প্রয়োজনে চূড়ান্ত রক্ষণশীল হয়ে উঠেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এলিজাবেথীয় সনদে 'আমাদের জনগণ' (our people) বিষয়ে যে স্বার্থিক শুভাকাঙ্খা ব্যক্ত হয়েছিল, তারই জের ধরে, সাহিত্যসমালোচক তথা কূটনীতিক মেকলে এগিয়ে গেলেন। যে-সনদে ভারতবর্ষকে নিয়ে তাঁর উত্তীর্ণ আখ্যায়িকাগুলি লিখেছেন, তাঁরই সমালোচনা মুখর হয়ে মেকলে বারংবার 'জনগণ' ('the people') বিষয়ে অবান্তর, অথচ উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে প্রাসঙ্গিক, বাগ্‌জাল বুনে গিয়েছেন। এই 'জনগণে'র কাজ, তাঁর ভাষায়, নবলব্ধ 'সম্পত্তি রক্ষা' এবং 'মূলধনের দিকে নজর রাখা যার ফলে মুনাফা আসতে পারে।' ঐ সম্পত্তি বা মূলধন যে ভারতবর্ষ, সে বিষয়ে কোনো সংশয় উত্থাপনের সুযোগ নেই। আমাদের বক্তব্য, ভিক্টোরীয় যুগের অন্যতম প্রধান সাহিত্যসমালোচক ক্রমশ কীভাবে সাহিত্যভাবনাকেও তাঁর সাম্রাজ্যসন্ধিৎসার কাজে লাগিয়েছেন। এখানে সমস্ত ব্যাপারটিকে মৃদু করে এ পর্যন্ত বলা যায়, শুধুমাত্র সাহিত্যচর্চা অথবা সাহিত্যের মাধ্যমেই মানুষের মুক্তি নেই, কোনো লক্ষ্যের সঙ্গে তাকে সম্পৃক্ত করতে হবে, মেকলের এই আগ্রহ বঙ্কিম তথা আমাদের উনিশ শতকীয় অধিকাংশ লেখকের আরাধ্য হয়ে থাকবে। ঐ লক্ষ্য, মেকলের ক্ষেত্রে, যে অতিশয় সংকীর্ণ ছিল, ফ্রান্সিস বেকন থেকে আরম্ভ করে একাধিক ব্রিটিশ ডিপ্লোম্যাটের ঘরানায় উৎপন্ন হয়েছিল, সেদিকে কারুরই তেমন চোখ পড়েনি। এই প্রেক্ষিতেই মেকলের 'শিক্ষাসংক্রান্ত প্রস্তাবনা'র (২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৫) শেষ অংশটি বিচার্য :

> আপাতত আমাদের কাজ হবে দোভাষী-ব্যাখ্যাতার (interpreter's) শ্রেণী প্রস্তুত করা যা আমাদের এবং আমাদের শাসিত কয়েক মিলিয়ন মানুষের মধ্যে

> যোগসূত্র তৈরি করবে। এই শ্রেণীর মানুষেরা হবে রক্তে ও বর্ণে ভারতীয়, কিন্তু প্রবণতা, মতামত, নীতি ও ধীশক্তিতে ইংরেজ। এদেরই উপর আমরা এই দেশের মাতৃ-উপভাষার ('the vernacular dialects') পরিমার্জনা ও সমৃদ্ধির দায়ভার ছেড়ে দেব।

প্রধান মাতৃভাষাগুলিকে উপভাষা বলে চিহ্নিত করবার স্পর্ধা এখানে যত প্রখরই হোক, ইংরেজি শিক্ষার প্রতি ঐকান্তিক অনুরক্তির তাড়নায় সেদিন কেউ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেননি। বরং বঙ্কিম যখন মেকলেকে আক্রমণ করেছেন, তখন মেকলের পূর্বপ্রতিজ্ঞার ('wher we pass from works of imagination to works in which facts are recorded and general principles investigated, the superiority of the Europeans becomes absolutely immeasurable') প্রতিধ্বনি করেই বলে উঠেছেন, 'আমি অনেকবার বলিয়াছি, ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান ইতিহাস শিল্প শেখ। আর সব দেশীয়দের কাছে শেখ।' এখানে আমাদের যা আরো বিভ্রম বাড়ায়, সেটা হল এই যে, মেকলের প্রস্তাবনা প্রণীত হবার দশ বছর আগেই 'বিধাতার কাছে পশ্চিমের উন্নত এবং উদ্দীপিত দেশগুলির' দ্বারা অনুপ্রাণিত হবার আকাঙ্খায় লর্ড আমহার্স্টকে লেখা চিঠিতে সংস্কৃত ভাষাকে এই মর্মে বরবাদ করেছেন।

> 'খাদ্য' বলতে আহার বোঝাচ্ছে, 'খাদন্তি' বলতে পুরুষ (he) বা নারী (she) বা ক্লীব সত্তা আহার করছে, এটাই ব্যক্ত হচ্ছে, এবং প্রশ্ন উঠছে, 'খাদন্তি'কে সর্বাত্মক করে ধরলে কি পুরুষ, নারী, বা ক্লীবলিঙ্গ আহার করছে নাকি স্বতন্ত্রভাবে ধরলে শব্দের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অংশ দ্যোতিত হচ্ছে ? ইংরেজি ভাষায় যদি কেউ প্রশ্ন করত 'eat' শব্দের মধ্যে কতোখানি অর্থ নিহিত আছে, এবং অন্ত্য 's'-এর মধ্যেই বা সেই অর্থ কতোদুর প্রসারিত হচ্ছে, স্বতন্ত্র অথবা সংযুক্ত ভাবে ধরলে সমগ্র অর্থ বেরিয়ে আসছে কিনা।

বঙ্কিম রামমোহনকে যে ছেড়ে কথা বলেননি তার প্রমাণ কমলাকান্তের জল্পনা। 'ফল কথা, যখন আমি নিজে হি কিংবা শী তাহার স্থিরতা কি প্রকারে হইবে। যদি চন্দ্র হি হয়েন, তো আমি শী—কেননা, আমার সহিত চন্দ্রের ভালোবাসা জন্মিয়াছে। এবং আমার চন্দ্রকে বিবাহ করিতেই হইবে। আর আমি যদি প্রকৃত একজন কমলাকান্ত চক্রবর্তী হই, তাহা হইলে চন্দ্র শী। চন্দ্র বিলাতীয় মতে শী। আমি তাহা হইলে চন্দ্রকে বিলাতীয় মতে পাণিগ্রহণ করিব।' এই কৌতুকী স্বগতোক্তির মধ্যে সত্যটিই বিশদ হয়ে আছে যে ইংরেজ শাসনকে উপলক্ষ করে একরকম চন্দ্রোদয় ঘটেছিল এবং কমলাকান্তেরা তার শামিল্‌ হয়েছিলেন। এখানে আরো একটি সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক হবে না, বঙ্কিম ঐ উদিত চন্দ্র অথবা প্রতিপক্ষের কাছ থেকে অস্ত্র ঋণ করেই তার উপর আঘাত হেনেছেন।

কার্ল মার্কস ইংরেজদের স্বার্থপ্রণোদিত ছলাকলার নির্দয় সমালোচনা করলেও ভারতবর্ষে তাদের দ্বারা সংঘটিত **সামাজিক বিপ্লবের** মূল্য খারিজ করে দেননি। ব্যক্তিগত সম্পত্তিভাবনা উদ্যোগপ্রকল্প প্রতিযোগিতা এবং বাজারে অর্থনীতির প্রবর্তনা ঘটিয়ে ইংরেজরা যে ভারতবর্ষের স্বনির্ভর, কুটিরশিল্পসাপেক্ষ পারিবারিক সংস্থাব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করেছিল, এই তথ্যটি কবুল করে নিয়েই মার্কস বলেছেন, 'নীচতম স্বার্থচিন্তার দ্বারা প্ররোচিত হয়েই এবং নির্বোধের মতো তার প্রয়োগ ঘটিয়েই হিন্দুস্থানে সামাজিক বিপ্লব সূচিত করেছিল। কিন্তু সেটা এখানে মূল প্রশ্ন নয়। মূল প্রশ্ন হল এই যে, মানবতা কি এশিয়ার সামাজিক পরিস্থিতিতে মৌল বিপ্লব সংঘটিত না করে তার নিয়তি চরিতার্থ করতে পারবে? যদি নাও পারে, ইংলণ্ডের অপরাধ যতই গুরুভার হোক না কেন, এই বিপ্লব ঘটিয়ে ইংলণ্ডই ইতিহাসের অসচেতন মাধ্যম হয়ে উঠেছিল।' ধরে নিতে অসুবিধে নেই, সনাতন বা মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষেও, সামাজিক শ্রেণীবৈষম্যের দরুণ কোনো স্বর্ণিল বৈপ্লবিক সম্ভাবনা ছিল বলে মার্কস মনে করতেন না। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'আমি তাঁদের দলে নই, যাঁরা হিন্দুস্থানের স্বর্ণযুগে বিশ্বাস করেন ···উদাহরণত, ঔরঙ্গজেবের সময়; অথবা সেই কালপর্ব যখন মুঘলেরা উত্তরে এবং পোর্তুগীজেরা দক্ষিণে আবির্ভূত হয়েছিল; অথবা ঐশ্লামিক অনুপ্রবেশ এবং দাক্ষিণাত্যের সপ্ততন্ত্রের (এগারো শতকে মুসলিম বহিঃশক্তির আক্রমণের আগে দক্ষিণে সামন্ততান্ত্রিক বিক্ষিপ্ত রাজ্যপুঞ্জ) যুগ; এমন-কি আরো পিছিয়ে নিয়ে সেই ধূসরিম প্রাক-সময়, ব্রাহ্মণদের পৌরাণিক কালক্রমের পর্ব যা ভারতীয় দুর্দশাকে খৃস্টপূর্ব বিশ্বসৃষ্টির পর্যায়ে পিছিয়ে দিয়েছে ।' মার্কসের এই চিন্তাধারার সঙ্গে স্বভাবতই বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় ছিল না। কিন্তু তিনি যে অতীত ভারতবর্ষে একটি স্বর্ণযুগের অভিক্ষেপ ঘটিয়েছিলেন, তা-ও মার্কসকথিত ঐ সামাজিক বিপ্লবের দৌলতেই। যদি তাঁর সামনে ভিক্টোরিয় অথবা সন্দীপনকালের (Age of Enlightenment) কোনো মডেল না থাকত, তাহলে তাঁর পক্ষে সে কাজ আদৌ সম্ভব হত না।

মার্কসের ভারতসমীক্ষার পর্যালোচনা করলে এই সিদ্ধান্তে নীত হওয়া সম্ভব, ব্রিটিশ শাসনের পরিণত পর্যায়ে ভারতীয় ভাবুকের কাছে একটি বিশ্বরূপ (Weltbild) প্রতিভাত হয়েছিল। ঐ বিশ্বরূপ প্রতীচীপরায়ণ। ভারতবর্ষে 'ইংলণ্ডের উদ্দিষ্ট দ্বিমুখী: ধ্বংসাত্মক এবং পুনর্বিন্যাসধর্মী— এশিয়ার সমাজবিধি চূর্ণ করে দেওয়া এবং এশিয়ায় ইয়োরোপীয় সমাজব্যবস্থার বস্তুভিত্তির নির্মাণ,' মার্কসের এই উক্তিটি যতই পক্ষপাতদুষ্ট মনে হোক না কেন, তার তাৎপর্য আমরা অস্বীকার করতে পারি না। রামমোহন থেকে শুরু করে আমাদের যাবতীয় চিন্তানায়কই পশ্চিম প্রেরিত 'জ্ঞানোদয়ের' ('the dawn of knowledge) পোষকতা করে এসেছেন। এই ঔদার্য কোনো হীনম্মন্যতার

পরিচায়ক নয়। ইতিহাসের আধুনিক পর্বে প্রায়শই দেখা গিয়েছে, এক একজন দেশপ্রেমী ভাবুক আচমকা, স্বদেশীয় ঐতিহ্যকে নতুন প্রাণবেদনায় আক্রান্ত করবার অভিমুখিতায় ভিন্নদেশী সংস্কৃতির কাছে আঁজলা পেতে রেখেছেন। পুশকিনকে রুশ সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনের গরজেই ইংরেজি সাহিত্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়েছে। হোল্ডারলীন জার্মান সাহিত্যের স্থিতাবস্থা টলিয়ে দেবার মানসে গ্রীক নন্দনতত্ত্ব থেকে ফরাসি বিপ্লব পর্যন্ত মানচিত্র এঁকেই ক্ষান্ত হননি, সে সব উৎস থেকে গোটা জীবন অমেয় প্রীতিপ্রেরণা আহরণ করে নিয়েছেন। রিলকেও, একই আগ্রহে, শুধু লিও টলস্টয়ের বই বা ব্যক্তিত্বেই নয়, রাশিয়ার অগণ্য সাধারণ মানুষের কাছে দীক্ষা নেওয়ার আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। এই প্রবণতার রূপরেখা এমন-কি 'রাশিয়ার চিঠি' পর্যন্ত অনায়াসেই আঁকা যেতে পারে। এঁরা প্রত্যেকেই বিশ্বসাহিত্যের প্রথম সারির নাগরিক, এক অর্থে বিশ্বনাগরিক যাঁরা তাঁদের জীবনে ও শিল্পায়নে তুলনামূলক সাহিত্যের সৃজনী প্রযুক্তি রূপবন্ত করে তুলেছেন। এই কঠিন কাজে এঁরা দেশজ ঐতিহ্য এবং দেশাচার অথবা পরম্পরাগত প্রথার মধ্যে একটি ভেদরেখা টেনে প্রতিপন্ন করেছেন, ঐতিহ্যের মধ্যে সমকালের প্রবাহ অনায়াসে অন্বিত হয়ে যায়, প্রথার ভিতরে নয়। আরো এগিয়ে হয়ত বলা চলে, ঐতিহ্যের সপক্ষে এবং প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার প্রয়োজনবোধেই এই লেখকেরা স্বদেশ এবং বিশ্বদেশের মধ্যে সম্পর্করচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন।

এখানে নিঃসন্দেহে এরকম আপত্তি পোষণ করা সম্ভব, পুশকিন হোল্ডারলীন কি রিলকে, কেউই দেশের অঙ্গনে উপচে-পড়া ঔপনিবেশিক কোনো শক্তির সংস্পর্শে আসবার ফলে বহির্বিশ্বের দিকে তাকাননি। নিজেদের সৃষ্টি ও চতুষ্পার্শ্বিক সমাজসংস্কৃতির পরস্পরস্পর্শী সন্ধিক্ষণেই তাঁরা স্বযাচিতভাবে নিজেদের দেশসত্তার মানচিত্র বাড়িয়ে নিয়েছেন। আমাদের দেশের পটভূমিতে ব্রিটিশ রাজ্যের প্রতিপত্তি শিকড়িত হবার আগে থেকেই যদি মনস্বী শিল্পীরা সেরকম স্বাধীন নির্বাচনের পরিচয় দিতেন, তাহলে কিছুই বলার থাকত না। কিন্তু এখানে তাঁদের সংবেদনশীল চৈতন্যের প্রতি অবমাননা না করে বুঝতে হবে, কেন তাঁরা ইংরেজি তথা ইয়োরোপীয় অভিভাবের দ্বারা আলোড়িত হয়েছিলেন। ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে স্বদেশের ইতিবৃত্তের বিভিন্ন পর্যায় মন্থন করে তাঁদের নিশ্চয়ই মনে হয়েছিল, ইংরেজ শাসনকে উপলক্ষ করে এমন-একটি বৃহত্তর শক্তি ঘুমন্ত স্বদেশে এসে আশ্রয় চাইছে, যাকে বরবাদ করে দিলে ইতিহাসের ঘড়ির কাঁটা পিছন দিকে ঘুরিয়ে দেবার নামান্তর হয়। মনে রাখতে হবে, এঁদের মধ্যে কেউই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে রায় দেননি। বরং মননে-কথনে সব সময়েই স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন তাঁদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আসলে মার্কস যে বলেছেন, ইংরেজদের অজ্ঞাতেই, তাঁদের অছিলা করে, একটি ক্রান্তিকাল ঘটে গেল, সেদিকেই তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল।

সেই সঙ্গে ছিল অনির্ণেয় আবহাওয়ার মুখাপেক্ষিতা। 'প্রোমেথেউস আনবাউণ্ডের' ভূমিকায় শেলি যে অর্থে কবি, দার্শনিক, চিত্রশিল্পী, ভাস্কর ও সংগীতজ্ঞদের শেষ পর্যন্ত 'যুগের সৃষ্টি' বলে শনাক্ত করেছেন, যে নিয়মের কবল থেকে মহত্তমদেরও অব্যাহতি নেই বলেছেন, এখানে সেই শিল্পনিয়মের অমোঘতার কথাটাও এসে যায়। এরই দৌলতে, একটু-আধটু নবার্জিত ভারত-তত্ত্ব শিখেই শেলি ভারতের রাজদরবারে সামান্য কাজ নিয়ে চলে আসতে চেয়েছেন, কোলরিজ নিজেকে বিষ্ণুর সমগোত্র হিসেবে ঠাউরে নিতে পেরেছেন। কীভাবে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে তাঁদের আসন পাকাপোক্ত করে তুলছিলেন, সে সম্পর্কে এঁদের কারুরই তেমন মাথাব্যথা ছিল না। রামমোহন প্রমুখ চিন্তা-নায়কদের ইয়োরোপীয়তার মূলও এইখানেই প্রোথিত। এঁরা আগত শাসককে শিকড় গাড়বার জন্য আরো একটু সময় দিয়েছিলেন, তাকে পরীক্ষা করে নিজেদের পরীক্ষিত হবার সুযোগ দেবার জন্য। এবং ইংরেজরা সেই সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারই করেছিল। আজকে যদি তৎকালীন ভারতীয় চিন্তা-নায়কদের বিগ্রহপ্রতিম সব ব্যক্তিত্বের যুগের হাওয়ায় সানন্দে ভেসে-যাওয়া মঞ্জরীর মতো মনে হয়, তাতে করে বোধহয় তাঁদের আক্রান্ত হবার ক্ষমতা (vulnerability), যা একমাত্র শিল্পীরই লক্ষণ, প্রমাণিত হতে পারে।

মনে রাখা দরকার, ক্ষমতা আয়ত্ত হবার পর থেকে ইংলণ্ড তার প্রতাপের জাল, অন্তত বাইরের দিক থেকে দেখলে, একটু গুটিয়ে নিয়েছিল। লণ্ডন নগরীর বিশ্বব্যাপ্ত প্রতাপ মধ্য-ভিক্টোরিয় পিয়ানোর মতোই লোকচক্ষু থেকে পা পর্যন্ত আস্তরণে ঢাকা ছিল, ব্রিটিশ নেভি-র প্রাধান্য ছিল নীরব, ড্রয়িং রুমের স্তরন্যাসের মতোই, ডেভিড টমসনের এই তুলনা, চমকপ্রদ হলেও সত্যবহ। সিপাহী বিদ্রোহের অনেক আগে থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গূঢ় চতুরালির আশ্রয় দিয়ে লণ্ডনের শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি করে এসেছে, কখনো ভেট বিতরণে সম্রাটের সঙ্গে তাঁর স্বজনের সখ্য ভেঙে দিয়ে, কখনো-বা রাজশক্তি ও লোক-শক্তির মধ্যে সূক্ষ্ম প্রাচীর গড়ে তুলে। মন্ত্রগুপ্তি ও তথ্য লুকিয়ে রাখার ইতিহাসে ইংরেজদের এই দক্ষতা এতই নিপুণ ছিল যে অনেক দিন পর্যন্ত আমাদের মান্য বুদ্ধিজীবীরা সে বিষয়ে সজাগ না থেকে শুধুমাত্র তাঁদের অভিজাত মুখাবয়ব সসম্ভ্রমে প্রত্যক্ষ করে এসেছেন, নানা ব্যাপারে মতের অমিল হলেও তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা চালিয়ে গিয়েছেন।

এর আরো একটি কারণ এখানে অনুল্লেখ্য নয়। ইংরেজরা পুরোদস্তুর ক্ষমতায় আসবার পর আমাদের দেশটাকে কীভাবে দ্রুত গড়ে তোলা যায়, কী করে ইংরেজদের সভ্যতার সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করেই তাদের সমতুল্য হয়ে ওঠা সম্ভব, সেটাই ছিল আমাদের বরেণ্য, সংস্কারকদের লক্ষ্যস্থল। অন্যদিকে ঐ অন্তর্বর্তী সময়ের মধ্যে স্বদেশে ইংরেজ শাসকেরা সিংহাসন সামলাতে গিয়ে যে হিমসিম খাচ্ছিলেন, সে খবর আমাদের যুবশক্তির কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। এই

যুবশক্তির মুখপাত্রেরা সেদিন ইংলণ্ডের চার্টিস্ট আন্দোলনের দিকে গভীর এষণায় তাকিয়েছিল। ইংরেজ সমাজের যাবতীয় সংকীর্ণতা ভেঙে দেবার কল্পে নতুন যুগের চার্টার রচনার জন্য এই আন্দোলন হয়ে উঠেছিল যুগধর্ম এবং সর্বজাতির মুক্তির দিশারি। ১৮৪৯-এ পার্লামেণ্ট ভবনের কাছে ওয়েস্টমিনিস্টার প্যালেস ইয়ার্ডে আহুত জনসমাবেশে নির্বাসিত এক পোলিশ যুবকের প্রণীত যে-ইশ্‌তেহারগুলি বিলি করা হয়েছিল তাদের মধ্যে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ ও কার্যক্রমের তালিকা ছিল। শেষ পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদীদের হাতেই ঐ আন্দোলন চলে যায় এবং সন্ত্রাস দমনে পারঙ্গম প্রশাসকবর্গের কুটনৈতিকতায় তার অকাল-মৃত্যু ঘটে। রাজনৈতিক অভ্যুত্থান হিসেবে চার্টিস্টদের ব্যর্থতা যতই প্রচারিত হোক না কেন, ইংরেজ সমাজের প্রগতিশক্তিকে তা চিরকালের মতো নাড়িয়ে দিয়েছে। জন স্টুয়ার্ট মিলের রাজনৈতিক অর্থনীতি' (Political Economy/ ১৮৪৮), টমাস হুডের 'সঙ অফ দি শার্ট', শ্রীমতী ব্রাউনিঙের 'ক্রাই অফ দি চিলড্রেন' প্রমুখ সন্দর্ভ ও গীতিকবিতার মাধ্যমে এস্টাবলিশ্‌মেণ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত তারুণ্যের যে-মুখচ্ছবি ফুটে ওঠে, তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, চার্টিস্টদের বনিয়াদবিরোধী মুক্তিযজ্ঞের দাপটে ভিক্টোরিয় যুগের আত্ম-তৃপ্তি কীরকম কেঁপে গিয়েছিল। এরি অভিঘাতে রচিত হল ডিজরেলির 'সিবিল' ও 'কনিংস্‌বি' নামক দুটি ক্রান্তিদ্যোতক উপন্যাস। এবং চরমপন্থী টোরি আন্দোলন 'ইয়ং ইংলণ্ড'-এর গোড়াপত্তনও এই পর্বেরই সংঘটন, যা ইংলণ্ডের সামাজিক অসাম্য ও বৈষম্য ভেঙে চুরমার করে দিতে চেয়েছিল।

'ইয়ং ইংলণ্ডে'র মতোই, হয়তো অংশত তার প্রভাবেও, 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলন আমাদের দেশে রূপ পেয়েছিল। এরও উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সমাজের অসংগতিগুলিকে আচম্বিতে লুপ্ত করে দেওয়া। তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত আভিজাত্যের মুখোশ সরিয়ে দিয়ে উদার সামাজিক চিন্তার পরিবেশ রচনা করার উদ্দেশ্যেই এই আন্দোলনের প্রবক্তারা সেদিন উৎকেন্দ্রিকতার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ভুলে গেলে অন্যায় হবে, এঁদের ঋত্বিকেরাও কেউ ইংরেজ ছিলেন না। অন্যতম পুরোহিত ছিলেন আলেকজাণ্ডার ডাফ, স্কটল্যাণ্ডের মিশনারি পুরুষ, যিনি ধর্মীয়তার আড়ম্বর থেকে সরে গিয়ে একটি 'সৌন্দর্য-নির্ভর আদর্শই' (beau-ideal) গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। অন্য আরেক হোতা ডিরোজিও-র উৎস ছিল পোর্তুগীজ। তাঁকে ঘিরেই জমে উঠেছিল হিন্দু কলেজের চরমপন্থী ছাত্রশাখা ইয়ং বেঙ্গলের উদ্দীপনা। ডিরোজিওর বাড়িতে বেকন-লক-কাণ্ট-হিউম প্রমুখ দার্শনিকদের রচনার নিভৃত পাঠ নিয়ে তারপর প্রকাশ্য রাজপথে এঁদের গোমাংস ভক্ষণ কিংবা প্রতিষ্ঠানবিরোধী শ্লোগান দেওয়া অথবা ব্রাহ্মণদের চটিয়ে দেবার জন্য আকস্মিক খৃষ্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণ, এ দুয়ের মধ্যে নিঃসন্দেহে একটি জঙ্গম যোগাযোগ ছিল। এঁরাই প্রথম অমূর্ত শাস্ত্রিক সংস্কার দীর্ণ করে অধীত গ্রন্থকে চলার পথে টেনে এনে জীবনচর্যার

(way of life) উপর জোর দিলেন। উন্মুখর এই প্রজন্মেরই কবি ভাষ্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

ধ্রুপদী ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে যে-সমগ্রতার বিধান ছিল, মধুসূদনের কাছে সেটি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। পক্ষান্তরে পশ্চিম থেকে যতগুলি তরঙ্গ বাহিত হয়ে এসেছিল তাদের সঙ্গে বোঝাপড়ার চ্যালেঞ্জ তিনি সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রথম জীবনের কবিতাগুচ্ছের নাম তাই, হোরেসের প্রেরণায়, 'কবির কীর্ণ প্রত্যঙ্গপুঞ্জ (Disjekta Membra Poeta)। এখানেও আমরা দেখি, পূর্বধার্য শাস্ত্রীয় সমগ্রতার পরিবর্তে খণ্ডিত ভাববিশেবর সৃষ্টি সেদিন তাঁর কাছে প্রাসঙ্গিক ঠেকেছিল। এই বোধ দুর্মরভাবেই আধুনিক, এবং সন্দেহ নেই, পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যের একমাত্র শরণ। প্রয়াত হিন্দি কবি অজ্ঞেয় আধুনিক হিন্দি সাহিত্যের বীজাংকুর মধুসূদনের রচনাতেই খুঁজে পেয়েছেন: 'এই সেই মানুষ যাঁকে আমরা শুধু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নয়, সমগ্র আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের পিতৃকল্প পুরুষ বলে মনে করি। স্বীকার করব, সঠিক পাঠ নিতে তাঁর বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি সেই পাঠ অনেকটা ট্র্যাজিক, এমন কি নিঃসন্দেহে তিক্তভাবে নিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ অবধি তিনি সেই পাঠ নিতে সক্ষম হয়েছিলেন।' এই মন্তব্যের মধ্যে শুধুমাত্র মধুসূদনের মূল্যাঙ্কনই নেই, যাঁরা মধুসূদনকে ধরতে পারেন নি, তাঁদের সম্বন্ধে অভিমানও আভাসিত হয়ে আছে। পশ্চিমের কাছ থেকে ভেবেচিন্তে ঠাণ্ডা মাথায় পাঠ নিতে বসলে মধুসূদন তাঁর কৃতির একটি অংশও আমাদের জন্য রেখে যেতে পারতেন কিনা সন্দেহ। এখানে মনে পড়ছে, সিমলায় ইনস্টিটুট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডি-র আয়োজিত একটি আসরে কবি অজ্ঞেয় এবং আমাদের কাছে উর্দু সাহিত্যের প্রগতিলেখক সজ্জাদ জহীর একটি রূপক রেখেছিলেন: তাঁর ঠাকুমা তাঁকে বিদেশযাত্রার আগে বলেছিলেন ইয়োরোপের ভালো জিনিসগুলো তিনি যেন নিয়ে আসেন, আর খারাপ ব্যাপারগুলো বিষবৎ বর্জন করেন তখন 'ভালো মন্দের মধ্যে তফাৎ করলে কী ভাবে ইয়োরোপকে জানব,' এই টিপ্পনী কেটে নাকি জহীর ইয়োরোপে চলে যান। মধুসূদনের ইয়োরোপীয়তার মধ্যে সর্বাত্মক পরিগ্রহণের এই ইঙ্গিত ছিল সমাজপতিরা তাঁকে তাই 'পাষণ্ড' পদবী উপহার দিয়েছিলেন, কিন্তু শীর্ণ সুনীতির কাছে বশ্যতা দেখিয়ে নিজেকে তাঁর অনপনেয়ভাবে 'ভারতীয়' প্রমাণ করবার দরকার পড়েনি। এই পাষণ্ডের অন্যতম প্রধান প্রমাদ ছিল নিশ্চয়ই প্রথমদিকে ইংরেজিতে সাহিত্য চর্চা। এই ভুলটির সঙ্গে যে দুঃসাহসিক নিরীক্ষার আভা জড়িয়েছিল, সেটা সমাজের বিবেকরক্ষীরা হৃদয়ঙ্গম করেননি, বা করতে চাননি। কিন্তু সেই একই ভুল প্রত্যক্ষভাবে বঙ্কিমকে, এমন কি অজ্ঞেয়কেও—তাঁর প্রথম আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'শেখর' মূলত ইংরেজিতেই লেখা হয়েছিল—করতে হয়েছে, কেননা

ভুলের মাশুল না দিলে সত্যের সঙ্গে মানুষের অপরিচয় থেকেই যায়।

ভাবতে অস্বস্তি হয়, আজ পর্যন্ত কোনো সমালোচক ভারতসাহিত্যে মধুসূদনের অনিবার্য ধারাবাহিকতা কী পরিমাণ সক্রিয়, সে বিষয়ে যথাযথ কোনো প্রতিবেদন রচনা করলেন না। আমরা প্রাদেশিকতাপুষ্ট সাহিত্য ইতিহাসকারদের কথা ছেড়েই দিলাম, ভারতীয়তা ও ইয়োরোপীয় জীবন-ধারণায় সমপরিমাণে সুদীক্ষিত দিগ্বিজয়ীদের কাছ থেকেও আমরা এই বিষয়ে কোনো সুবিচারের পরিচয় পাইনি। এই মুহূর্তে কৃষ্ণ কৃপালানীর সুলিখিত Literature of Modern India (ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৮২) বইটির কথা মনে পড়ছে। বড়ই পরিচ্ছন্ন রুচিরায় সমাচ্ছন্ন এই পুস্তিকা। এতই পরিচ্ছন্ন যে থেকে থেকেই 'ভারতীয় চিন্তাধারা বলতে কী বোঝায়, তারই দিকে লেখক আমাদের মনোযোগ ন্যস্ত করে যা-কিছু আপাতদৃষ্টিতে অভারতীয়, আধুনিক ভারতসাহিত্য থেকে তার অপসারণ অনুমোদন করেছেন। এ বইতে তিনি কবুল করেছেন মধুসূদনের নিরীক্ষা সার্থক এবং ব্যাপক ছিল এবং তিনিই প্রথম কোনো ভারতীয় ভাষায় আধুনিক মহাকাব্য লিখে ব্লাংক ভার্সকে 'দেশীয়তা' জুগিয়েছেন। এর পরেই তিনি যে কথা বলছেন, তাতে আমাদের হোঁচট খেতে হয়ঃ "তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ভারতীয় প্রসঙ্গপটে পশ্চিমের তামাম মূল্যবোধের যাথার্থ্য প্রমাণ করার ট্র্যাজিক সংগ্রামের দৃষ্টান্ত। এই সমন্বয় তাঁর জীবনে না হলেও কবিতায় যেভাবে এসেছে তার ফলে ভারতীয় সাহিত্যে চিরদিন তাঁর নাম থেকে যাবে।" এর পরেই, সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত সৃজনের উৎসাহে কৃপালনী বলেন 'যদিও তিনি পথ দেখিয়েছিলেন, তিনি কোনো প্রাণবন্ত ঐতিহ্য ('vital tradition') প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারেন নি, কেননা তাঁর নিজের সাফল্য এক উদ্‌ভ্রান্ত প্রতিভারই 'tour de force'। সহানুভূতির পেলব আচ্ছাদনে উচ্চারিত এত হৃদয়হীন মূল্যায়ন প্রমাণ করে, ভারতীয় সমালোচনা সাহিত্য এখনো জন্ম নেয়নি।

এপিক, ওড, নাটক, স্যাটায়ার, সনেট, প্রতিটি ক্ষেত্রে, এমন-কি ব্ল্যাংক ভার্সের প্রবর্তনে, মধুসূদন যে পূর্বসূরি হয়ে আছেন, এসব তথ্য সাহিত্য-বিচারে কোনো অমোঘতা আনে না। প্রায়শই দেখা যায়, কোনো বহিরাশ্রিত আন্দোলনের গৌণ একজন অংশীদার কোনো রূপকল্প প্রথম চালু করেন, যা শক্তিশালী সতীর্থ ও উত্তরসূরীদের হাতে পুনর্ণব হয়ে পরিণতি পায়। মধুসূদন যে অবিশ্বাস্যরকম অল্পসময়ের ভিতরেই এতগুলি নবত্ব ঘটাতে পেরেছিলেন, সেটা তাঁর প্রতিভার সাক্ষ্যবহ হলেও একমাত্র লক্ষণ নয়। আসল কথা, এসমস্ত প্রকরণের অন্তঃস্থ প্রাণশক্তি তাঁর ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। এক-একবার কৃতিত্বলুব্ধ কিশোরের মতো 'দ্যাখো, এই খেলাতেও আমিই প্রথম'

এবংবিধ উচ্চারণ তিনি করেছেন এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষনীতে তাঁর সেসব উক্তির যাথাযথ্যও আমরা মেনে নিতে বাধ্য। কিন্তু ক্ষমতার সেই প্রদর্শনেই তাঁর মেধা ফুরিয়ে যায় নি। তিনি মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে যে-প্রাণশক্তির প্রতি দৃপ্ত আনুগত্যে এক-একটি জগৎ সৃষ্টি করে গিয়েছেন সেখানেই তাঁর প্রবহমান প্রতিভার পরিচিতি। এক-একটি ভাববিশ্বের এই উদ্ঘাটন প্রসঙ্গে মধুসূদন নিজেকে কলম্বাসের সঙ্গেও শিশুসুলভ, অথচ তাৎপর্যবহ, তুলনা করে গিয়েছেন। এই সূত্রে তাঁর বহুবিতর্কিত The Anglo Saxon and the Hindu (১৯৫৪) শীর্ষক দীপিত কথিকা আমাদের আলোড়িত করে। ভার্জিলের ঈনিড মহাকাব্যে কার্থেজের রানী আফ্রোদিতের বীর সন্তানকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁর বোন আনাকে প্রশ্ন করেছেন: কে এই আগন্তুক যে আমাদের বাসস্থলে এসে উপস্থিত হল (Quis novus hic nostris successit sedibus hospes !) ? মনে রাখা জরুরি, ভার্জিলে যা ছিল বিস্ময়বোধক ইঙ্গিত, মধুসূদনে সেটাই সংস্কারমুক্ত প্রশ্নচিহ্নে পরিণত হয়েছে। এই প্রশ্নেরই সূত্র ধরে মধুসূদন দর্শকের দৃষ্টিকোণ থেকে, বলে উঠেছেন, কে এই অচেনা পথিক, যিনি 'আমাদের নির্জন শতকের পথে এক মহাশ্চর্য ও গরিমান্বিত সৃষ্টিশক্তি ('a fabric of power') লালিত করে তুলেছেন? এখানেও মধুসূদন প্রশ্নচিহ্ন রেখেছেন। এবং 'সম্রাজ্ঞী হিন্দুস্থানে'র ('Queenly Hindustan') পক্ষ থেকে চিহ্নিত সেই মহাজিজ্ঞাসা। বড় শিল্পীরা ক্ষুদ্র লাভক্ষতির খতিয়ানে না গিয়ে ঝুঁকি নিতে ভালোবাসেন এবং নিয়তিময়তাকে সৃষ্টির একটি উপাদান হিসেবে মর্যাদা জ্ঞাপন করেন। মধুসূদনও সেটাই করেছেন। তা নইলে তিনি বলতে পারতেন না : 'এখন আপনারা মঞ্চের উপর অভিনয়রত দুজনকে দেখতে পাচ্ছেন, একজন অ্যাংলো-স্যাক্সন, অন্যজন হিন্দু। একজন কান্তিময়, যাঁর পৌরুষে দর্শকেরা সম্মোহিত, স্বরলহরীতে শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে দিচ্ছেন। আমার আশঙ্কায় অন্যজনের দশা কথঞ্চিৎ প্রতিকূল, সময়ের নিরন্তর তরঙ্গাঘাতে জীর্ণ, বেসুরো বীণার মতো কর্কশ···আপনারা মঞ্চের উপর অভিনয়রত দুজনকে দেখছেন, একজন অ্যাংলো-স্যাক্সন অন্যজন হিন্দু। আপনারা বিশবাস করুন, এঁরা নিয়তির নিবন্ধে এক মহান্ গম্ভীর, বিরাট, আশ্চর্য নাটক মঞ্চস্থ করবেন.. আমি কলম্বাসের মতো অচেনা বিশবপুঞ্জের আবিষ্কর্তার মতো আপনাদের সামনে দাঁড়াই নি....আপনারা নিজেরাই তার প্রমাণ পাবেন। কেন ভাগ্যবিধাতা এই রাজ্ঞীর মতো ঋদ্ধ দেশকে, অ্যাংলোস্যাক্সনের শিকার ও লুণ্ঠনের বিষয় করে তুলে দিলেন ? কেন ?' স্বরায়ণে প্রায় কার্ল মার্কসের ভারতচিন্তার মতোই উদ্দীপক মনে হয় এই প্রশ্ন এবং তার ঝাপটানিতে প্রশ্নকর্তা, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কিছুক্ষণের জন্য বাক্শক্তিহীন হয়ে যান। অতঃপর কিছুটা সামলে নিয়ে তিনি প্রত্যাশা জ্ঞাপন করেন, 'অনন্ত প্রেমের বিশুদ্ধ উৎসতলা'

('the pure fountain of eternal love') থেকে অ্যাংলো-স্যাক্সন ঐ অভিনেতা তাঁর সাগর-ঘেরা পিতৃভূমির বিজ্ঞান এবং সাহিত্য আমাদের উপহার দেবেন। বিস্ময় বর্জন করলে কোনো বীক্ষাই আমাদের আকর্ষণ করে না। মধুসূদনের এই বিস্মিত বীক্ষণ আমাদের অভিনিবেশ দাবি করে। এখানেই বোধহয় প্রাচ্যে তুলনামূলক সাহিত্যের প্রথম বুনুনি লক্ষ করা গেল। পাতার পর পাতায়, পরতে পরতে বিশ্বসাহিত্য থেকে গূঢ়োল্লেখ (allusion) আমন্ত্রণ করে বাংলা সাহিত্যকে তিনি এখানে যে বিপুল ঔদার্যগুণে প্রাদেশিক ডিসিপ্লিনের কবল থেকে মুক্ত করে দিলেন তার কোনো তুলনা নেই। কিন্তু সেটাই হয়তো এর অন্তিম পারমিতা নয়। মধুসূদন রুদ্ধশ্বাসে বর্ণিত তাঁর এই নাটক নিজের জীবনে প্রয়োগ করলেন। ফরাসি নারী এমিলিয়াকে তাঁর জীবনসঙ্গিনী করে তুলবার পর থেকেই তিনি বাংলা ভাষার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করে দিলেন। এবং 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৮) নামক দুই নারীর নাটককে কেন্দ্র করেই বাংলা ভাষার এই স্বাধিকার তাঁর জীবনে ও বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হল। যদি এই যোগাযোগকে বিরোধাভাস বলে অভিহিত করতে হয়, তাহলেও অভারতীয়তার কোনো প্রাদুর্ভাব আমরা এর মধ্যে দেখব না। নব্য ভারতীয় মানদণ্ড তৈরি করতে গিয়েই 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) পর্বে বন্ধু রাজনারায়ণের কাছে মধুসূদন এই আপাতবিসংগত অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন : 'যদি আমাকে আরো নাটক লিখতে হয়, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথের সাহিত্য দর্পণ আমাকে বেঁধে রাখতে পারবে না। আমি ইয়োরোপের মহান্ নাট্যকারদের কাছ থেকেই রূপাদর্শ খুঁজে আনব। সেটাই হবে যথার্থ জাতীয় থিয়েটারের ('a real National Theatre') উদ্বোধন।' আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের অধমর্ণতার আভাসমাত্রও এ উক্তিতে ফুটে ওঠে না ; তার জায়গায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে স্ববিবেকী নির্বাচনের সৌন্দর্যনির্ভর আদর্শের (beau-ideal) সেই ছাঁচটি, হিন্দু কলেজ থেকে ইয়ং বেঙ্গলের তরঙ্গসংক্ষোভ অতিক্রম করে মধুসূদনের নাটকে ও কবিতায় যার শিল্পায়ন ঘটল। রবীন্দ্রনাথ যে রক্ষণশীলদের প্রতিনিধি হেমন্তবালা দেবীকে অত করে বুঝিয়েছিলেন, আমাদের আধুনিক সাহিত্যের ভিৎটি ইয়োরোপীয়, এবং তাকে পশ্চিমের সাহিত্যিক মানদণ্ডেই দেখতে হবে, তখনওআধুনিক ভারতসাহিত্যে এই উপযোগনিরপেক্ষ সৌন্দর্যভাবনার জয়যাত্রার ধরনটি আমরা ধরতে পারি, বুঝতে পারি প্রতীচী পথিক মধুসূদন কিংবা রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দের অধিকাংশ উদ্যমই এখন পর্যন্ত অনেকের কাছে কোনো অস্পষ্ট কেন্দ্রাতিগ যাত্রার মতো উপেক্ষনীয় রয়ে গিয়েছে।

যদি আমরা মনে করি, পাশ্চাত্যের দিকেই মধুসূদন তাঁর কম্পাস ঘুরিয়ে রেখেছিলেন, তাহলে সত্যের অপলাপ হবে। মধুসূদনের প্রস্তুতিকালীন ইংরেজি রচনা, যা প্রায় অচলিত পর্যায়ভুক্ত হয়েছে, সাক্ষ্য দেয়, তিনি

সাদে বা ফিরদৌসির কাব্যেও রূপ খুঁজেছেন। বস্তুত পারসিক সাহিত্যে যে তিনি স্বচ্ছন্দ ছিলেন, সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। আমাদের বক্তব্য, মধুসূদন এভাবে কখনোই সাহিত্যের ভূপরিক্রমায় ব্রত হননি যে, এখানে ভারতীয় সাহিত্যের পরিসর শেষ হয়ে পারসিক এলাকা শুরু হল অথবা ওখানে পারসিক সীমারেখার পরপারে প্রতীচী সাহিত্যের স্বকীয় পরিসীমা। তিনি গোটা পৃথিবীটাকেই নিজের স্বদেশ বলে মনে করেছিলেন এবং উৎস-নির্বিশেষে বাংলা সাহিত্যের জন্য মর্জি ও প্রকরণ সংকলন করে এনেছিলেন। ঐ উৎস সবসময় ভৌগোলিক অর্থে যে 'পাশ্চাত্য' ছিল, এরকম নির্ধারণ ঠিক নয়। কিন্তু এ পর্যন্ত বললে অন্যায় হবে না, পাশ্চাত্য সাহিত্যভাবনার অনুষঙ্গেই তিনি দূর অথবা মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত চলে গিয়েছেন। ঐ যাত্রাপথে সাহিত্য জরিপের যে মানদণ্ড তাঁর হাতে ছিল, সেটি আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যেরই নিজস্ব। তাকে ইংরেজি সাহিত্যের ঐকান্তিক উত্তরাধিকার বললে ভুল হবে। বরং তিনি ইংরেজি সাহিত্যের তৎকালীন আদর্শকে একেবারেই প্রশ্রয় দেননি। উনিশ শতকের যে পর্বটি আমাদের সাহিত্য সাধকদের তখন দখল করে রেখেছিল তার নাম ভিক্টোরিয় যুগ এবং ঐ যুগপর্বের লক্ষ্যমাত্রাই ছিল সাহিত্যের সঙ্গে কোনো-না কোনো অন্যতর উদ্দেশ্যের উপযোগিতার গাঁঠছড়া বেঁধে দেওয়া। এমন-কি সমালোচক ওয়াল্টার পেটারও, যিনি ফরাসি সাহিত্যেও শীলিত ছিলেন, সাহিত্যচর্যার এই উপযোগবাদের আনুকূল্য করে এসেছেন। ফরাসি কবিতায় প্রতীকপন্থার আন্দোলন দানা বাঁধবার আগে থেকেই কিন্তু অন্য নিরপেক্ষ সৌন্দর্য-সৃষ্টির ঝোঁক দেখা দিয়েছিল। অধুনা রোলাঁ বার্থ **রচয়িতা** (যার ভূমিকা e'crivain) ও **লিখিয়ের** scripteur, e'crivant) মধ্যে যে তফাৎ করেছেন তার পরম্পরা ঐ সাহিত্যে ভিকতর য়ুগোর সময় থেকে বিভাজিতভাবে রয়ে গিয়েছে। বার্থের ধারণা অনেকটা এরকম : লিখিয়ে অনেক আছেন, যাঁরা কোনো বিষয়কে প্রকাশ করার জন্যই লেখেন, যাঁদের কাছে লেখা অপরাপর বৈষয়িকতার দিকে আমাদের ধাবিত করবার মাধ্যম মাত্র ; অন্যদিকে আছেন সেসব রচয়িতা যাঁরা তাঁদের রচনার মধ্যস্থতায় তার অতিরিক্ত জগতে আমাদের পৌঁছে দিতে তেমন সচেষ্ট থাকেন না, যাঁরা শুধুমাত্রই রচনা করেন। 'শুধুমাত্রই রচনা করেন' কথাটা নিতান্তই তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক অথবা 'শিল্পের জন্য শিল্প' (l'art pour l'art) শিবিরঘেঁষা ধারণা মনে করা ঠিক হবে না। বার্থের সূত্র অনুযায়ী, রচয়িতা রচনার মধ্যেই তাঁর নিবিড় স্বক্ষেত্র খুঁজে নিয়ে সেখানেই কেন্দ্রিত থাকেন। আধুনিক সমালোচনা সাহিত্যের শিক্ষার্থীমাত্রেই জানেন, বার্থ এখানে রুশ প্রকরণবাদের, বিশেষত রোমান জাকবসন কৃত ভাষার প্রসঙ্গসাপেক্ষ (referen-tial) ও নান্দনিক (aesthetic) ভূমিকার দ্বৈতত্ব নতুন করে কাজে লাগিয়েছেন। লিখিয়ে কোনো বিষয় নিয়ে লেখেন, রচয়িতা শুধুমাত্রই রচনা করেন।

রচনাকর্মের এই স্বনির্ভরতা, অর্থাৎ রচনাকে নিজের মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ রেখে তাকে কোনো হিতৈষিতার বাহন হতে না দেওয়া আমাদের মনে হয়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তাঁর সৃষ্টিজীবনের তুণ অক্ষপথে প্রয়োগসিদ্ধভাবে দেখিয়ে গিয়েছেন। তিনি কোনো বিষয় নিয়ে রচনা করেননি, যদিও উদ্দীপনবিভাব হিসেবে কোনো-কোনো বিষয় তাঁর রচনার বহির্বৃত্তে কাজ করেছে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যাওয়া বা পাঠককে নিয়ে যাওয়া তাঁর অভিপ্রায় ছিল না। তাঁর প্রতিটি রচনার প্রাক্কালে বা সমকালে তাঁর কবি-অভিপ্রায় নিয়ে তিনি যেসব চিঠিপত্র লিখেছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশতই দেখা যায় লেখার আনন্দ ও প্রকরণচিন্তাটাই মুখ্য, বিষয়বস্তুকে স্থান দিতে হবে বলেই যেন নেহাৎ সে বিষয়ে আমাদের একটি হদিশ তিনি দিচ্ছেন (তুলনীয়, 'কৃষ্ণকুমারী' প্রসঙ্গে রাজনারায়ণকে লেখা চিঠি : 'I have been dramatizing, writing, a regular tragedy in—prose ! The plot is taken from Tod. vol. I, p. 461)। সেদিক থেকে দেখলে 'মেঘনাদবধ কাব্য' অথবা 'বীরাঙ্গনা' কিংবা 'ব্রজাঙ্গনায়' অবশ্যই কোনো কোনো বিষয়বস্তুর সিল্যুয়েৎ পাওয়া যাবে ঠিকই, কিন্তু তাদের শনাক্তকরণ কিংবা তাদের সমবায়ী কোনো পরিমাণগত বিচার করতে গেলে মধুসূদনকে রচয়িতা হিসেবে আমরা ধরতে পারব না। এখানেও আমরা, মধুসূদন প্রসঙ্গে, রোমান জ্যাকবসনের ঐতিহাসিক নিছক সাহিত্যিকতা(literaturnost) সূত্রটি ব্যবহার করতে চাই। জ্যাকবসন তাঁর অদ্ব্যর্থ ভাষায় বলেছেন, 'সাহিত্যসংক্রান্ত পাণ্ডিত্যের অনুসন্ধানের বিষয় সাহিত্যের তথাকথিত সামগ্রিকতা নয়, তার অন্বিষ্ট হলো নিছক সাহিত্যিকতা, অর্থাৎ সেই বস্তু যা প্রদত্ত কর্মটিকে একটি সাহিত্যকাজ বলে চিনিয়ে দেয়।' এখানেই মধুসূদনের স্বাতন্ত্র্য অথবা তাঁর সাহিত্যকাজের সঙ্গে অপরাপর অধিকাংশ সমাজসেবী অথবা সংস্কারকের প্রদত্ত কর্মের তফাৎ। যেটুকু সময় মধুসূদন সাহিত্যিক অর্থে বেঁচেছিলেন (আমরা জানি, সাহিত্য রচয়িতার রচনাকাল কত নির্মমভাবে কালগ্রস্ত, এ বিষয় মধুসূদন মর্মান্তিক সচেতন ছিলেন), এই শুদ্ধ প্রভেদ তিনি রক্ষা করে গিয়েছেন। হয়ত 'সৃজনী মুহূর্তের অনটন' হবার সময় প্রদত্ত কর্ম অর্থাৎ বহির্বিষয়ের চাপ আলাদা করে তিনি অনুভব করছিলেন, হয়ত তাঁর মনে হয়েছিল, এখনো লিখে চললে তা আর রচনা হবে না, তার মধ্যে বৈষয়িকতার প্ররোচনা ঢুকে পড়বে, তখুনি তিনি, হোল্ডারলীনের মতোই, লেখা থামিয়ে দিয়েছেন। মধুসূদন, হোল্ডারলীনের মতো, হয়ত বা ধারাবাহিক ভাবে লেখার স্রোত থমকে যাবার পরেও দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে পারতেন কিংবা বলা যায় অন্ত্য সূর্যাস্তের মুখে সাহিত্য ও জীবনের মাঝখানে কিছু রক্তচ্ছায়াখনিম অশনিসংকেত তৈরি করে যেতে পারতেন, কিন্তু তার ফলে তাঁর কবিপ্রতিমার অবয়ব বিন্যাসে কোনো অদল বদল হত না।

আমরা এখানে আরেকবার মধুসূদনের রচনার বিশেষ পরিস্থিতির কথা স্বতন্ত্রভাবে বলতে চাই। এই পরিস্থিতি প্রধানত রচনাকালীন পরিবেশ থেকে উদ্ভূত, প্রাঙ্ নির্দিষ্ট কোনো সম্পূর্ণতার ক্রীড়নক নয়। 'Visions of the Past' শীর্ষাঙ্কিত তাঁর কবিতা-সিরিজ এই সূত্রে অবিস্মর্তব্য। বারোটি অংশে বিন্যস্ত এই ক্রমপর্যায়ী কবিতাটির সূচনা একটি সনেটে। পরক্ষণেই তেইশ লাইনের একটি অসমাপ্ত ফ্রেস্কোয় সেই সনেটটি বিতত হয়ে গিয়েছে। অতীতের কল্পবীক্ষা এভাবে বারংবার অপসৃত হতে-হতে রূপান্তরিত হয়েছে, ক্যালাইডোস্কোপের বহুবর্ণিল মমতায়। এভাবেই হঠাৎ, একাদশ বিন্যাসে এসে রচিত হয়েছে, কোনো শীতল পৌর্বাপর্যের বালাই না রেখে, একত্রিশ লাইনের একটি গুহাচিত্র। ছবিটির বিষয় যেন হারিয়ে-যাওয়া বাংলার (—'as when, Bengala) মুখ। তার গর্বিত অশ্বত্থের নিচে স্বেদাক্ত মধ্যাহ্নের ঘুম এবং নরম আচ্ছন্নতার ছবি আঁকতে গিয়ে হঠাৎই জেগে উঠেছে মানুষের তথা দেশকালের জীবনে পরিবর্তমান, পরিবর্তনসর্বস্ব সময়ের এক ছবি যা কেবলই সরে যায়, এক-একটি মুহূর্তকে সরিয়ে দেয়। এক স্ফটিক সমুদ্রের ('a crystal sea') স্বচ্ছ আলেখ্য দিয়ে যে পরিবেশ শুরু হয়েছিল, পত্রবহুল গাছের অন্তর্লীন একটি অপরাধবোধে ('Guilt behind a leafy tree) তার পর্যবসান ঘটে। বলা বাহুল্য, পুরো ব্যাপারটার মধ্যে মধুসূদনের অনিবারণীয় স্বাদেশিকতার, বাইরে না-দেখানো দেশাত্মবোধের, আলোছায়া এতই প্রকট যে চোখে আঙুল দিয়ে সেটা দেখিয়ে দেবার দরকার হল না। একটি অপসৃয়মান দৃশ্য এঁকে তুলতে-তুলতে ভাবানুষঙ্গে এসে গেল পুরো ব্যাপারটা। ঠিক একইভাবে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র একটি বাঁকে, 'পৃথিবী'র (৯১) রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে খেলাচ্ছলেই 'আমরা' (৯২) সনেটটি রূপ নিয়েছে। যেভাবে পূর্ববর্তী কবিতায় 'নব ফুল রূপ মণি' চিত্রকল্পটি এগারো থেকে দ্বাদশ পংক্তিতে গড়িয়ে গিয়ে ত্রয়োদশে এসে 'লো' নব রমণি' ধ্বনিকল্পে পরিণত হয়েছে, সেই স্বরানুষঙ্গেই শেষোক্ত কবিতাটি (এখানেও 'মণি' শব্দটি বিশেষভাবে ধ্বনিত হয়েছে) 'সুন্দর' শব্দের পরামর্শে জেগে ওঠে। 'আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণ-বলে, / নির্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে ; / তাদের সন্তান কি হে আমরা সকলে ?—' এই আত্মপ্রশ্নেও এক ধরনের 'Visions of the Past' মূর্ত। পরপর ন'টি প্রশ্নের মধ্য দিয়ে অথবা প্রশ্ন করার ধরনের ভিতর থেকে এভাবে যে-কবিতাটি রচিত হল তার বিষয়বিভাগ নিঃসন্দেহেই স্বদেশ, কিন্তু সেই স্বদেশ 'পৃথিবীর' ভিতরে কীরকম অনাড়ম্বর স্বাচ্ছন্দ্যে অনুস্যূত হয়ে আছে। এরি পাশাপাশি যদি কমলাকান্তর প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত 'একটি গীত' ('মনুষ্যত্ব মিলিল কই ? একজাতীয়ত্ব মিলিল কই ? ঐক্য কই' ইত্যাদি) শুনি, 'আর বঙ্গভূমি ! তুমিই বা কেন মণি-মাণিক্য হইলে না, তোমায় কেন

আমি হার করিয়া পরিতে পারিলাম না....ইউরোপে, আমেরিকায়, মিশরে, চীনে দেখিত, তুমি আমার কী উজ্জ্বল মণি!' এই মর্মে আর্তনাদ শুনি, পরিকল্পিত বৈষয়িকতার প্রাচুর্যে যা শিল্পসম্ভোগ হয়ে উঠতে পারে না।

অথচ মধুসূদনের প্রতিভার মূল রহস্য বঙ্কিম ঠিকই ধরেছিলেন। সেজন্য ইয়োরোপযাত্রী মধুসূদনই যে ভারতাত্মার প্রথম সাহিত্যিক আবিষ্কর্তা, সেই বোধ থেকেই তিনি বলতে পেরেছিলেন, 'কাল প্রসন্ন ইউরোপ সহায়—সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ শ্রীমধুসূদন।' মধুসূদনের মৃত্যুর বছরখানেক আগে রচিত তাঁর ইংরেজি রচনা "The confessions of a Young Bengal'-এও (১৮৭২) প্রাচী-প্রতীচীর সৃজনী দোটানা উচাটন হয়ে আছে। অপীড়িত নান্দনিক কৌতূহল থেকেই তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির আরম্ভ। এরই সৌজন্যে, অনেকটা মধুসূদনের 'Visions of the Past'-এর বর্ণিত অংশের মতো, ঘুম ও জাগরণের সন্ধিক্ষণে, 'Rajmohan's wife' (১৮৬৪) উপন্যাসে শুধুমাত্র গল্প বলার প্রয়োজনবোধে তাঁর হাত থেকে এরকম আশ্চর্য, উদ্দেশ্যরহিত নরনারী-নিসর্গের ছবি ছিটকে বেরিয়ে এসেছে; 'One Chaitra afternoon the summer heat was gradually abating with the keen rays of the sun, a gentle breeze was blowing; it began to dry the perspiring brow of the peasant in the field and play with the moist locks of village women just risen from their siesta'. ('একদা চৈত্রের অপরাহ্নে দিনমণির তীক্ষ্ণ কিরণমালা ম্লান হইয়া আসিলে দুঃসহ নৈদাঘ উত্তাপ ক্রমে শীতল হইতেছিল; মন্দ সমীরণ বাহিত হইতে লাগিল; তাহার মৃদু হিল্লোল ক্ষেত্রমধ্যে কৃষকের ঘর্মাক্ত ললাটে স্বেদবিন্দু বিশুষ্ক করিতে লাগিল এবং সদ্য শয্যোত্থিতা গ্রাম্য রমণীদিগের স্বেদবিজড়িত অলকপাশ বিধূত করিতে লাগিল' ('রাজমোহনের স্ত্রী', বঙ্কিমকৃত অনুবাদ)। এই ছবিটি আঁকবার সময় বঙ্কিম জানতেন না, এ গল্প কোন পরিণতি নেবে। উপসংহারে অবশ্যই দ্রুত তুলির টানে চরিত্রের কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিবিধান নির্দিষ্ট হয়েছে, কিন্তু সেই সূত্রে মতামতের জন্য লেখক দায়ী নন, তাঁর কাজ পাঠকের নির্ভার চিত্তবিনোদন: 'As to Madhav, Champak and the rest, some are dead. Throwing this flood of light on their past and future history, I bid you, good reader, FAREWELL!' সম্ভবত এই প্রথম এবং শেষবার পাঠকের সঙ্গে এক তলে দাঁড়িয়ে বঙ্কিমের সতীর্থসুলভ সংলাপ। ঐ উপন্যাস রচনার সময় সূচিত 'দুর্গেশনন্দিনী'র ষোড়শ পরিচ্ছেদে এসে আবার পাঠকের সঙ্গে তাঁকে দেখতে পাই, কিন্তু তখন তার উপর স্বভাবসিদ্ধ 'ভালোত্ব' তিনি আর অর্পণ করেননি, তার চেয়ে উঁচু আরেক ধাপে দাঁড়িয়ে তর্জনী তুলে 'ঐ দেখ পাঠক....দেখ দেখ....ঐ চে

দেখিতেছ' বলে পটুয়া যেভাবে পটের এক-একটি অংশ খুলে দেখায়, সেভাবেই ভাঁজ ভেঙে ভেঙে একটি রূপক ('পদ্মবৃক্ষে কেমন করিয়া কালফণিনী জড়ায়') প্রদর্শন করছেন। পাঠক বা দর্শককে তিনি যে এখন থেকে আর তাঁর রূপক ও তার স্বকৃত ব্যাখ্যার বলয় থেকে নিষ্কৃতি দেবেন না, সেই আশঙ্কা ঘনীভূত হতে থাকে। নারীর রূপ যে পুরুষের সামূহিক সর্বনাশের আকর, এই তত্ত্বটি, পাঠকের সম্ভাব্য অনুযোগের তোয়াক্কা না করে, বহুদর্শী লিখিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সৃষ্টির উপরে শিলমোহরের মতো দাগিয়ে দিলেন। 'লিখিয়ে' শব্দটিতে কোথাও অনুশীলিত তাচ্ছিল্যের ভাব নেই, এবং তাঁর উল্টোটাই, অর্থাৎ সম্ভ্রমসমীহার দ্যোতনা আছে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষে' ঐ শব্দের পর পর দুটি অর্থ ('লেখনপটু', 'সুলেখক') দিয়েই দ্রুত 'লিখিয়ে-পড়িয়ে—লেখা-পড়া জানা লোক' এই তাৎপর্যের মধ্যে সুস্থির হয়েছেন। তা থেকে এই একটা কথাই স্পষ্ট হয় যে 'লিখিয়ে' সত্তাটি আরো-একটি ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভরশীল, এবং সেই দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বটি ('পড়িয়ে') হল বিদগ্ধজনোচিত, যার কাছে অনভিজ্ঞ মানুষ পাঠ নিতে যায়। এই অর্থেই বঙ্কিমের লেখায় শুরু হয়ে গেল রচয়িতার সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞ লিখিয়ের লড়াই। এই দ্বৈরথে, লিখিয়ের শুভকামনা সত্ত্বেও যে বহুবার রচয়িতা জয়ী হয়েছেন, সেটা বঙ্কিমের অনিচ্ছাক্রমেই হয়তো হয়ে থাকবে।

'Rajmohan's wife'-এর স্তুতিকথন আমাদের উদ্দিষ্ট নয়। বরং এ বই লিখবার পরেই যে ইংরেজি ভাষায় মৌল রচনার অভিমুখিতা তিনি পরিহার করলেন, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে মধুসূদনের একদা-সাধিত বিক্ষেপের সংশোধন করে নিলেন, সেখানে তাঁর মহত্ত্ব। অথচ প্রলোভন তাঁর সামনে ছিল। ইন্দো-ইংরেজি কথা সাহিত্য, যা বিশ শতকে এসে শুধু বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম হিসেবেই নয়, ভারতবর্ষের বাইরে সহজে রপ্তানিযোগ্য রসদ হয়ে উঠেছে, 'Rejmohan's wife' উপন্যাসকে ঘিরেই যথার্থ সূচনা পেয়েছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃভাষায় ফিরে এসে স্বপ্রতিষ্ঠ হলেন এবং অপরাপর ভাষার ভারতীয় লেখকের কাছে দীপ্যমান উদাহরণ হয়ে রইলেন। ঐ উপন্যাসের রচনাকালেই জন্মগ্রহণ করেন মহারাষ্ট্রের পথিকৃৎ ঔপন্যাসিক হরিনারায়ণ আপ্তে (১৮৬৪-১৯১৯), যার পঁচিশটি উপন্যাসে বঙ্কিম-নির্দেশিত পথটি গোটা ভারতবর্ষে বিস্তারিত হয়ে গেল। ঐ পথটি মোহিনী মায়ায় যতই বিতত হোক না কেন, পথিকৃতের নির্দেশে শেষ পর্যন্ত যেন বড় সুনির্দিষ্ট। 'কপালকুণ্ডলা'য় তরুণীর প্রবাদপ্রতিম সেই কণ্ঠস্বর ('পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ ?') ছাপিয়ে পরিণতির মুখে তীব্র নিখাদে বেজে ওঠে ভৈরবীর নাদব্রহ্মোপম নির্ধারণ : 'বৎসে! আমি পথ দেখাইতেছি।' 'দুর্গেশনন্দিনী' কিংবা 'কপালকুণ্ডলায়' তবুও যে চরিত্রগুলি বারে বারেই অনির্দেশ্য সৌন্দর্যের মধ্যে হারিয়ে যায়, তার কারণ কথকের হাতের মুঠি

তখনো পুরোপুরি সংবদ্ধ হয়নি, ঈষৎ মায়াবী ভূস্পর্শমুদ্রায় মেদুর রয়ে গিয়েছে সেই দক্ষিণ হাতের করাঙ্গুলি। ক্রমশই অবশ্য মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠেছে দক্ষিণপাণি, যাঁর দাক্ষিণ্য যদিও অযোগ্যের উপর বর্ষিত হবার জন্য নয়।

এর কারণ বেশিদূরে খুঁজতে হয় না। কথকের মতই দেশ-জাতি-কালের প্রতি দায়িত্ব বেড়ে গেছে বলে মনে হয়েছে, সাহিত্য রচনার অনন্য মূল্য বিষয়ে তিনি সন্দিহান হয়ে উঠেছেন। গল্প লিখতে গিয়ে তাই গোড়ার দিকেই পরিণামী বক্তব্য (যেমন 'রজনী'তে : 'যে সৌন্দর্যের উপভোগে ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত চিত্তভাবের সংস্পর্শ মাত্র নাই, সেই সৌন্দর্যই সৌন্দর্য") তাঁকে সংজ্ঞায়িত করে নিতে হয়েছে। এই কারণে তিনি তাঁর আদর্শ থেকে বিকেন্দ্রিত চরিত্রের উপরে ক্রমান্বয়ে অন্যায় হস্তক্ষেপ করেছেন। কী সেই আদর্শ? সনাতন হিন্দু ভারতের? তাই যদি হয়, তাহলে তিনি, দরকার পড়লে তাঁর হিন্দুয়ানায় বাইবেলের বিখ্যাত দশানুশাসনের সপ্তম অনুজ্ঞার মিশেল দিতে যাবেন কেন? জ্যোতীশচন্দ্র ঘোষ, তাঁর Bengali Literature শীর্ষক বইতে, অমরনাথকে উদ্দিষ্ট লবঙ্গলতার নিষ্ঠুর উক্তির ('লোকে পাখি পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখন হইবে না') পিছনে সংগতভাবেই সেই অভিসন্ধি খুঁজে পেয়েছেন। খৃষ্টীয় উত্তরাধিকারে বেড়ে ওঠা টলস্টয়ও, তাঁর আরব্ধ উপপাদ্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে, এতখানি নির্দয় হতে পারেননি। বঙ্কিম পেরেছেন, 'কেননা যাপিত জীবনের চেয়েও তাঁর কাছে জরুরি হয়ে উঠেছিল আরোপিত সুনীতিসংহিতা। সেই কারণেই লবঙ্গলতা আনা কারেনিনা হয়ে উঠতে পারেনি, টলস্টয়ের কাউন্ট ভ্রনস্কির চেয়ে প্রেমিক হিসেবে শতগুণে সত্যবান হওয়া সত্ত্বেও অমরনাথকে সে পরিবর্জন করেছে। শুধু সৌন্দর্যের আদর্শেই নয়, নীতির নিরিখেও যে তার সেই আচরণ কত মর্মান্তিক, বঙ্কিম এক মুহূর্তের জন্যও সেই চিন্তায় কালক্ষেপ করেননি। টলস্টয়ও তাঁর নারী চরিত্রকে দায়রা সোপর্দ করেছেন, কিন্তু সে তার সম্পূর্ণ পথ অতিক্রম করার পর। বঙ্কিম তাকে পথের মাঝখানেই অপরাধী বলে সাব্যস্ত করবার সুযোগ খুঁজেছেন।

'রজনী' (১৮৭৭) প্রকাশিত হবার সময় ১৮৭৫এ সূচিত 'আনা কারেনিনা' রূপগ্রহ করেছিল। 'আনা কারেনিনা'র নিয়তি টলস্টয়েরও বোধহয় মনঃপূত হয়নি। তাই এর পরের বই 'আমার স্বীকারোক্তি'তে (Ispoved / ১৮৭৯) তিনি দ্বিধাগ্রস্ত মানুষকে তার অস্তিত্ব নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার অবকাশ দিয়েছেন। রুশো ও ভলত্যের-এর রচনায় উদ্দীপিত লেখক এখানে লক্ষ করেছেন, প্রচলিত বিশ্বাসের সঙ্গে শিল্প কিছুতেই, এঁটে উঠতে পারছে না। এক্ষেত্রে শিল্প রচনায় কী যুক্তিযুক্ততা আছে, সেই প্রশ্নে জর্জরিত হয়ে 'লেখকপনার ছল প্রপঞ্চ' বিষয়ে টলস্টয় যে বিশদ পর্যালোচনা করেছেন, তা থেকে বোঝা যায়, প্রচলিত আদর্শগুলির সঙ্গে আগে নিঃশর্ত মোকাবিলা না

করে তিনি আর শিল্প রচনার সাহস পাচ্ছিলেন না। এই প্রক্রিয়ায় তিনি এমন-কি বলিষ্ঠ নৈরাশ্যবিবেকে নিজের ধর্মের গণ্ডি ছেড়ে বুদ্ধ এবং ভারত-পথিক শোপেনহাওয়ারের দীক্ষায় দীক্ষিত হতে চেয়েছেন। অপরাপর চিন্তাধারা সম্পর্কে গির্জার অসহিষ্ণুতার অসারত্ব নিয়ে তাই তিনি এমন সমস্ত রূঢ়ভাষণ শুরু করে দিয়েছেন, যার ফলে রুশ অর্থডক্স চার্চ তাঁকে ১৯০১-এ বহিষ্কৃত করে। রুশোর এই দুঃসাহসিক আত্ম অতিক্রান্তির পাশে বঙ্কিমকে অনেক নিজীব মনে হয়। স্বীকার্য, তাঁর সাম্য (১৮৭৯) গ্রন্থে বঙ্কিম যীশুখৃস্ট বুদ্ধ ও যীশুকে তিনি তাঁর জায়মাণ সাম্যাদর্শের তিনটি স্তম্ভস্বরূপ দাঁড় করাতে চাইলেন। এমন কি 'সামাজিক বৈষম্য' দূর করতে গিয়ে অনেকটা সদ্যলব্ধ তত্ত্বের উদ্দীপনায় বলে উঠলেন: 'হিন্দুশাস্ত্রানুসারে কদাচিৎ স্ত্রী বিষয়াধিকারিনী হয়....এ অধিকার কতটুকু? আপনার ভরণপোষণ মাত্র পাইবেন, আর তাঁহার জীবনকাল মধ্যে আর কাহাকেও কিছু দিবেন না, এই পর্যন্ত তাঁহার অধিকার। পাপাত্মা পুত্র সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করুক, তাহাতে শাস্ত্রের আপত্তি নাই...' এই বোধহয় প্রথম নিজের অজ্ঞান্তে, বঙ্কিমচন্দ্র সনাতন হিন্দু বিধির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। কিন্তু তাঁর কোনো উপন্যাসে এর উত্তরাধিকারের কণামাত্র সঞ্চারিত হল না। হিন্দুধর্মে আস্থাশীল অথচ তার অন্তর্নিহিত 'সামাজিক বৈষম্য' নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রেমচন্দের 'বীরোবালি বিধবা' (সপুত্রক বিধবা) নামক ছোটগল্পে বরং সেই প্রথাতিরেক শিল্পভাষা পেয়েছে। মমতা আর স্নেহের অন্তর্বয়নে অনন্যসাধারণ ঐ গল্পে অযোধ্যানাথের বিধবা পত্নী ফুলমতী তাঁর স্বামীর শেষকাজে তাঁর ইচ্ছেমতো ফুলটুকুও কিনতে পারছেন না, কেননা হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি তাঁর চারটি ছেলেই এখন থেকে তাঁর ভাগ্যের নিয়ামক। এই চারজন 'বিধিসম্মত' দুঃশাসন, হিন্দু আইনের দোহাই দিয়ে যখন তাদের একমাত্র বোনের বিবাহে 'প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করতে নারাজ হয়', আমরা এরকম একটি অনিবার্য দৃশ্যের ভিতরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি:

> ফুলমতী শাসিত স্বরে প্রশ্ন করলেন: 'এই আইনটা আমায় একটু বোঝাবে?' উমানাথ গরগর করে বলতে থাকলেন: 'এই আইন বলে, বাবার মৃত্যুর পর ছেলেদেরই সমস্ত-কিছু প্রাপ্য। মায়ের শুধু ভাতকাপড় জুটলেই হলো।' ফুলমতী কেঁপে গিয়ে জিগ্গেস করেন: 'কে? এই আইন বানিয়েছে কে?' উমানাথ উত্তর করলেন: 'কে আবার, আমাদের শুদ্ধশীল মহারাজ মনু।' ফুলমতীর এক মুহূর্ত বাক্সংবরণ ঘটল। তার পরেই আহত স্বরে বলে উঠলেন: 'তার মানে তোমাদের ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট নিয়েই আমাকে বেঁচে থাকতে হবে?'
>
> উমানাথ বিচারকের নিস্পৃহতা নিয়ে উত্তর করলেন: 'তা সে যেভাবেই তুমি ব্যাপারটাকে ছাখো-না কেন।'
>
> ফুলমতী: 'কী ঘোর অবিচার! আমিই বীজ পুঁতেছিলাম বলেই তো গাছগুলো

বেড়ে উঠল। তারাই কিনা আমায় আর কোনো ছায়া জোগাচ্ছে না। এই যদি কানুন হয়, তাকে সবাই পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে না কেন?'

'সাম্যর' আগে বা পরে বঙ্কিম-অঙ্কিত কোনো নারীর মুখ থেকে এরকম দৃপ্ত ভর্ৎসনা আমরা শুনিনি। বড়জোর আমরা 'দেবী চৌধুরানী'তে প্রফুল্লর মাতৃশ্রাদ্ধের দৃশ্যে অসহায় নারীর প্রতি বাধ্যতামূলকভাবে করুণাপরবশ কিছু 'বাঙালি' প্রতিবেশীর সাক্ষাৎ পাই, যারা প্রফুল্লর সমূহ সর্বনাশের জন্য দায়ী হওয়া সত্ত্বেও এক মুহূর্তেই হিন্দুত্বের মহিমাবশে বলতে পারে, তুমি এখন অনাথা বালিকা—তোমার সঙ্গে আর আমাদের কোনো বিবাদ নাই।' যেন অনাথা বা দেবী না হলে বঙ্কিমের স্বপ্নলব্ধ হিন্দু সমাজে নারীর কোনো স্থান নেই, যেন এই স্তরের মধ্যে যারা রয়ে গেছে, তাদের প্রত্যেকেরই চরিত্রচ্যুতি ঘটে গেছে। অভিজাত ও কৃষকসমাজের অসাম্যের দরুণ ততটা নয়, যতটা নারীর স্বাধিকারের সম্ভাব্য মাত্রা সম্পর্কে জাতির জনক হিসেবে মনস্থির করতে না পারার জন্যই 'সাম্য' নামক ক্রান্তিসূচক গ্রন্থটি বঙ্কিমকে প্রত্যাহার করে নিতে হল।

বঙ্কিমের স্বকপোলকল্পনায় ক্রমেই যুক্তিবাদের প্রাতিভাসিক একটি আদল ফুটে উঠছিল। প্রোক্রাস্টাস বলে এক স্বৈরাচারী ছিলেন যিনি তাঁর শিকারকে নিজের মনঃপূত মাপে কেটে নিতেন। এই সূত্রেই নন্দনতত্ত্বে প্রোক্রাস্টিয় মানদণ্ডের কথা আছে। বঙ্কিমচন্দ্রকে অনায়াসেই এই প্রোক্রাস্টিয়তার দায়ে অভিযুক্ত করা চলে। তিনি তাঁর গোপন আরাধ্য পশ্চিমি দার্শনিক বা ভাবুকদের ধ্যানধারণার যেটুকু অংশ তাঁর কাজে লাগে, সেভাবেই তাঁর কাজ হাসিল করেছেন। যোগেশচন্দ্র বাগল এ প্রসঙ্গে আমাদের একটি সূত্র উপহার দিয়েছেন, 'দেবী চৌধুরানীর (প্রকাশ কাল ১৮৮৪) অন্যতম মটোরূপে কঁতের Catechism of Positive Religion হইতে এই উক্তিটি তিনি সমাদরের সহিত উদ্ধৃত করিয়াছেন, the general law of Man's Progress, whatever the point of view chosen, consists in this that Man becomes more and more religious।' এই নির্বাচনের উপবাক্যটি ('যে কোনো দৃষ্টিকোণই নেওয়া যাক না কেন') বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। মানুষকে ক্রমান্বয়ে ধর্মীয় এবং ধর্মসর্বস্ব হতে হবে (অথবা আরো হিন্দু হয়ে উঠতে হবে), তারি সৌজন্যে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী কঁতের চিন্তাধারণাকে ইচ্ছেমতো সাজিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। সন্দেহ নেই, ভবিষ্যত্রের মানবসমাজকে, জীবনানন্দের আর্কেটাইপ সুচেতনার মতোই যেন, দেখতে চেয়েছিলেন ঐ ফরাসি ভাবুক, এবং তাকে 'মানবিক এক দেবী' (অবশ্যই দেবী চৌধুরানী নয়) বলে সম্বোধন করেছিলেন। কিন্তু সেটা তাঁর মূল সিদ্ধান্ত, এমন-কি স্বকীয় চিন্তার কাঠামো, নয়। কঁতের পজিভিজমের প্রধান প্রতিজ্ঞা অবশ্যই মানুষ, কিন্তু

সে জ্ঞানও তার প্রয়োগের অন্তঃস্থ সেতু। কঁতের পূর্বসূরি দেকার্তও জ্ঞানবিজ্ঞানের যাবতীয় পদ্ধতিপ্রক্রিয়ার মূল ভরকেন্দ্র করে তুলেছিলেন মানুষের ব্যবহারোপোযোগিতাকে। পদার্থবিজ্ঞানী হেল্‌মহোল্‌ৎসও জ্ঞানের পরিণামী পরমার্থ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সংশোধন এবং ব্যক্তিমানুষের সামগ্রিক বিকাশের মধ্যেই খুঁজেছেন। এই পথেই এগিয়ে কঁৎ মানুষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ত্রিক্রমিক পথনির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন ঃ ১. পৌরাণিকতার কুয়াশায় সমাচ্ছন্ন ধর্মচিন্তা → ২. শর্তহীন দার্শনিক সমীক্ষণ → ৩. অমোঘ (positive) প্রজ্ঞান যা মানুষকে হয়তো-বা পূর্ণতা দিতেও পারে। কঁতের 'হয়তো-বা' বঙ্কিমে এক অবশ্যম্ভাবী কানাগলিতে পর্যূষিত হয়েছে। কঁতের আত্মপরিপ্রতিনির্ভর চিন্তনে মানুষের ক্রমবিবর্তনে জ্ঞান ও অস্তিত্বের যে অবিশ্রান্ত টানাপোড়েনের সমাচার আছে, বঙ্কিমের উত্তরণসর্বস্ব সংস্কারে তার তিলমাত্রও নেই। প্রকৃত প্রস্তাবে, বঙ্কিম তাঁর স্বনির্বাচিত গুরুকে নিদারুণ ভুল বুঝেছেন। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর National Thought and the Colonial World (১৯৮৬) বইতে প্রতিপন্ন করতে পেরেছেন, এনলাইটেনমেণ্ট—পরবর্তী যুগের যাবতীয় দার্শনিকদের ভাবনা-চিন্তার প্রকরণ গ্রহণ করে আমাদের এই আদর্শশিল্পী কী রকম, যেন-তেন-প্রকারেণ, অকাতরে তাঁর স্বকীয় পূর্বনির্ণীত সিদ্ধান্তে নিশ্চিন্ত নোঙর করেছেন।

ভারতীয় (হিন্দু ?) দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করার জন্যই পশ্চিমাগত-আকরগ্রন্থ বা উৎসকে অংশত ব্যবহার করা সংস্কারক বঙ্কিমের এক রকম প্রিয় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এই সদিচ্ছাজনিত 'বিকৃতি' সাধনের শিকার হয়েছেন, আরো অনেকের মতোই, ইমানুয়েল কাণ্ট। কাণ্ট তাঁর অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ ধারণাবর্গের (a priori) প্রয়োজনীয়তা এবং সর্বোপযোগিতার কথা বর্ণনা করে প্রশ্ন তুলেছেন অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ ধারণাবর্গের (a posteriori) সংশ্লেষাত্মক জ্ঞান তার দ্বারা সম্ভবপর হয় কি না। এই বিভাজন থেকে অন্যতর একটি মীমাংসায় পৌছুবার জন্যই কাণ্ট অতীন্দ্রিয় দর্শনের (Transzendentel-philosophic) দিকে চলে এসেছেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যার মর্মকথা হয়ত ধরতে পেরেছিলেন। 'অতীন্দ্রিয়' বলতে সেই লক্ষণের কথা কাণ্ট বুঝিয়েছেন যা পদার্থনির্ভর অভিজ্ঞতাকে পার হয়ে যায়, অথচ যে-অভিজ্ঞান বিদ্যমান না থাকলে আদৌ কোনো অভিজ্ঞতাই (যেমন, দেশ, কাল, কার্যকারণসূত্র) সম্ভব নয়। কাণ্টের মতো অতীন্দ্রিয় দর্শন এজন্যই সম্ভব যে জগতের যাবৎ বিষয়ীতে একই ধ্যানধারণা সন্নিহিত ; অভিজ্ঞতানিরপেক্ষ উপাদানগুলি প্রদত্ত বিশ্বকে অনুকরণ করে না, তার মধ্যে প্রয়োগ করে মাত্র। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার প্লেটোই প্রথম সত্তার বিভিন্ন বিন্যাস ও ধরনের মধ্যে মৌল ভাবনার (a priori) উপস্থিতি

অনুভব করেছিলেন। বঙ্কিম কাণ্টের ধারণা বুঝিয়ে বলতে গিয়ে, তাঁর 'জ্ঞান' প্রবন্ধে যেন প্লেটোর ধারণাটাই কাণ্টের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন: "ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি সর্বত্র একরূপ। এইজন্য আমাদিগের কাল, আকাশাদির সমবায়ের নিত্যত্ব জানিতে পারি। এই জ্ঞান আমাদিগেতেই আছে—এজন্য কাণ্ট ইহাকে স্বতোলব্ধ বা আভ্যন্তরিক জ্ঞান বলেন।' কেন এই প্রত্যারোপ? বঙ্কিমের স্বাদেশিক আবেগযুক্তি এখানে অত্যন্ত প্রকট, কেন না তিনি পরক্ষণেই সিদ্ধান্ত করেছেন, 'পাঠক আবার দেখিবেন যে, আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন, ফিরিয়া ফিরিয়া সেই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে মিলিতেছে।'

কোথায় এই কাকতালীয় মিল ঘটল, আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে তার কোনো আভাস পাই না। ভাবতে বসি, কাণ্টের সঙ্গে 'ভগবদ্‌গীতা'র সাদৃশ্য যেখানে অব্যর্থ, বঙ্কিম কেন তার ধারে কাছে ঘেঁষলেন না? গ্রেগর পাউল তাঁর 'এশিয়া ও ইয়োরোপ তুলনামূলক দর্শন' (Asien and Europa—Philosophien in Vergleich) বইতে একটি বৈদ্যুতিক উক্তি করেছেন: 'ভগবদ্‌গীতায় আছে নিষ্কাম কর্মের কথা, যার পাশে কাণ্টের বস্তুদহ দর্শনের তপশ্চর্যা (যা গীতার সঙ্গে চূড়ান্ত সাদৃশ্যবহ) বড়ো বিবর্ণ দেখায়।' এভাবে দেখলে হিন্দু দর্শন এবং কাণ্ট উভয়ের প্রতিই হয়ত বঙ্কিম সুবিচার করতেন।

আসলে ভারতীয়তা বলতে জড়ের উপরে চৈতন্যের একাধিপত্যই বোঝায়, এই ধারণাবশে তিনি ইয়োরোপীয় 'জড়বাদী' সভ্যতাকে বিচার করেছেন। কখনো-কখনো ইয়োরোপীয় সভ্যতা বা সাহিত্যের কোনো-কোনো প্রতিভূ-পুরুষের কোনো-কোনো উপলব্ধির প্রশংসাও তিনি শুধুমাত্র এই কারণেই করেছেন, কেন না তাঁর মনস্কতায়, আমাদের দেশেই তাদের পূর্বসূত্র (যেমন 'কতকগুলি বৈদিক ঋষি তাহা বুঝিতেন') রয়ে গিয়েছিল। জড়কে জড় হিসেবে দেখা উপাসনার দ্বিতীয় স্তর, এরকম ঠাউরে তিনি যখন বলেন 'গেটে (Goethe) বা বর্ডস্বর্থ (wordsworth) এই জাতীয় জড়োপাসক' (এই আজগবি ধারণাটা তিনি কোথায় পেলেন?), সেখানেও বৈদিক ভারতের মহিমা প্রচার তাঁর লক্ষ্য। আমাদের মনে হয়, তাঁর জড়-চেতনের দ্বন্দ্বসংক্রান্ত বোধ শংকরাচার্যের 'স্বাত্ম-প্রকাশিকা'র দ্বারা বিভাবিত (তুঃ, চিদ্রূপত্বান্ন মে জাড্য সত্যত্বান্নানৃতং মম। /আনন্দত্বান্ন মে দুঃখ মজ্ঞানাদ্ ভাতি তৎত্রয়ম্' অর্থাৎ 'আমি চৈতন্যময়, আমার ভিতরে জড়তা নেই; আমি-সত্যস্বভাবী, আমার মধ্যে মিথ্যে নেই; আমি আনন্দময় আমার মধ্যে দুঃখ নেই—অজ্ঞান থাকার দরুণই জড়তা, মিথ্যা এবং দুঃখ প্রকাশ পায়)। এই তত্ত্ব শংকরাচার্যে এক অপূর্ব শিল্পরূপ পেয়েছে: 'আমি ছাড়া দেশ না থাকায় আমি কোথায় আবার যাব ('হ্বদেশাভাবাৎ ক্ব গন্তব্যং')?' অমরনাথ যখন বলেন, 'আমার অন্তরে যাহা আছে, তাহা তোমায় বাহ্য জগৎ দেখাইবে, সাধ্য কি? যে

কুসুম এ মৃত্তিকায় ফুটে, যে বায়ু এ আকাশে বয়, যে চাঁদ এ গগনে উঠে, যে সাগর এ অন্ধকারে আপনি মাতে তোমার বাহ্য জগতে তেমন কোথায়।', বঙ্কিম তাঁকে দিয়ে প্রাচ্যভারতীর সেই সুন্দর অহংকার সুন্দরভাবেই ব্যক্ত করেন। কিন্তু পরক্ষণেই অমরনাথকে জড়ত্বের প্রতি সুপ্ত প্রলোভনের জন্য তিনি দেশে-দেশে ঘুরিয়ে মারেন।

অত্যল্পপরিসরের মধ্যেই ঈষৎ বেপথুমান চরিত্রকে তিনি যেভাবে নাকানি চোবানি খাওয়ান, সেরকম অতর্কিতে কখন প্রতীচ্যের মননশিল্পীদের বর্গীকরণকেও প্রাচ্যায়িত করে বসেন। 'চৈতন্যবাদ' প্রবন্ধের একই জায়গায় যখন তিনি বলেন, 'এই সত্য (The True), শিব (The Good) এবং সুন্দর (The Beautiful) এই ত্রিবিধ ভাব মানুষের উপাস্য,' অনিবার্যতই আমাদের মনে পড়ে যায় ভিকতর কুজ্যাঁর 'সত্য, সুন্দর, মঙ্গল' (Du vrai, du beau et du bien/১৯৫৪) নামক একটি অসামান্য গ্রন্থের প্রসঙ্গ। ঐ বইটি যেন ভারতবর্ষেও লেখা হতে পারত, এরকম কথাই পাঠকের মনে আসে। কিন্তু যেহেতু ব্রাহ্ম ঠাকুরবাড়িতে ঐ গ্রন্থ প্রচারিত হয়েছিল, তার উপরে স্বরচিত বৈদিকতা আরোপ করে বঙ্কিমচন্দ্র তাকে 'শুদ্ধ' করে নেন। প্রশ্ন ওঠে, ঐ সব ভারতীয় ধ্যানচিন্তার পাশাপাশি বন্ধনীতে কেন তিনি তাহলে অনবরত ইংরেজি সংজ্ঞাশব্দ ব্যবহার করছেন? তার কারণ, প্রতিযোগিতা করে তিনি দেখাতে চাইছেন, সমকালীন ইয়োরোপের এসব চিন্তা শাশ্বত ভারতেরই উত্তরাধিকার, পশ্চিম তাকে অসম্পূর্ণ অর্থে ব্যবহার করেছে।

কার্ল মার্কস যতই বলুন, প্রচলিত অর্থে ভারতবর্ষে স্বর্ণযুগ বলে কোনো কিছু ছিল না, বঙ্কিম তারই প্রবর্তনায় প্রাচীন কল্পভারতের সঙ্গে সমসাময়িক পশ্চিমের তুলনা করে তাকে জড়বাদী অথবা পথভ্রষ্ট বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইয়োরোপের তৎকালীন ভারততাত্ত্বিকদেরও তিনি একই গরজে যেভাবে নির্জিত করেছেন, সেটা বড়ই হৃদয়হীন ঠেকে। তাঁরাও তো বঙ্কিমের মতোই, আহৃত তথ্যের মাধ্যমে একটি ভারত প্রতিমা নির্মাণ করে নিতে চেয়েছিলেন। একমাত্র সেক্ষেত্রেই, যখন পশ্চিম এবং অনুকৃতিপ্রিয় ভারতীয়দের তিনি একই পর্যায়ে অন্তর্গত করে কৌতুকোজ্জ্বল ব্যক্তি-রচনা লিখেছেন, সামঞ্জস্যের বিধানে তাঁর জাতীয়তাবোধ শ্রীমন্ত হয়ে উঠেছে। তাই উপন্যাসে নয়, প্রবন্ধেও নয়, একমাত্র 'কমলাকান্তের দপ্তরে'ই, প্রসন্ন নির্দলীয় দৃষ্টিপাতে সম্পন্ন স্বদেশভাবনা আমাদের কাছে একাধারে উপভোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। যখন তিনি বলেন, 'দুই রকমের পলিটিকস দেখিলাম—এক কুকুরজাতীয়, আর এক বৃষজাতীয়। বিস্মার্ক এবং গর্শাকফ এই বৃষের দরের পলিটিশ্যান—আর উলসি হইতে আমাদের পরমাত্মীয় রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর পর্যন্ত অনেকে ওই কুকুরের দরের পলিটিশ্যান,' তাঁর সেই সমীক্ষণ, আত্মস্থ বহুদর্শিতা এবং তীক্ষ্ণ্যান্ত

আত্মসমীক্ষণের সমবিতরণে আজো, অথবা আজই, আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। নিজের এই ধরনের রচনাকে বঙ্কিম 'ননসেন্স' আখ্যা দিয়ে বলেছেন, এরকম তিনি অন্তহীন প্রাচুর্যে লিখে যেতে পারেন। কেন তিনি আমাদের জন্য এমন আরো অনেক আপাতঅর্থহীন বিশ্রম্ভালাপের নিদর্শন রচনা করে গেলেন না, সেজন্য আজকে পাঠকের অভিমান স্বাভাবিক।

কিন্তু সেটা বঙ্কিমের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি যে শুধু লিখতেই আসেন নি, শেখাতেও এসেছেন সেই অতিরিক্ত বিবেচনায় সৃষ্টিধর্মী রচনা থেকে তিনি বিরত হলেন। ভিক্টোরীয় যুগের জাতক বঙ্কিম, মেকলের মতোই, সৃজন থেকে গঠনে বৃত হতে গিয়ে অতীতের কৃপণ সংরক্ষণে শক্তিক্ষয় করাটাই প্রধানতম কর্তব্য বলে গণ্য করলেন। তাঁর পূর্বসূরি মধুসূদন তাঁর সর্বশক্তি নিয়ে যেখানে শর্ত ছাড়াই ভবিষ্যতের দিকে তাঁর নন্দনসত্তা মেলে ধরেছেন, বঙ্কিম সাহিত্যকে স্বপর্যাপ্ত আধার বলে মনে না করে তাঁর মনীষা ও মননের মাধ্যমে পরিণত করে তুলেছেন। ঔপনিবেশিক আবহে, ইংরেজদের অগোচরেই, মার্কসকথিত যে বিপ্লব শুরু হয়ে গিয়েছিল, মধুসূদনের কপালে ছিল তারই জয়তিলক, তাঁর যাত্রা তাই মিলটনের ইংল্যাণ্ডে সমাপ্ত হয়নি, দেশে-দেশান্তরে প্রসারিত হয়ে গিয়েছে। তিনিই প্রথম ভারতীয়, যিনি ইয়োরোপকে আবিষ্কার করেছেন এবং সেই আবিষ্ক্রিয়ার পথেই ভারতাত্মার সন্ধান পেয়েছেন। সেকাজ তাঁকে স্বতন্ত্রভাবে করতে হয়নি, রচনার প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকেই তার স্বতশ্চালনা ঘটেছে। সৃষ্টি-কর্মের দুই পুরাণসিদ্ধ প্রাক্‌পুরুষ দিয়নুসাস এবং অ্যাপোলোর সঙ্গে আমাদের এই দুই শিল্পীর তুলনা করা যায়। দিয়নুসিয় পথটি তত্ত্বলেশমুক্ত যেখানে উদ্‌ঘাটনের, চ্যালেঞ্জের আনন্দে চঞ্চল, অ্যাপোলোপ্রাণিত শক্তি সেক্ষেত্রে সব-কিছু ভেবেচিন্তে ভারসাম্যের ভীরুতায় সতর্ক এবং সংগঠনপ্রিয়। দিয়নুসিয় পন্থায় শিল্পী নিজেকে সৃষ্টির মুহূর্তে উন্মোচিত করেন, পক্ষান্তরে অ্যাপোলোনিয় সংস্কারক প্রায়শই খুঁৎখুঁতে, হাতে পুঁথিপঞ্জিকা ও প্রমাণপত্র নিয়ে চলতে-চলতে শুধু অন্যান্য পথচারীর নয় নিজের যাত্রাও প্রতিহত করে তোলেন। মধুসূদন, এই মানদণ্ডে, দিয়নুসিস পথের বাধাবিমুক্ত পথিক, যিনি আমাদের সময় ধরে হাঁটছেন এবং অ্যাপোলোধর্মী বঙ্কিম আমাদের ঐতিহ্যচেতন করে তুলতে গিয়ে নান্দনিক অর্থে আমাদের আর আকর্ষণ করতে পারছেন না।

শুধু উনিশ শতকীয় বাঙালি সমাজের দুটি শক্তির ক্ষেত্রেই নয়, প্রদত্ত সময়ের শেষ পর্যায়ে অন্যান্য অঞ্চলে ভারতীয় শিল্প ধারণার সূচনাতেও আমরা আমাদের স্বভাবের এরকম দ্বিমুখিতার পরিচয় পাই। মারাঠি দুজন মধ্যবিত্ত চিন্তানায়ক, বালগঙ্গাধর তিলক (১৮৬৫-১৯২০) এবং গোপালকৃষ্ণ গোখলে (১৮৬৬—১৯১৫) যথাক্রমে অতীতাশ্রয়ী এবং বিশ্বমুখী ভাবনার

মধ্যে তাঁদের স্বদেশপ্রেম ন্যস্ত করেছিলেন। এঁদের উভয়েরই পশ্চাৎপটে ছিলেন মেকলের থেকে সম্ভবত আরো অনেক বেশি উদারনৈতিক মাউন্ট স্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন। আমরা শেষ পর্যন্ত দেখতে পাই মহারাষ্ট্রের সাহিত্যে গোখলের সংস্কারমুক্ত স্বদেশধারণারই প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। কিন্তু এঁরা উভয়েই ছিলেন সমাজসংস্কারক, তাই কীভাবে সাহিত্যলেখকদের মানসে তাঁদের অভিঘাত ঘটেছিল, সে প্রসঙ্গ এখানে ততটা জরুরি নয়।

প্রসঙ্গত শুধু এটুকুই বলা চলে, যুগের দায়ভাগ শিল্পীর উপর কী করে বর্তায় এবং তিনি তার রূপান্তরে তাঁর শিল্পকে কতখানি মর্যাদা দেন, সেটাই আমাদের কাছে অনুসন্ধানের পরিধি। ফুকো দুরকম সংস্কৃতিরূপের কথা বলেছেন: একটি শাসকের এবং অন্যটি তাকে সম্ভব করে-তোলা প্রখর প্রতাপের (sous sol) আওতায় বেড়ে ওঠা বিজিত সংস্কৃতি। দ্বিতীয় সংস্কৃতির ধারাকে ফুকো 'বিপন্নের জ্ঞান' হিসেবে দেখেছেন। ব্রিটিশরাজের উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি সাংস্কৃতিক রাজনীতি (Kulturpolitik) রচনা, যার ফলে তার ক্ষমতা ভারতবর্ষে অব্যাহত থাকে। আমাদের সৃজন শিল্পীরা বিজেতার ঐ সংস্কৃতির ইডিয়ম আয়ত্ত করে নিয়েই ক্ষান্ত হননি, বিজিত, বিপন্ন নিজস্ব সংস্কৃতিরূপের বিভিন্ন সম্ভাব্য উপাদান কাজে লাগিয়েছেন। 'বিপন্নের জ্ঞান'কে, ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে, এমন-কি প্রতিস্পর্ধীর জ্ঞানশক্তিতে পরিণত করেছেন বঙ্কিম। কিন্তু সেইখানেই তাঁর সীমা। অন্যদিকে, মধুসূদনের স্বভাবই ছিল স্বাধীনতা যুগের কাছ থেকে পাওয়া দায়িত্বকে অনায়াসে পালন করেও তিনি, প্রতীচী-প্রাচীর দ্বিসাংস্কৃতিকতা ইত্যাদি অবান্তর বিবেচনা বালাই না করে, সৃষ্টির আনন্দে আমাদের শতককে স্পর্শ করলেন। এতই তিনি আমাদের আলোড়িত করে আছেন যে তাঁর রচনা থেকে অংশ নিয়ে আজকের পৃথিবীর নানা দেশে সুযোগসন্ধানী নানান সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের আয়ুধও সহজেই আমরা পেয়ে যেতে পারি। কিন্তু সেটাই তাঁর পরিচিতি নয়। এমন-কি সারা এশিয়ার মধ্যে প্রথম ব্ল্যাংক ভার্স বা সনেটের পায়োনিয়র জনক, কিংবা 'যথার্থ স্বদেশপ্রেমী' বা 'প্রকৃতই বিশ্বনাগরিক' এসমস্ত কোনো পদবীর নিগড়ে আমরা তাকে দেখতে চাইলে সেটা হাস্যকর হবে। আসলে তিনি যে আমাদের এত নিবিড়ভাবে অধিকার করে আছেন, তার কারণ তাঁর কাছ থেকে আমরা বাঁচার একটি বিনীত অথচ স্পর্ধিত পারমিতা পেয়ে যাই: শিল্পীর মুক্তির শেষ নেই।

আরোহ-অবরোহ

রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম পর্যায় : ব্রাহ্মমুহূর্তের সন্ধিক্ষণে

গীতাঞ্জলি প'ড়ে এজরা পাউণ্ডের মনে পড়েছিল দান্তের পারাদিসোর কথা। এই তুলনাসূত্রটিকে ক্লিষ্ট না করেও বাড়িয়ে নেওয়া চলে। এমন কথা অসংকোচে বলা চলে রবীন্দ্রনাথকেও দান্তের মতো পর্যায় থেকে পর্যায় পার হয়েই পরিণতির দিকে যেতে হয়েছিল। Karl Vossler-এর বিশ্লেষণে এ-কথা প্রমাণিত হয়েছে, দান্তের উদ্ভাসিত ঈশ্বরস্তোত্রের পূর্বপটে আছে মানবস্বভাবের অনালোকিত, অমীমাংসিত স্তর। বিশেষ Canzoniere-এর এক গুচ্ছ কবিতায় সেই রক্তমাংসের দেহমানস এতো স্পষ্ট এতই উচ্চারিত যে তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন অন্তর্দ্বন্দ্বটি চিনে নেওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয় না। অথচ কে না জানে এ শুধুই একটি স্তর, যাকে ছাপিয়ে দান্তের মিলনান্ত মন্ত্রভাষণ, পারাদিসোর সৌরশিখর। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এভাবে স্তরনিরূপণ যে একান্ত অসম্ভব এমন কথা মেনে না নিলেও এ-কথা বলব তিনি সে-সুযোগ আমাদের একরকম দেননি। তাঁর রচনার প্রথমতম পর্যায়টিকে তিনি কেন সূর্যের মুখ দেখাতে কুণ্ঠিত ছিলেন, তার কারণ দেখাতে গিয়ে তিনি বলেছেন তাঁর সেই পর্বের রচনায় ভূ-সংস্থান জেগে ওঠেনি। এখানে একটু তলিয়ে দেখলেই চোখে পড়ে রবীন্দ্রনাথ কবিতাকে প্রায় প্রথম থেকেই ভাষার সমস্যা হিসেবে নিতে উদগ্রীব ছিলেন। এবং সেই ভাষাকে মানুষের পবিত্রতম সাংস্কৃতিক পরিচয়, তার আদান-প্রদানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠতম সম্পদ ব'লে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন। ফলত তারুণ্যের প্রথম বাঁকে ঘুরেই তিনি ভাষার সেই ভূমিকা সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন হয়ে উঠলেন। আজ যাকে আমরা 'অচলিত সংগ্রহ' ব'লে অভিহিত করছি, তার সঙ্গে তাই তাঁর পরবর্তী রচনাবলির আপাত-দুস্তর ব্যবধান। অচলিত সংগ্রহ বা তৎসংক্রান্ত কবিতাবলি অসমান, স্বভাবের কাছাকাছি, অনতিশীলিত। এর

অব্যবহিত পরেই আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে দেখিতে পাই মননে ও কথনে সুসমঞ্জন, আদর্শের আভায় দীপ্যমান, পরিশীলিত রূপে। গীতাঞ্জলির অনেক আগেই, চিত্রায়—এমন-কি তারও আগে, সম্ভবত প্রভাত-সংগীতেই পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে তাঁর আত্মসচেতন শব্দব্যবহার, সৌজন্যসুন্দর আলাপচর্চার বরেণ্য মূর্তিটি দেখা গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর সেই আতিথেয়তা নিরুত্তাপ নয়, আদর্শবাদ স্বভাব-বিবিক্ত নয়। অচলিত সংগ্রহের অনাদৃত ধূসর পাণ্ডুলিপি থেকে মানসীর এক পর্যায়ের রক্তিম কবিতাগুচ্ছ পর্যন্ত তাঁর কবিতার ঐহিক সত্তার তীব্র উত্তাপ কখনো অবাধে কখনো অতর্কিতে প্রকাশমান।

সেই মুহূর্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে নিশ্চয় আত্মনির্মিতির, দোলাচলের। তরুণ রবীন্দ্রনাথের মনে সেই মুহূর্তের অভিঘাত যে-প্রবণতা সূচিত করেছিল, তাকে কি সাহিত্য সমালোচনার পরিভাষা অনুসারে নিয়ো-রোমাণ্টিক বলব? যতোদূর মনে পড়ে, ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পূর্বে এবিষয়ে চিন্তান্বিত হননি। রোমাণ্টিক কাব্য-আন্দোলনের অণুসূক্ষ্ম স্তর-বিবর্তন বর্ণনাপ্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ 'রোমাণ্টিক' ও 'নিয়ো-রোমাণ্টিক' শব্দ দুটিকে স্বতন্ত্র ক'রে দেখতে চেয়েছিলেন। শেষোক্ত শব্দটির তাৎপর্য নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি এক যুগসন্ধির কথা স্পষ্ট ভাষায় বলে ছিলেন:

It is needles to state we resume the term neo-romantic for the epoch, or stage, which is the subject of this paper, giving it wider and comprehensive meaning, according to the terms neo-classical and neo-oriental. —*New Essays in Criticism*

নূতন প্রাচীর যে দু-জন কবি এই মুহূর্তে সতীর্থ, সক্রিয় ও নব্য রোমাণ্টিকতার লক্ষণে চঞ্চল, তাঁরা অক্ষয়কুমার বড়াল ও রবীন্দ্রনাথ। একদিকে ভারতবর্ষীয় মনোভঙ্গি অর্পণে উন্মুখ, অপর দিকে সদ্য-সমাগত পশ্চিমী কবিতার থেকে অর্জিত অবাধ্য হৃদয়ের ভাষা এঁদের তখন নিরন্তর দোটানায় উচাটন করেছে। তাই

উন্মত্ত কবির মত/গড়ে ভাঙে অবিরত/লয়ে এক অন্ধ শক্তি কল্পনাভীষণ—

অক্ষয়কুমারের এই অকপট ক্রন্দনের উত্তেজনা মানসী-পর্বের রবীন্দ্রনাথেও:

মনে হয় সৃষ্টি বুঝি বাঁধা নাই নিয়ম নিগড়ে
আনাগোনা মেলামেশা সবই অন্ধ দৈবের ঘটনা।

যদিও একই কবিতার অন্তিম স্তবকে কবিপ্রদত্ত সান্ত্বনা:

সত্য আছে স্তব্ধ ছবি/যেমন উষার রবি

তবু সন্দেহ থাকে না রবীন্দ্রনাথ তখনো দ্বিধাবিদ্ধ, প্রশ্ন-জর্জরিত। যে যন্ত্রবিশ্বের সঙ্গে হৃদয়ের সংঘর্ষে অক্ষয়কুমার জীবনকে বলেছেন 'অদৃষ্টের ছলা', রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'জড়ময় সৃজন' তার সঙ্গে রফানিষ্পত্তির চেষ্টায় তাঁদের কবিতা দীর্ঘদিন সংক্ষুব্ধ, প্রস্তুতিময়।

সেই সময়ে রচিত 'কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন' নামক একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কবিতার নূতন ভূমিকা সম্পর্কে যে-অভিমত জানিয়েছেন তাতে কবির সচেতন সংকল্প ধরা পড়েছে :

> জ্ঞানের অনুশীলন যতই হইতেছে, অজ্ঞানের অন্ধকার ততই বাড়িতেছে, ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন? অন্ধকারের মানচিত্র ক্রমেই বাড়িতেছে, বড় বড় বৈজ্ঞানিক কলম্বস-সমূহ নূতন নূতন অন্ধকারের মহাদেশ বাহির করিতেছেন। নিশাচরী কবিতার পক্ষে এমন সুখের সময় আর কি হইতে পারে। সে রহস্যপ্রিয়, কিন্তু এত রহস্য কি আর কোন কালে ছিল!...পাঠকেরা যদি ভাবিয়া দেখেন, যে, এখানকার কোন কবি যথার্থ সত্য মনে করিয়া বা উষা বা সন্ধ্যার একটা গড়ন বাঁধিয়া দেন, সকল লোকেই যদি তাহাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া শিরোধার্য করিয়া লয়, তাহা হইলে কবিতার রাজ্য কি সংকীর্ণ হইয়া আসে!...যতই জ্ঞান বাড়িতেছে ততই কবিতার রাজ্য বাড়িতেছে। কবিতা যতই বাড়িতেছে কবিতার ততই শ্রমবিভাগের আবশ্যক হইতেছে, ততই খণ্ডকাব্য গীতি-কাব্যের সৃষ্টি হইতেছে।

অর্থাৎ, সত্য যে আপেক্ষিক, সেই কথা এখানে বলা হলো। এবং এ-কথাও প্রকারান্তরে অভিব্যক্ত হলো যে কবি কোনো সার্বজনিক সত্যের উদ্গাতা নন, তিনিও রহস্যময় অন্ধকারের মন্ময় ভাষ্যকার এবং লিরিক অথবা লিরিকধর্মী কবিতা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির অনুভূতির আধার, কবিকাহিনীতে এইসব কথাই কবিতায় অনূদিত করছে ঃ

> নিশাই কবিতা আর দিবাই বিজ্ঞান। / দিবসের আলোকে সকলি অনাবৃত,
> সকলি রয়েছে খোলা চোখের সমুখে —/ফুলের প্রত্যেক কাঁটা পাইবে দেখিতে।
> দিবালোকে চাও যদি বনভূমি পানে,/কাঁটা খোঁচা কর্দমাক্ত বীভৎস ভাঙ্গন
> তোমার চোখের পরে হবে প্রকাশিত, / দিবালোকে মনে হয় সমস্ত জগৎ
> নিয়মের যন্ত্রচক্রে ঘুরিছে ঘর্ঘরি। / কিন্তু কবি নিশাদেবী কি মোহন মন্ত্র
> পড়ি দেয় সমুদয় জগতের পরে/সকলি দেখায় যেন রহস্যে পূরিত।

রাত্রির এই স্তব পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ক্ষমাহীন বস্তুসত্যকে নিজের মতো ক'রে সাজিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা থেকে এর জন্ম। তাই প্রায় পরমুহূর্তেই প্রকৃতির প্রতি কবির প্রগাঢ় অনাস্থা ঃ

> মানুষের মন চায় মানুষেরই মন,
> গম্ভীর সে নিশীথিনী, সুন্দর সে উষাকাল
> বিষণ্ণ যে সায়াহ্নের ম্লান মুখচ্ছবি
> বিস্তৃত যে অম্বুনিধি, সমুচ্চ সে গিরিবর,
> আঁধার যে পর্বতের গহ্বর বিশাল,
> তটিনীর কলধ্বনি, নির্ঝরের ঝর ঝর,
> আরণ্য বিহঙ্গদের স্বাধীন সঙ্গীত,
> পারেনা পুরিতে তারা, বিশাল মনুষ্যহৃদি
> মানুষের মন চায় মানুষেরই মন।

আজকের পাঠক ঐ মানুষেরী শব্দটিকে 'মানুষী' শব্দের সঙ্গে একাকার ক'রে ফেলতে পারেন—জীবনানন্দের অনুষঙ্গে ঃ

তবুও কাউকে আমি পারিনি বোঝাতে

সেই ইচ্ছা সঙ্ঘ নয় শক্তি নয় কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়

আরো আলো ঃ মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়। ('সুরঞ্জনা')

এবং জীবনানন্দের মতোই রবীন্দ্রনাথ কৈশোর পর্যায়ের কবিতা প্রেম ও অপ্রেমের দ্বন্দ্বে জীবন্ত, প্রেম ও মৃত্যুর তত্ত্ব লেশশূন্য সংস্পর্শে সংরক্ত। এই প্রেম যে ইন্দ্রিয়স্পর্শী তার অভিজ্ঞান 'রাক্ষসী স্বপ্নের তরে, ঘুমালেও শান্তি নাই / পৃথিবী দেখিত কবি শ্মশানের মত' এই রকম উচ্চারণে প্রকট। ফলত, মৃত্যুও যে ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে রোমাঞ্চকর, আকাঙ্ক্ষাসুন্দর তারও দৃষ্টান্ত আদৌ বিরল নয় ঃ

মনের কঙ্কাল শুয়ে ভস্মের শয্যায়/কানের কাছেতে গিয়ে বায়ু কত কথা ফুসলায়!

তটিনী কহিছে কানে উঠ। উঠ। উঠ নিদ্রা হতে/ঠেলিয় শরীর তার ফিরে ফিরে তরঙ্গ আঘাতে।

অধোরেখ অংশের স্বরক্ষেপ ছাড়াও পাঠকের মনে পড়বে জীবনানন্দকে, মনে পড়বে জীবনানন্দের 'শব' নামক কবিতাটি কোনো রমণীর মৃতদেহ ঘিরে নিসর্গচিত্রণ। প্রসঙ্গত, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর নাম অনিবার্য। অক্ষয়চন্দ্রের 'উদাসিনী' মিলনান্ত একটি আখ্যায়িকা হলে আধুনিক মানসের নানা উপাদানে আপূর্যমান। আজকের পাঠকের কাছে এই আখ্যায়িকার তিন-চতুর্থাংশ কাব্যাংশে পাংশু ব'লে গণ্য হবে। কিন্তু এর আপাতমেদুর প্রচ্ছদ সরিয়ে ভিতরে তাকালেই চোখে পড়বে কবির অস্থির একটি অন্তর্জ্বালা। কবি এমন কয়েকটি সমস্যা উত্থাপন করেছেন যা নিছক রোমাণ্টিক নয়, নিয়ো-রোমাণ্টিক। বলা যায়, ব্যক্তিচরিত্রের আত্মসন্ধানই অক্ষয়চন্দ্রের কবিতার অন্যতম বিষয়। রোমাণ্টিক কবির লক্ষ্য অবাধ আত্মপ্রকাশ, ভাবাবেগের স্বতঃস্ফূর্ত মূর্তন। পক্ষান্তরে, নিয়ো-রোমাণ্টিক কবির উৎসাহ আত্ম-সন্ধিৎসায়, ভাবনা-মননে। সেই অর্থে অক্ষয়চন্দ্রের কাব্য নিয়ো-রোমাণ্টিক। এই কাব্যের প্রেমিক প্রতিশ্রুত তৃপ্তির মুহূর্তে পলাতক, প্রেমিকা পাপবোধে জর্জরিত। সেই প্রেমিকের বিস্ময়কর অন্তর্ধানের মুখে ঃ

ভয়ঙ্কর বেশ ধরি কল্পনা শত্রুতা করি

বিভীষিকা করে প্রদর্শন।

এবং অন্বেষণের মুহূর্তে প্রেমিকার মনে হয় ঃ

মহিষ ওয়ার কত চেয়ে চেয়ে থাকে,

পাপিনী বলিয়ে বুঝি ছুঁলে না আমাকে।

তন্ন তন্ন করি দেখি! দেখি চারিধার—

সহসা সাহস ভঙ্গ, আতঙ্কে শিহরে অঙ্গ

শুনিলাম শৃগালের অশিব নিনাদ
গৃধিনীর ঘোর রবে আকুলিত বনে সবে
ভাবিলাম কি জানি কি ঘটেছে প্রমাদ।
ঘুরিছে মেদিনী চক্রের মতন,
ভয়ের বিভ্রমভরে, ভয়ঙ্কর কলেবরে
বহুরূপী বিভীষিকা করি নিরীক্ষণ।

এই বহুরূপী বিভীষিকা অবশ্য অচিরেই অক্ষয়চন্দ্রের পৌরোহিত্যে একটি ধর্মীয় শুভৈকসুন্দর পরিণতি লাভ করেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কৈশোর রচনা পর্যায়ে অশুভ ও অসুন্দরকে একটি ব্যাপক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। জীবন নামক প্রকাণ্ড অনিশ্চয়তাকে বুঝবার জন্য বিপজ্জনক নিরীক্ষার ঝুঁকি নিয়ে তাঁর বয়ঃসন্ধির নায়কেরা প্রায়শই, কখনো কখনো ছেলেমানুষির ছাপ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে :

রুসিয়ার হিমক্ষেত্রে আফ্রিকার মরুভূমে
যাব একবার আমি করিগে ভ্রমণ! (কবিকাহিনী)

এবং পরিব্রাজকের এই দুর্মর পিপাসা যেমন পুরুষ চরিত্রকে চিহ্নিত করেছে, তেমনি নারীচরিত্রকেও বিশেষত নারীর পাপবোধ ও আত্মবিশ্লেষণে তাঁর এই পর্বের চরিত্র-চিত্রণকে রক্তাভ ক'রে তুলেছে :

সেই মূর্তি নীরদের! সে মূর্তি মোহন / রাখিলে বুকের মধ্যে পাপ কেন হবে?
তবুও সে পাপ আহা নীরদ যখন / বলেছে, নিশ্চয় তারে পাপ বলি তবে! (বনফুল)

সচেতন পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, নারীর এই পাপবোধ রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তিতায় ক্রমশ পুরুষের পাপবোধ ও আত্মবিশ্লেষণে রূপান্তরিত ও শক্তিশালী হয়েছে। মানসীর 'নারীর উক্তি', 'পুরুষের উক্তি', 'নিষ্ফল কামনা', 'সুরদাসের প্রার্থনা' প্রভৃতি কবিতা পড়লেই এই কথাটি নির্ধারিতরূপে প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ মানসীতে এসে পুরুষের কাছে নারী অনুধাবনের, অনুধ্যানের, উপাসনার বিষয় হয়ে উঠেছে; ইতিপূর্বে যে তারা সমস্তরে দাঁড়িয়েছিল, অস্তিত্বের মুহূর্ত-লাঞ্ছিত বাস্তবতায় একযোগে আক্রান্ত হয়েছিল, সেই স্বেদাক্ত সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার স্তর থেকে এবার নারীকে বিশ্রাম দিলেন। এ-কথা তাঁর কয়েকটি ছোট গল্প ও উপন্যাস সম্পর্কে খাটে না, কিন্তু কবিতা সম্পর্কে তীব্ররূপে প্রযোজ্য। মানসীর 'অনন্ত প্রেম' কবিতায় নারীকে ঈশ্বরীর ভূমিকায় নিরীক্ষণের প্রথম প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে। চিত্রায় নারী ও ঈশ্বরী একাকার এবং সেই যুগ্মসত্তাকে জীবনদেবতা বা বিশ্বদেবতা যে নামেই অভিহিত করি না কেন, তা বিয়াত্রিচের মতোই কবির কাছে সত্য, ঊর্ধ্বাকর্ষী, পরীক্ষোত্তীর্ণ পূর্ণতার প্রতিমা। সেই নারীশ্বরী কবিকে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে শুদ্ধশীল সুন্দরের ধারণায় চালিত ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন। দান্তের মতোই জীবনব্যাপী সেই অভিসার, সেই দিব্য ভাবসম্মেলনের

প্রতিশ্রুতি। নারীর হাত থেকে পূর্ণতার ছাড়পত্র অর্জনের পৌরুষব্যঞ্জক সংগ্রামে দান্তে ও রবীন্দ্রনাথের জীবন বেগবন্ত সাংকেতিক নাটকের উদাহরণ।

পূর্ণতা অর্জনের এই সংগ্রাম যখন মানচিত্রের মতো ক্রমপ্রসারী নব নব দিগন্তের সম্ভাবনায় প্রতিশ্রুতিময় হয়ে ওঠে নি, সেই সময়ের রচনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অস্বস্তি ছিল স্বাভাবিক কারণেই অত্যন্ত বেশি। সেই পর্বের রচনায় অস্পষ্টতা শুধু অনিবার্য নয়, বরণীয় ছিল। 'ভুল' (১৮৮৭) নামক কাব্যগ্রন্থের সূচনায় অক্ষয়কুমার গ্যেটের বচন ইংরেজি তর্জমা থেকে উদ্ধৃত ক'রে পাঠককে জানিয়েছিলেন' 'All good lyrics must be reasonable as a whole, and yet in details a little unreasonable' অক্ষয়কুমার তাঁর প্রতিটি গ্রন্থ পরিমার্জনা করেছেন, প্রকরণের প্রয়োজনে ভাবনার বশ্যতা ঘটিয়েছেন। লিরিকের প্রধান শর্ত যে শৃঙ্খলাশূন্য জীবনের পাশাপাশি মিতায়তন রূপকল্পের সাধনা, সেই কথা স্পষ্ট ক'রে 'প্রদীপ' (১৮৮৪) কাব্যের অন্তর্গত "গীত-কবিতা"য় গাঢ়স্বরে আমাদের জানিয়ে বলেছে ঃ 'নিটোল শিশির-কণা, বন্ধুরা মেদিনী।' রবীন্দ্রনাথও ইতিমধ্যে 'সন্ধ্যাসংগীত' লিখেছেন, লিরিকের ঋজুহ্রস্ব ও ঘনীভূত এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। কিন্তু তার আগে তাঁর অনচ্ছ 'ফর্ম'-শূন্যতা, রাগিণীর ধ্রুবপদে উপনীত হওয়ার আগে অস্থির আলাপ। তখন তাঁর মনে হয়েছে—

> অসংলগ্ন কথাগুলি, মরমের ভাব আরো / গোলমাল করি দিল প্রকাশ না করি।
>
> —কবিকাহিনী

অথবা

> সেই অর্থহীন কথা হৃদয়ের ভাব যত / প্রকাশ করিতে পারে এমন কিছু না। —ঐ

কাহিনী কবিতা রচনার আগ্রহ যখন অবসিত হয়ে এল, সেই সন্ধ্যাসংগীতে এই অস্থিরতা ছোটো-ছোটো কয়েকটি উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গবলয়ে ধরা দিয়েছে। স্তবকনির্মাণে অযত্ন থেকে শুরু ক'রে প্রস্বরবিক্ষোভে স্বৈরবৃত্ততার এই অভিব্যক্তি প্রকট। সন্ধ্যা, হলাহল, পরাজয়-সংগীত, তারকার আত্মহত্যা প্রভৃতি কবিতায় শিল্পরূপ শুধু অনুপস্থিত নয়, অবাঞ্ছিত। প্রভাতসংগীত বরং ঐ অপর্যাপ্ত আশাবাদের মধ্যেও কাব্যানুশাসনের আভাস দেখা দিয়েছে। প্রভাতসংগীতের প্রথম কবিতা আহ্বানসংগীতের আরম্ভেই আত্মধিক্কার মাত্রাবৃত্তের প্রসাদে সুরে বেজে উঠেছে ঃ

> মড়কের কণা, নিজ হাতে তুই / রচিলি নিজের কারা,
>
> আপনার জালে জড়ায়ে পড়িলি / আপনি হইলি হারা।

এ যেন পরবর্তীকালে তাঁর রচিত 'আপনারে দিয়ে রচিলি রে কি এ আপনারি আবরণ' গানটির পূর্বাঙ্কুর। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটির অজস্র পাঠ থেকেও এ-সিদ্ধান্ত ন্যায্য, 'প্রভাতসংগীতের' কবিচৈতন্যের অনিঃশেষ অপাবরণে উৎসুক। বিবেক যেন হৃদয়কে অন্তর্নিরুদ্ধ গুহা থেকে মুক্ত করে দিয়েছে কিন্তু সাবধান পাঠকের চোখে এই সত্য এড়াবে না যে সেই মুক্তি

নিঃশর্ত নয়। সেই শর্ত শোচনা নয়, পরিতাপ নয়, শুভ বিবেকের সাহচর্যে হৃদয়ের গ্লানিক্ষালন, রৌদ্র-স্নান। কিন্তু 'শৈশব যৌবন যখন সবে মিলেছে' সেই 'ছবি ও গানে' যেন কখনো-কখনো শেষবারের মতো হৃৎপিণ্ডের উৎকণ্ঠা ঘোষণা করার দুর্মর আগ্রহ। যেমন আর্তস্বর কবিতায় ঃ

নিশীথ সমুদ্র মাঝে জলজন্তু সম সাজে
নিশাচর যেন রে অগণ্য।

অথবা

এ অনন্ত অন্ধকারে কে রে সে, খুঁজিছে কারে
তন্ন তন্ন আকাশ গহ্বর।

কিংবা প্রত্ন-মাত্রাবৃত্তে ট'লে-যাওয়া অথচ আশ্চর্য অভিঘাতসম্পন্ন কবিতা রাহুর প্রেমে

কাছেতে দাঁড়ায়ে প্রেতের মতন, / শুধু দুটি প্রাণী করির যাপন/অনন্ত সে বিভাবরী।

কিন্তু এর অনতিপরেই রবীন্দ্রনাথের চিরবাঞ্ছিত উত্তরণ, 'মানসী'তে।

তোমাতে হেরিব আমার দেবতা / হেরিব আমার হরি—
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব / অনন্ত বিভাবরী ('সুরদাসের প্রার্থনা')

লক্ষ করা দুরূহ নয়, শেষোক্ত উদাহরণে নারী পুরুষের নিয়ন্ত্রী হয়ে উঠেছে দৈনন্দিন ঘনিষ্ঠতা থেকে কমনীয় অথচ পরিশীলন ব্যবধানে সরে গিয়ে।

'কড়ি ও কোমল' 'মানসী'র অব্যবহিত পূর্বলেখ। এই কাব্যের sensuousness যতই উচ্চারিত হোক তা তাঁর পূর্ববর্তী কবিতাপ্রবাহের ঐন্দ্রিয়িক অসন্তোষের তুলনায় অনেক শান্ত, সুমিত, এমন-কি রোমাণ্টিক লালিত্যে স্নিগ্ধ। 'কড়ি ও কোমল' নিজেকে কবি কিছুমাত্র নির্যাতন না ক'রে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তা কখনো গীতিবন্ধে, কখনো সনেটবন্ধে। এ দুটিই ব্যক্তিগত, অথচ ব্যক্তিগত নয়। আগের তুলনায় এ যেন দেহসংক্রান্ত নৈর্ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার অন্তরঙ্গ ভাষ্য। এখন থেকে তাঁকে আর নিজেকে প্রকাশ ক'রেও 'ব্যক্তিগত' ব'লে অভিযুক্ত হতে হবে না ঃ

চলো গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে
সুখ দুঃখ লয়ে সবে গাঁথিছে আলয়—
হাসি-কান্না ভাগ করি ধরি হাতে হাতে
সংসার সংশয়রাত্রি রহিব নির্ভয়। ('মরীচিকা')

'কড়ি ও কোমল'কেই রবীন্দ্রনাথ তাই তাঁর নিজস্ব প্রথম ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। অনিকেত বিষয়ী এখানে কোথাও নিজেকে আরোপ করেনি, বিষয়ের আশ্রয়লাভ করেছে। 'এই আমার প্রথম কবিতার বই যার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য ও বহির্দৃষ্টিপ্রবণতা দেখা দিয়েছে,' কবির এই উক্তি শ্লথকথন নয়, নিজের কবিতা বিষয়ে একটি সূত্র পেয়ে যাওয়ার উপলব্ধিতে আলোকিত। বিষয়ী এবং বিষয় রবীন্দ্রনাথের রোমাণ্টিকতায় একাসনে বসেছে 'কড়ি ও

কোমল' থেকেই, এবং সেই কারণেই এই কাব্যকে তিনি কবিতা হিসেবে প্রথম অনুমোদন জ্ঞাপন করেছেন।

এ কথার অর্থ এই নয় যে 'মানসী'তে বা 'মানসী'র পরে তিনি যা যা লিখেছেন সবই বিষয়ের সঙ্গে হৃদয়ের অন্যোন্য সামঞ্জস্যে, মগ্ন আত্মস্থতায় প্রতিষ্ঠিত। শুধু বলব, অস্মিতার সেই স্বরাঘাত কোথাও নেই যা বিষয়ের থেকে বিশ্লিষ্ট বা বিবিক্ত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। 'গীতাঞ্জলি' পর্যন্ত, এমন কি 'বলাকা' 'পলাতকা' পর্যন্ত এই বিষয়নিষ্ঠ হৃদয়ধর্ম প্রসারিত। এখানে আরেকটি সূত্রও লক্ষ্য করতে হবে। যে মুহূর্ত থেকে তিনি তাঁর খসড়া আমাদের দেখতে দিলেন, তিনি যেন আমাদের ব'লেই দিলেন যে আমাদের চোখের উপর তিনি নিজেকে অতিক্রম ক'রে যাবেন বারবার; একবার তিনি সিন্ধুতরঙ্গে নামবেন পরক্ষণে তীরে ফিরে আসার জন্য, একবার সারারাত্রি হাহাকার করবেন অকস্মাৎ প্রাতঃস্বননের জন্য। রোমাণ্টিক যন্ত্রপাতি এটুকু এড়িয়ে না গিয়েও তাকে মনঃপূত পরিণামের দিকে নিয়ে যাওয়া। এজন্য তাঁর কাব্যগ্রন্থের পরিপূরক, পরিণাম অব্যবহিত পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ। সন্ধ্যা সংগীত-প্রভাত সংগীত, কড়ি ও কোমল-মানসী, সোনার তরী-চিত্রা, খেয়া-গীতাঞ্জলি, শেষ সপ্তক-বীথিকা, প্রান্তিক-সেঁজুতি, রোগশয্যায়-আরোগ্য —কত উদাহরণ যোগ করব? এ-ভাবে মিলিয়ে পড়লে রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাবের সামগ্রিক সূত্রটি আমাদের কাছে মূর্ত হয়ে ওঠে।

'সোনার তরী'র শেষ কবিতা নিরুদ্দেশ যাত্রার সঙ্গে 'চিত্রা'র অন্তিম কবিতা সিন্ধুপারে যুক্ত ক'রে দেখলেই একটি আত্মসচেতন কবি-ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি চোখে পড়ে। দুটি কবিতার পটভূমি খুব কাছাকাছি। দুটিরই বিন্যাস ষাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তে, তফাৎ শুধু চলনে। যে-নারীটি তাঁকে সমুদ্রযাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন তিনিই সিন্ধুপারে নিয়ে এলেন তাঁকে। একই নারী দু-জনে, ইঙ্গিতভাষায় কথা বলেন, মন্ত্রচালিত কবিকে নিষ্ঠুরভাবে নিয়ে চলে যান এক রহস্যময় বিবাহ সভায়, দুরূহতর পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে হেসে ওঠেন। ঐ বিবাহ তাঁকে তো কোথায় বিশ্রাম করতে দিল না, নিরন্তর আত্ম-উত্তরণের যজ্ঞকর্মে জাগিয়ে রাখল। একটি অপরিণাম মুছে পরিণামে, সেই পরিণাম মুছে ফেলে অপর পরিণামে ধাবিত হবার নামই রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য নিজে কখনও সেই কৃতিত্ব দাবি করেননি, ঊর্ধ্বতন এক সত্তার কাছে হস্তান্তরিত ক'রে এগিয়েছেন। কিন্তু আমরা তো জানি সেই ঊর্ধ্বতন সত্তা—নারীই হোক আর জীবনদেবতাই হোক—নিজের সঙ্গে তাঁর নিজের সংগ্রামে উদ্ভূত। যে-রাত্রি তিনি নিজের হাতে সৃষ্টি করেছিলেন তাকে প্রভাতে পরিণত করেছেন নিজেই। কিন্তু সেই সকালের প্রাক্-মুহূর্তের অস্থির প্রত্যূষক্ষণটিকে ভুলে গেলে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করা হবে।

রবীন্দ্রকবিতায় চিত্রকল্প

চিত্রকল্প শব্দটি Image-এর প্রতিশব্দ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। ইংরেজি ভাষায় ঐ শব্দের ইতিহাস কয়েক দশকের নয়, আরো অনেক দিনের। কিন্তু বিশেষ একটি সাংগঠনিক কর্মপন্থা নিয়ে ঐ নামের পতাকার নিচে অনুষ্ঠিত আন্দোলনের ইতিহাস নিশ্চয়ই খুব বেশি দিনের নয়। আজকে যখন আমরা সেই বিদ্রোহের প্রকাশ্য পরিণতি ও মৃত্যুর কয়েক দশক এপারে দাঁড়িয়ে নির্মোহ দূরত্ব থেকে তার মূল্য নির্ণয় করতে পারছি, তখন সেই সূত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গও নতুন অর্থে উত্থাপিত এবং নির্ধারিত হতে পারে, মনে হয়।

এই আন্দোলনের পিতৃকল্প পুরুষ এজরা পাউণ্ড রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অভিভূত হয়েছিলেন, এমন নজির আছে। এবং ধ্বনিচ্ছন্দোময় বাণীরচনার জন্য তিনি যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন, সেই সমাচারও আজ কবিতার পাঠকদের কাছে অবিদিত নয়। এখানে একটি কথা স্বাভাবিক ভাবেই মনে পড়ে যায়। ধ্বনিচ্ছন্দোময় বাণী রচনা এজরা পাউণ্ডের আন্দোলনের অন্যতম একটি কার্যসূচী বলে গণ্য হয়েছিল। কিন্তু Imagism-এর চূড়ান্ত শর্ত নিশ্চয় ওটা ছিল না। যদিও অতিবাধ্য কালবিভাগ ছন্দঃশাস্ত্রের একটি প্রধান নিয়ম হলে তার প্রতি পাউণ্ডের আগ্রহ ছিলো না; এবং রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে বাংলা গীতিছন্দে তিনি 'the sound-unit principle of most advanced artist in vers libre' লক্ষ্য করেছিলেন, তবু সমগ্র অর্থে রবীন্দ্রনাথকে চিত্রকল্পবাদের একজন সক্রিয় পৃষ্ঠপোষক বললে সংগত হবে না।

এবং সম্ভবত এজরা পাউণ্ড নিজেই পরোক্ষভাবে এ সম্পর্কে আলোচনা-চক্রের উদ্বোধন করে গিয়েছেন। রবীন্দ্র-প্রেক্ষিতে মানুষ এবং দেবায়তন, মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে শুভদ যোগাযোগের কথা তিনি বিশেষ জোর দিয়ে

বললেন, আরও বললেন বিংশ শতাব্দীর মন্বন্তরযুগে রবীন্দ্রশোভন ক্ষেমকল্যাণের প্রয়োজনীয়তার কথা, তিনি যে নিছক সমসাময়িক সাংবাদিকতার স্তুতিকথনে আশ্রয় নিচ্ছেন না, এমন কথাও শোনালেন। কিন্তু কোথাও বললেন না যে রবীন্দ্রনাথ একজন মহাকবি, যিনি জাতীয় ঐতিহ্যের সমর্থন ব্যতিরেকেও অসামান্য, আশ্চর্য একাকী।

কেন না, সংস্কৃতিই ছিল পাউণ্ড ও তার সহশিল্পীবৃন্দের মূল মন্ত্র। একটা বিষয়কে সোজাসুজি উপস্থিত করা এবং অনতিরেকে যথাযথ রচনা—এর আড়ালেও একটা আড়াল-করা দাবি তাঁদের ছিল। সেই দাবিটি সম্পূর্ণই মনস্তত্ত্ব-সংক্রান্ত। মুক্তির একটা আকস্মিক বোধ এনে দেয়, এই বলে এজরা পাউণ্ড চিত্রকল্পকে সম্মানিত করলেন। কিসের মুক্তি, এই প্রশ্ন আমাদের দিক থেকে সমীচীন। অভিজ্ঞতার মুক্তি,—এই বোধহয় সম্ভাব্য উত্তর। পরিচয়ে প্রায় জীর্ণ সংজ্ঞাটি এই সূত্রে আবার দেখা যেতে পারে:

> An image is that which presents an intellectual and emotional complex in an instant of time.

সময় ও পরিসরের খণ্ডধারণা থেকে কথিত complex-কে মুক্ত করাই চিত্রকল্পের লক্ষ্য। অভিজ্ঞতা শব্দটি complex-এর প্রতিশব্দ বলে গ্রহণ করলে অন্যায় হবে না।

অভিজ্ঞতা শব্দটিও আলোচনার পক্ষে কতোটা সুগম ও করায়ত্ত, জানি না। কথাটিকে কোনো দর্শনদুরূহ স্তরে নিয়ে পর্যালোচনা করা বর্তমান নিবন্ধের পরিধি-বহির্ভূত। মানবজীবনের ঘটনাবলীর অন্বয়—প্রচলিত এই তাৎপর্যেই শব্দটিকে দেখা এ-ক্ষেত্রে কাম্য। মানুষ হিসাবে অভিজ্ঞতা গ্রহণ, এবং শিল্পীরূপে তার পরিবেষণ—এ দুয়ের মাঝখানে যে-রহস্যভূমি, অদীক্ষিত পাঠক হিসেবে আমাদের প্রবেশাধিকার সেখানে সংকুচিত। কিন্তু বহির্দেহলিতে দাঁড়িয়েও কতকগুলি প্রশ্ন আমরা তুলতে পারি। I. A. Richards যে-ভঙ্গিতে সমস্যাটির নিরসন করেছিলেন, আমরাও সেই ধরনে বলতে পারি যে, অভিজ্ঞতার সচেতন স্বীকরণ, সংকেতময়তা, অতীত অভিজ্ঞতার পরস্পর-বিচ্ছিন্ন অংশগুলিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তিজীবনে পুনরাঘটিত অনেক অবান্তর ঘটনা-ছাঁটাই: গ্রাহকরূপে এ-গুলিই হচ্ছে কবির পক্ষে প্রাথমিক প্রয়োজন।

এই প্রাথমিক প্রয়োজনগুলিকে রবীন্দ্রনাথ তুচ্ছ করেন নি; সত্য বলতে কি, শেষোক্ত প্রয়োজনটিকে তিনি অত্যন্ত অধিকমাত্রায় প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। ব্যক্তি-জীবনসংক্রান্ত একান্ত ঘটনা বা নিভৃত অভিজ্ঞতাকে তিনি প্রদর্শনী মনে করেন নি। যা সবার নয়, তাকে সবার সামনে তুলে ধরা তাঁর কাছে অবৈধ, অবাঞ্ছনীয় মনে হয়েছে। ছিন্নপত্রের চিঠিগুলিতে রক্তের দাগ লেগে আছে বলে অজিতকুমার চক্রবর্তীর যে অভিযোগ, সেটি আপাতত আমাদের অভিযোগ। অথবা সেইটিই হয়তো এ আলোচনার প্রস্থানভূমি।

কোনো নিগূঢ় একটি অভিজ্ঞতাকে, প্রায় একটি ধর্মীয় আচারের ব্যক্ত অথচ অলঙ্ঘিত মর্যাদায়, প্রকাশ করা চিত্রকল্পবাদের উদ্দেশ্য। উপমা নয়, উৎপ্রেক্ষা নয়, রূপক নয়। অথবা, উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা অনুষঙ্গী হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তারা যা পারছে না চিত্রকল্পের দায়িত্ব কিম্বা করণীয় সেইটাই। একটি জটিল স্তরবহুল অভিজ্ঞতাকে সে বলে দেবে, অথচ উচ্চারিত উক্তি কোথাও সেই উপাদানকে এতটুকু ক্ষুণ্ন করবে না। এবং সমগ্র কবিতাটি সেই ইমেজকে গচ্ছিত রেখে অমোঘ অভিঘাতে অব্যর্থ সার্থক হয়ে উঠবে।

চিত্র এবং চিত্রকল্পকে যদি একাকার করে ফেলি, তাহলে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় চিত্রকল্পের ছড়াছড়ি দেখা যাবে। কিন্তু এক লহমার চাহনিতেই ধরা পড়ে যাবে, নিচের প্রথম উদাহরণই চিত্র এবং দ্বিতীয়টি চিত্রকল্প ঃ

১ রাশি রাশি ভারা ভারা / ধান কাটা হল সারা

২ আমার ছুটি চার দিকে ধু ধু করছে / ধান-কেটে-নেওয়া খেতের মতো।

সোনার তরীর দৃষ্টান্তটি ইচ্ছে করেই প্রথমে সন্নিবিষ্ট করলাম। নবীনচন্দ্র সেন এই সহজ অংশটির মধ্যে চিত্র ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু খুঁজেছিলেন এবং না পেয়ে দুর্বোধ্য ঠাউরেছিলেন আজ আমাদের মধ্যে এমন হয়তো অনেকে আছেন যাঁরা দ্বিতীয় উৎকলনটি দেখে সেই রকম কিছু খুঁজবেন এবং ব্যর্থ হয়ে বলবেন ঃ ও শুধু একটি চিত্র। কিন্তু সহৃদয়জন বুঝবেন, পত্রপুটের ঐ অংশ চিত্রকল্পের লক্ষণাক্রান্ত। ব্যক্তিমনের একটি জটিল অভিজ্ঞতা মিতালেখ্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ এক স্তর কোনো প্রতিরূপ নয়, তিন আয়তনের পর্যবেক্ষণ এর মধ্যে এসে মিশেছে।

জীবনানন্দ চিত্রকল্পের একজন সম্রাট (ধান-কাটার ইমেজ তাঁরো প্রিয় ছিল, কিন্তু প্রসঙ্গ উল্লেখ সেদিক থেকে এখানে ঘটে নি)। তাঁর বিবর্তনও প্রধানত চিত্র-রস থেকে চিত্রকল্পের অভিমুখে। এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে তাঁর প্রথম পর্বে চিত্রের পাশে চিত্রকল্প ছিলো না, অথবা তাঁর অন্ত্য পর্যায়ে চিত্রময়তার অপ্রাচুর্য ঘটেছে ; ওরকম বিভাজন কৃত্রিম ও অসংগত হবে। এখানে দুটি উদাহরণ রেখে শুধু এটাই প্রতিপাদ্য, পরবর্তী-পর্বে চিত্রকল্প রচনা তাঁর সাধনার বিষয় ছিলো ঃ

১ অলস মাছির শব্দে ভ'রে থাকে সকালের বিষণ্ণ সময়
পৃথিবীরে মায়াবীর নদীর পারের দেশ ব'লে মনে হয় :
—অবসরের গান, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'।

২. কেন এখন তারা যেই দেশে যাবে তাকে রাঙা নদী বলে,
সেইখানে ধোপা আর গাধা এসে জলে
মুখ দেখে পরস্পরের পিঠে চড়ে জাদুবলে। —লঘু মুহূর্ত, 'সাতটি তারার তিমির'।

প্রথম চিত্রে উপমার মহিমায় আমরা আপ্লুত হয়ে যাই, দ্বিতীয় শব্দচিত্রে উপমা একটি বিনীত অস্ত্র মাত্র, তাকে ছাপিয়ে উঠেছে দ্যোতনাঘনিম একটি

অন্তর্জীবনের অভিজ্ঞতা। প্রথম নদীটি আমাদের আবিষ্ট করে, দ্বিতীয়টি সাশ্বংস্ করে।

এই আলোর সোনার তরী থেকে আরো দুয়েকটি উদাহরণ এখানে দ্রষ্টব্য :

১ দেখিলাম তাঁর সেই ম্লান মুখখানি
সেই দ্বারপ্রান্তে লীন স্তব্ধ, মর্মাহত,
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মতো। যেতে নাহি দিব।

২ শিকলে বাঁধা স্বপ্ন হতো
ভিত্তি-আঁকা চিত্র যত
আলোক দেখি লজ্জাহত — পালাতে নাহি পারে, 'দেউল'।

এ-দুটি দৃষ্টান্তকেই চিত্রকল্প বলতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু বসুন্ধরা কবিচিত্তে কন্যাকল্প হয়ে উঠেছেন, এই অভিজ্ঞতাটি একটি উপমায় উদ্ভাসিত হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে চিত্রিত শব্দগুলি ব্যবহৃত উপমায় উদ্ভাসিত; কিন্তু চিত্রকল্প-পর্যায়ী শব্দচিত্র এখানে নেই। এই সব কবিতায় চিত্রকল্পের আভাস লেগেছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু চিত্রকল্প এরা নয়।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা যে পর্যায়ে সুডৌল শিল্পরূপের প্রসাদ পায় নি, সেই পর্বের অনেকখানি জুড়ে উল্লেখযোগ্য চিত্রকল্প আছে :

১ জ্যোতির্ময় তীর হতে আঁধার সাগরে
ঝাঁপায়ে পড়িল এক তারা,
একেবারে উন্মাদের পারা। —তারকার আত্মহত্যা, 'সন্ধ্যাসংগীত'।

২ আঁধারের প্রাণী যত ভূমিতলে হাত দিয়া
ঘুরিয়া বেড়ায়—
চোখে উড়ে পড়ে ধুলা, কোনখানে কী যে আছে
দেখিতে না পায়। —নিশীথ জগৎ, 'ছবি ও গান'।

উপমার মধ্যবর্তিতায় স্তরসংকুল একটি অভিজ্ঞতা জ্ঞাপিত হয়েছে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে বিষয়টি বলতে গিয়ে কবি উপমারও সাহায্য নেন নি। এরা যে চিত্রকল্পরূপে উত্তীর্ণতম, তা বলছি না। এ কথা বলাই এখানে বিধেয়, মানসিক অভিজ্ঞতার বর্ণনায় কবি যে প্রক্রিয়া এ-সব ক্ষেত্রে অবলম্বন করেছেন, তা চিত্রকল্পের লক্ষণান্বিত।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা যখন শিল্প-শালিত হলো, অর্থাৎ যে-মুহূর্তে থেকে তাঁর কাব্য-ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠলো, তখন রবীন্দ্রনাথ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সাবলীলভাবে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার রহস্য আয়ত্ত ক'রে নিয়েছেন। এখন থেকে, স্বভাবতই পরিচ্ছন্ন আবেগ প্রকাশ পেলো। এবং পাঠকের কাছে গোচরীভূত হওয়ার জন্য তিনি অভিজ্ঞতাকে এখন থেকে নির্মমভাবে ছেঁকে নিলেন। কবিমাত্রেরই অভিজ্ঞতা, বলাবাহুল্য, ছেঁকে নেওয়া। রবীন্দ্রনাথের কবিব্যক্তিত্ব সেখানে সম্ভবত শোধনীকরণের প্রবণতায় আরো এক ধাপ অগ্রসর।

অভিজ্ঞতাকে তিনি দু'বার ছেঁকে নিলেন, এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। Image নয়, idea, চিত্রকল্প নয়, ভাবকল্প এখন থেকে তাঁর আরাধ্য হয়ে উঠলো। এ কথা বলে ক্ষণিকা বা খেয়ার কাব্যমূল্যের লঘুকরণ বর্তমান লেখকের ধৃষ্ট লক্ষ নয়। শুধু গীতাঞ্জলি-পর্বকে যদি রবীন্দ্র প্রতিভার একটি শীর্ষচূড়া ধরি, তবে এ কথাই প্রতিপন্ন হয়, রবীন্দ্রনাথ ভাবার্থ-দীপিকা পংক্তিরচনায় যতটা উৎসুক, স্বোপলব্ধির রসোজ্জ্বল বিন্যাসে যতখানি ব্যগ্র, সেই অনুপাতে চিত্রকল্প প্রণয়ণে উদগ্রী নন। তাই—

> এই জ্যোতিঃসমুদ্র মাঝে / যে শতদলপদ্ম রাজে
> তারি মধু পান করেছি / ধন্য আমি তাই
> যাবার দিনে এই কথাটি / জানি যেন যাই।

একেও আত্মস্থ চিত্রকল্প না বলে অনুরূপ একটি ভাবকল্প বললে যথার্থ বলা হয়। ম্যাথু আর্নল্ড যাকে নিকষোপম পংক্তি (touchstone line) বলেছেন, এখানে তার পরিচয় উৎকীর্ণ হয়ে আছে। চিত্রকল্প এখানে থাকলেও এর অন্তিম আবেদন ভাবকল্পের। রিচার্ড গ্রীণ ম্যুলটনের ভাষায় একে নিরুদ্ধ চিত্রকল্প (Concealed Imagery) বলা যেতে পারে। ম্যুলটনের ভাষায় এ হলো 'এক রূপক ভাবনা যা গোটা কবিতা বা দীর্ঘায়িত স্তবকে পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকবে, অথচ প্রত্যক্ষত শব্দের মধ্যে শরীরী হয়ে উঠবে না।' চিত্রকল্প এখানে তাৎপর্যপরবশ স্বয়ংসিদ্ধ নয়। অভিজ্ঞতার অন্তঃসাক্ষ্য এ নয় অভিজ্ঞান।

বলাকাতেও Concealed image-এর প্রাচুর্য। তবু ইমেজ খুঁজলে বিফল হতে হবে না :

> ১ নহে নহে, নাইকো মানিক, নাই রতনের ভার,
> একটি ফুলের গুচ্ছ আছে রজনীগন্ধার,
> সেইটি হাতে আঁধার রাতে সাগর হবে পার
> আনমনে গান গেয়ে।
>
> ২ হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিণী,
> চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিণী,
> শব্দহীন সুর।
>
> ৩ চাহি সেই দিগন্তের পানে
> শ্যামশ্রী মূর্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে।

বলাকা-পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ আগের তুলনায় ব্যক্তিগত হতে চলেছেন। পাঠকের চৈতন্য তীরবিদ্ধ করবার আগে ধনুকের ছিলাটাকে নিজের বুক পর্যন্ত টেনে এনেছেন। বুকের স্পর্শ-লাগা ছিলা থেকে এর পর যে তীর নির্গত হয়েছে তা পাঠকের বেদনায় ব্যক্তিস্বাশ্রয়ী বলে চিহ্নিত হতে পারে।

পলাতকা-র কথা এখানে অনিবার্য। গীতাঞ্জলিতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যন্ত্রণা থেকে আত্মউত্তরণ আছে। কিন্তু পলাতকায় আছে কন্যার আসন্ন

মৃত্যুর প্রেক্ষণীতে আলম্বন-বিভাব (objective correlative) খুঁজবার গাঢ় আর্তি। কাহিনী-কবিতা এ কথাটাকে উদ্ঘাটিত হতে দেয় না, এ কথা ঠিক। কিন্তু পলাতকার যে কবিতাটিতে কাহিনীর আপাতনির্ভর, সেখানে বোঝা যাবে অভিজ্ঞতার অন্তর্বয়নে চিত্রকল্প কি রকম তীব্র নিখাদে ঝংকার দিয়ে উঠেছে ঃ

> আমার বামার মতোই যেন অমনি কে এক মেয়ে / নীলাম্বরের অচেলখানি ঘিরে
> দীপশিখাটি বাঁচিয়ে একা চলছে ধীরে ধীরে —হারিয়ে যাওয়া।

একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, 'বসুন্ধরা' কবিতায় যে সন্তাপ বিবৃত হয়েছে, এখানে তা অন্তর্মুখিতায় সংবৃত হয়েছে। খেয়ার অনাবশ্যক কবিতাটিতেও অনুরূপ রহস্যের আবহমণ্ডপে স্পন্দমান, একটি বালিকাকে দেখা যাবে, কিন্তু কবি সেখানে ধ্রুবপদের মুখে চিত্রকল্পটিকে ঘুরিয়ে আনেন নি, একটি বক্তব্যকে আবর্তিত করেছেন। রবীন্দ্রসংগীতের ব্যতিক্রম ছাড়া, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার মৌল চিত্রকল্পকে ধ্রুবপদের মুখে কচিৎ কখনো ঘুরিয়ে এনেছেন। পক্ষান্তরে, পাউণ্ডের 'বৃক্ষ' কবিতাটিতে মাত্র বারো লাইনের কবিতায় বৃক্ষের চিত্রকল্পটিকে কি ভাবে দু'বার ঘুরিয়ে এনেছেন, সে কথা মনে রাখলেই চিত্রকল্পের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভূমিকার কথা স্পষ্ট হতে পারে।

রবীন্দ্রসংগীতের একটি বিশেষ পর্যায় নিয়ে এখানে দুয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। চিত্রকল্পের অন্যতম চাহিদা যদি হয় দুর্মূল্য সংহতি, তবে এ কথা বললে ভূল হবে না, রবীন্দ্রসংগীত রবীন্দ্রনাথের কবিতার তুলনায় সেই মিতকথনের মহিমায় সংহত, উজ্জ্বল। অতিকথনে ভারাতুর জর্জ্জর যুগের কবিতার প্রতিক্রিয়াই ইমেজপন্থী কবিরা এই কথাটা বুঝেছিলেন, বাক্যময়তা নয়, বাঙ্ময়তাই কবিতার মোক্ষভূমি। রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাশাপাশি তাঁর গীতিধারা চিরদিনই এই বাঙ্ময় সন্মানে স্রোতোবহা ছিল। কিন্তু শেষ দশকের কাছাকাছি এসে তাঁর কবিতা ও গানের সম্পর্ক এই অর্থে নতুন হয়ে উঠেছে যে, তাঁর অনেক কবিতা গান হতে চেয়েছে এবং গানের সংহতি সন্ধান করেছে। এবং ফলত, এক-একটা চিত্রকল্প এখানে শায়ক-সুতীক্ষ্ন বাকসংযমে পাঠকের অন্তর্দৃষ্টি আর অন্তঃপ্রবৃত্তিকে প্রায় একটি সর্বান্বয়ী জ্যোতিরিন্দ্রিয়ের (sixth sence) কোঠায় নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেয়। লক্ষ্যভেদের এ রকম কয়েকটি নজির এখানে রাখছি ঃ

১ দুয়ারে এঁকেছি রক্ত রেখায় পদ্ম-আসন/সে তোমারে কিছু বলে ?—সন্ধান, 'মহুয়া'।

২ তুমি যার সুর দিয়েছিলে বাঁধি / মোর কোলে উঠিছে সে কাঁদি
ওগো, সে কি তুমি জান। —বাদল রাত্রি, 'বীথিকা'।

৩ বৈশাখে কৃশ নদী/পূর্ণ স্রোতের প্রসাদ না দিল যদি
শুধু কুণ্ঠিত বিশীর্ণ ধারা/তীরের প্রান্তে / জাগালে পিয়াসি মন —উদ্বৃত্ত, 'সানাই'।

এই সমস্ত কবিতাই অতঃপর গীতিরূপে রূপান্তরিত হয়েছে। রিচার্ডস-এর ভাষা চুরি করে বলতে গেলে, এই সব লিরিকে দৃষ্টিধর্মী এবং শ্রুতিধর্মী চিত্রকল্প মিলে গিয়ে এখানে আশ্লিষ্ট চিত্রকল্প (Tied images) দেখা দিয়েছে।

এখানে রূপ গোস্বামীর ব্যবহৃত একটি শব্দ বিশেষভাবে মনে পড়ে যায়। শব্দটি হল 'চিত্রজল্প'।

> প্রেষ্ঠস্য সুহৃদালোকে গূঢ়রোষাভিজৃম্ভিতঃ।
> ভূরি-ভাবময়ো জল্পো যস্তীব্রোৎকণ্ঠিতান্তিমঃ।
> চিত্রজল্পো দশাঙ্গোঽয়ং প্রজল্পঃ পরিজল্পিতং।
> বিজল্পোজ্জল্পসংজল্পা অবজল্পোঽভিজল্পিতং।
>
> —উজ্জ্বলনীলমণিঃ।

প্রিয়তম ব্যক্তির সুহৃদের সহিত দেখা হইলে, গূঢ়রোষবশতঃ যে ভূরি ভাবময় জল্প অর্থাৎ কথন তাহার নাম চিত্রজল্প, যাহার অন্ত তীব্র উৎকণ্ঠাই হইয়া থাকে। এই চিত্রজল্পের অঙ্গ দশ প্রকার। প্রজল্প, পরিজল্প, উজ্জল্প, বিজল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প এবং সুজল্প। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত সংস্করণ, ১২৯৫, পৃ ৭৯৮।

দশটি শ্রেণীসমন্বিত চিত্রকল্পের আক্ষরিক প্রয়োগ রবীন্দ্রসংগীতের উদ্ধৃত এবং অনুরূপ উদাহরণগুলিতে আছে কিনা, এ অনুসন্ধান অর্থহীন। অনেক স্থলেই তার পরিচয় আমরা পেতে পারি। এবং 'চিত্রকল্প' কথাটির একটি রূপভেদ বা নামভেদ হিসেবে 'চিত্রজল্প' শব্দটি পুনরায় প্রবর্তিত হতে পারে কিনা, তার সম্ভাব্যতা বিচারের ভার পাঠকের উপরেই রাখছি। চিত্রকল্প শব্দটির ব্যাপক তাৎপর্য যেখানে কবিতা-পাঠকের মনে বিপন্নতা রচনা করে, সেই রকম কোনো-কোনো ক্ষেত্রে, অর্থের স্পষ্টতার জন্য চিত্রজল্প শব্দটি অংশত কাজ চালাতে পারে কিনা, সেটাও নিশ্চয় পাঠকই নিরূপণ করবেন।

শেষ-দশকের রবীন্দ্রনাথ চিত্রকল্পের ব্যবহারে অনেক সচেতন, ইতিপূর্বেই তার ইঙ্গিত রেখেছি। এখানে, বক্তব্য স্পষ্ট করবার জন্য কয়েকটি প্রমাণ দাখিল করছি:

১ এক তীর গাড়ি তোলে অন্য তীর ভাঙিয়া ভাঙিয়া,
সেই প্রবাহের পরে উষা উঠে রাঙিয়া রাঙিয়া,
পড়ে চন্দ্রালোকরেখা জননীর অঙ্গুলির মতো; —পান্থ, 'পরিশেষ'।

২ ক্রেসান্থেমাম কার্নেশনের
কেয়ারি-সমেত তারা
নাই-গহ্বরে হারা। —শূন্য ঘর, ঐ।

৩ মাটির কাছে কণ্টিকারির নীল-সোনালির বাণী। —কণ্টিকারি, ঐ।

৪ সে না হলে বিরাটের নিখিল মন্দিরে
উঠত না শঙ্খধ্বনি,
মিলত না যাত্রী কোনোজন,
আলোকের সামমন্ত্র ভাষাহীন হয়ে
রইত নীরব। —প্রাণ, ঐ।

৫ তাই তো আমি নাম দিয়েছি কোমল গান্ধার—
যায় না বোঝা যখন চক্ষু তোলে
বুকের মধ্যে অমন করে
কেন লাগায় চোখের জলের হিড়। —কোমল গান্ধার, 'পুনশ্চ'।

৬ নৈরাশ্যের নখর হতে
রক্ত-ঝরা আপনাকে আজ ছিন্ন করে আনো,
আশার মোহ শিকড়গুলো উপড়ে দিয়ে যাও
লালসাকে দলো পায়ের তলায়। —পয়লা আশ্বিন, ঐ।

৭ সেদিনের কথাগুলি
দুর্লক্ষণ বাদুড়ের মতো আছে ঝুলি। —পোড়োবাড়ি, 'বীথিকা'।

৮ দেখিলাম—অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি
নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ, নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা,
চিত্র-করা আচ্ছাদনে আজন্মের সঞ্চয়,
নিয়ে তার বাঁশিখানি। —৯, 'প্রান্তিক'।

৯ এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ি,
দিল পাড়ি—
কামরায় গাড়ি-ভরা ঘুম
রজনী নিঝুম। —রাতের গাড়ি, 'নবজাতক'।

১০ তখন সে স্বপ্ন কায়াহীন,
নিশীথে বিলীন,
দূরপথে তার দীপশিখা
একটি রক্তিম মরীচিকা —আসা-যাওয়া, 'সানাই'।

১১ যেতেই হবে,
দিনটা যেন খোঁড়া পায়ের মতো
ব্যাণ্ডেজেতে বাঁধা। —বাসাবদল, ঐ।

১২ আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু
মিশাইলে মূলতানে—
গুঞ্জন তার রবে চিরদিন,
ভুলে যাবে তার মানে। —১০, 'রোগশয্যায়'।

১৩ আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ,
জানে তা কি এ কালিম্পঙ। —১৪, 'জন্মদিনে'।

১৪ পোড়ো বাড়ি, শূন্য দালান—
বোবা স্মৃতির চাপা কাঁদন হু হু করে,
মরা-দিনের-কবর-দেওয়া ভিতের অন্ধকার
গুমরে ওঠে প্রেতের কণ্ঠে সারা দুপুরবেলা! —২০, ঐ।

১৫ মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে। —১৪, 'শেষলেখা'।

উদ্যম করলে আমরা এ রকম অসংখ্য উদাহরণ তাঁর এ অধ্যায়ের রচনায় পাবো। বীজমন্ত্রের মতো এই সব উক্তি তন্ময়তা ও মন্ময়তার কেন্দ্রকোরক স্পর্শ করেছে। চিত্রকল্পের সাধস্বর্গ এই বিন্দুতে রবীন্দ্রনাথ অনেকবার পেঁাচেছেন।

তৎসত্ত্বেও এ কথা বলা উদ্দেশ্য নয়, রবীন্দ্রনাথ চিত্রকল্পবাদী। প্রত্যেক মহৎ কবির রচনাতেই আমরা চিত্রকল্পের সান্নিধ্য লাভ করি, কিন্তু তা থেকে তাঁদের ইদানীন্তন অর্থে চিত্রকল্পবাদী বলা যুক্তিসংগত হবে না। বলা চলে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারা শেষ-পর্বে যে মোহনায় উপনীত হয়েছিল, তা অন্তর্জীবনের ব্যক্তি-স্বাশ্রয়ী অভিজ্ঞতার সঙ্গে বাণীর অব্যবহিত পরিণয় চেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শেষ-দশকে এসে ব্যক্তিগত আত্মসামীপ্যের দিকে ঝুঁকে পড়ছিলেন, তাই অভ্যস্ত এবং অনুশীলিত জীবন-ভাষ্য প্রকাশের পাশাপাশি এক রকম জর্নালধর্মিতা সেখানে দেখা গিয়েছিল। অকপট আত্মবিবরণীতে নয়, জীবনের তত্ত্বব্যাখ্যানেও নয়, এ দুয়ের অন্তর্বেদীতে কবিতাকে তখন তিনি নতুনভাবে স্থাপনা করতে চেয়েছিলেন। এই পুনর্বাসনক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা, এ নিয়ে নানা দৃষ্টিকোণ প্রয়োগের সুযোগ আছে। কিন্তু এ কথা বললে আপত্তির কারণ দেখি না, তাঁকে একই কারণে কবিতায় ভাষাকে নতুন নিরীক্ষার দিকে নিয়ে যেতে হয়েছিল। এবং উদ্‌বৃত্ত চিত্রকল্পগুলি তাঁর ঐ পুনর্ণব জীবনবোধ ও রীতি চেতনার উপহার।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রথম পর্যায়ে চিত্রকল্প ছিল না, এটা বললেও ভুল করবো। এবং ছিল যে, সেই ধারণার সপক্ষেও উদাহরণ যোগ করা কঠিন নয়। কিন্তু তাঁর কবিস্বভাবের ক্রমোন্মুখ বিবর্তনের যে অংশে চিত্রকল্পের প্রবণতা ও প্রাচুর্য অপেক্ষাকৃত স্ফুটতর, সেটি তাঁর প্রদোষকালের উপান্ত্যপর্ব। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্প তাঁর নিজস্ব, সুতরাং তাঁকে চিত্রকল্পবাদের প্রচলিত কোনো শিবিরের অন্তর্ভুক্ত করলেও সেটাতে বিবেচকের পরিচয় দেওয়া হবে না।

তোমার সৃষ্টির পথ

'শেষ লেখা'র শেষ কবিতাটি রবীন্দ্রমগ্ন পাঠকদের কাছে দুরূহ কুহেলি রচনা ক'রে রয়েছে। কবিতাটির একটি শব্দও অভিধান থেকে কষ্টোপার্জিত নয়, তবু এত কঠিন কবিতা সম্ভবত তিনি এর আগে রচনা করেননি।

মৃত্যুর আগের মুহূর্তে অথবা ঈষৎ পূর্বে উচ্চারিত কোনো কবির উক্তিটি পাঠকের চৈতন্যে একটি স্থায়ী আলোড়ন তোলে, সেই উচ্চারণ কবির সমগ্র রচনাবলীর উপর উদ্ভাসিত একটি ভাষ্যরশ্মি বিকীর্ণ করে। আমরা শুনতে পাই, মৃত্যুর আগে একটি অনুপলের ভিতর মানুষের সমস্ত স্মৃতি সংগৃহীত হয়। এই ধারণার ভিত্তি পরীক্ষা না ক'রেও এটুকু বলা চলে, বিবেকী কবিমাত্রই তাঁর জীবনের প্রতি মুহূর্তের মতো আসন্ন মৃত্যুমুহূর্তে দায়িত্ব গ্রহণ করেন, এবং তাঁর বাণী সেই দায়িত্ব বহন করে। সেই মুহূর্তে তাঁর মূল্যায়নেরও যে কবি স্পষ্টভাষী, প্রবৃত্তি যাঁকে কথা বলায়, তাঁর কবিতায় তখন স্বভাবতই তেমন কোন অপ্রত্যাশিত চমক আমরা আশা করি না, কেননা, সারাজীবনই তিনি আমাদের তাঁর নতুন নতুন আবেগের অংশীদার হতে দিয়েছেন, তাঁর কবিতার ভিতরে কবিসত্তার অনাবিষ্কৃত অংশ ঐ ধারাবাহিক বিবরণীর মধ্য দিয়ে পাঠকের কাছে এত স্বচ্ছ হয়ে যায় যে তাঁর মৃত্যুকালীন উক্তি আমাদের যতই স্পন্দিত করুক, নতুন ক'রে ভাবায় না। মায়াকোভস্কি এই ধরণের কবি, যার মৃত্যুকালীন উচ্চারণ :

ওদের মতন বললে শোনায় / 'ঘটনা এখানে শেষ'
প্রেমের তরণী ভেঙেচুরে খান খান। / আমি তো জীবনছুট।
দরকার নেই তালিকা করার / পরস্পরের দুঃখ
সন্তাপ ও অভিযোগ।
শুভ আকাঙ্খা এবং চিরবিদায়।

এই পংক্তিগুলি নাটকীয়তায় দ্যুতিময়। কিন্তু এইতো আমাদের চিরপরিচিত মায়াকোভস্কি, আজীবন আমাদের যিনি তাঁর নিজস্ব জয়পরাজয় দেখতে দিয়েছেন, নৈরাজ্যের রক্তাক্ত সময় অভিনয় ক'রে দেখিয়েছেন। এইসব পংক্তি তাই তাঁর কোনো নতুনতর চরিত্র আমাদের কাছে নিয়ে আসে না, দুর্ভাবিত করে না আমাদের। কিন্তু আরেক ধরনের কবি আছেন, যাঁরা আত্মসচেতন, কবিতায় অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠতম অংশ লিপিবদ্ধ ক'রেও যাঁরা কবিতার অন্তরালে লুকিয়ে থাকেন। এ'দের যেটুকু আমাদের চোখে পড়ে তা নির্মীয়মাণ নয়, শিল্প-সমাপ্ত, অমীমাংসিত নয়, সুচিন্তিত। এই ধরণের কবি পোল ভালেরি। এঁর শেষ একটি উক্তি, শোনা যায়, 'প্রাচীর ছাড়া আর কিছুই আমি লক্ষ করছি না'। বলা বাহুল্য এই কথা শোনা মাত্রই আমাদের অনুসন্ধান অনবসর হয়ে ওঠে. এই প্রাচীর কিসের প্রাচীর, সেই প্রশ্নে আমরা জর্জরিত হতে থাকি।

যদিও রবীন্দ্রনাথ ভালেরির কোনো কোনো রচনা অভিনিবেশ নিয়ে পাঠ করেছিলেন, তবু ভালেরির সঙ্গে তাঁর তুলনা প্রণয়ন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। প্রসঙ্গত শুধু এটুকুই অনুমোদনযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাবও অনেকটা যেন ভালেরিরই মতো, স্বচ্ছতার সাধক হয়েও সংবৃতিপরায়ণ। তাঁর ভাষা একটি অর্জিত, প্রাপ্ত স্ফটিকখণ্ডকে ব্যক্ত করে, অমিশ্র মনোবৃত্তির পরিশ্রম-লাঞ্ছিত প্রক্রিয়াকে কখনো নয়। দ্বিতীয়ত, নিজেকে প্রগাঢ়ভাবে উদ্ঘাটন ক'রেও শিল্পকর্মের আড়ালে অন্তর্হিত হয়ে যাওয়া তাঁরো অভিপ্রেত। তাই তাঁর কোনো গান বা কবিতার ভিতর থেকে আমরা আমাদের জীবনের তাপ সংগ্রহ ক'রে নিয়েও সেই কবিতার মধ্যে বাস করতে পারি না, চিরায়ত আভিজাত্যে সুদূর ও গরীয়ান সেই ছন্দোময় হর্ম্য আমাদের নন্দনসম্বিৎ জাগিয়েও আমাদের স্বেদাক্ত প্রাত্যহিক সমতল থেকে ব্যবধানে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই কারণে তাঁর কবিতার মধ্য থেকে তার জীবসত্তা সনাক্ত করার মানবিক আগ্রহ আমাদের থেকেই যায়। এই আগ্রহ যতই মারাত্মক আকার গ্রহণ করুক না কেন, তার উৎপত্তি সমর্থনযোগ্য। যদি সেই জীবনস্বভাব কোনো সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে বেরিয়ে আসে তবে সমালোচকের পক্ষে জানবার সুবিধা হয় কী উপাদান নিয়ে কবি কাজ করতে নেমেছিলেন, কী ছিলো তার একান্ত মানবিক ধাতুরূপ যাকে তিনি শিল্পরূপে পরিণত করেছিলেন? বাবলনীয় সৃষ্টিতত্ত্বে আছে, এক প্রবল যুদ্ধের শেষে ড্র্যাগনকে দ্বিধাবিভক্ত করা হলো: তার উর্ধ্বভাগ গিয়ে পড়লো স্বর্গে নিম্নভাগ মাটির পৃথিবীতে; উর্ধ্বাংশে অর্থাৎ নভোমণ্ডলে ঈশ্বরের স্থিতি আর তার অধোভাগ হলো চতুর্দিকে বিস্তারিত আকারশূন্য কর্দমাক্ত মাটি যার প্রতিশব্দ tohu wabohu। শেষোক্ত এই উপাদানকে ঈশ্বর কি করে শিল্পীর মতো ছাড়িয়ে গেলেন, কি ভাবে তিনি সৃষ্টির উপকরণের উর্ধ্বে নিজেকে দিনের পর দিনের পরিশ্রমে

স্থাপন করলেন, সেই নিয়েই ঐ পুরাণের পরবর্তী পরিণতি। রবীন্দ্র-পুরাণেও কি পাওয়া যাবে না সেই সামগ্রিক ড্র্যাগনের দ্বিধাবিভক্ত বাস্তব অবয়ব সংস্থানের সূত্র যা মৃণ্ময়তাকেও স্বীকৃতি জানাতে পারে?

এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ও শেষ পর্যায়ের কবিতা পাশাপাশি মিলিয়ে দেখতে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাঁর কবিতা যখন অচলিত নামাঙ্কুর সংরক্ষিত, সংরুদ্ধ পরিধি থেকে মুক্ত হয়ে এসেছে, সেই পর্বের কবিতায় এমন একটি অনিশ্চিতি দেখা যায় যা, তাঁর নিজেরি ভাষায়, 'ঢেউওয়ালা জলের প্রতিবিম্বের মতো আঁকাবাঁকা' যার 'পূর্বেকার অবস্থায় একটা বেদনা ছিল অনুদ্দিষ্ট, সে যেন প্রলাপ ব'কে আপনাকে শান্ত করতে চেয়েছে'। রবীন্দ্রনাথ বারংবার আক্ষেপ করেছেন, এই পর্বের কবিতা রূপের স্পর্শ পায়নি। একথা বললে অন্যায় হয় না, রবীন্দ্রনাথ নন্দনতত্ত্বে ভাবের চেয়ে রূপকে অনেক নির্মল ব'লে মনে করেছেন, কেননা ভাব খনিজ বহুবিসর্পী অপরিশুদ্ধ উপাদান এবং রূপ তার সর্বতোভদ্র নিয়ন্তা, তার পরিচ্ছন্ন সুশাসক। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথের চির-রোমান্টিক প্রবণতার ভিতর একটি ক্লাসিক প্রাণপুরুষ নিহিত ছিল। কিন্তু এই ক্লাসিক-মাঙ্গলিক কাব্যাদর্শ যখন তাঁর রচনায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি, সেই মুহূর্তের কবিতায় মানবিক জীবাত্মা তার অভিজ্ঞতার অবাধ্যতা নিয়ে প্রত্যয় হয়েছে। 'ছবি ও গান'-এর এইরকম একটি কবিতা থেকে একটি অংশ:

চারিদিক কেহ নাই; একা ভাঙা বাড়ি
সন্ধেবেলা ছাদে বসে ডাকিতেছে কাক।
নিবিড় আঁধার মুখ বাড়ায়ে রয়েছে
যেথা আছে ভাঙা ভাঙা প্রাচীরের ফাঁক।
পড়েছে সন্ধ্যার ছায়া অশথের গাছে
থেকে থেকে শাখা তার উঠিছে নড়িয়া।
ভগ্ন শুষ্ক দীর্ঘ এক দেবদারু তরু
হেলিয়া ভিত্তির 'পরে রয়েছে পড়িয়া।
আকাশেতে উঠিয়াছে আধখানি চাঁদ,
তাকায় চাঁদের পানে গৃহের আঁধার।
প্রাঙ্গণে করিয়া মেলা ঊর্ধ্বমুখ হয়ে
চন্দ্রালোকে শৃগালেরা করিছে চীৎকার। ('পোড়ো বাড়ি')

এই কবিতার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে রচিত আরেকটি কবিতার অংশ:

তোমার সেকাল আজি ভাঙাচোরা যেন পোড়োবাড়ি
লক্ষ্মী যারে গেছে ছাড়ি;
ভূতে-পাওয়া ঘর
ভিত জুড়ে আছে যেথা স্নেহহীন ডর।

আগাছায় পথ রুদ্ধ, আঙিনায় মনসার ঝোপ,
তুলসীর মঞ্চখানি হয়ে গেছে লোপ।
বিনাসের গন্ধ ওঠে, দুগ্রহের শাপ,
দুঃস্বপ্নের নিঃশব্দ বিলাপ। ('পোড়োবাড়ি, বীথিকা')

দুটি কবিতার শুধু নামকরণেই নয়, এষণা ও মননের আশ্চর্য সাদৃশ্য। ব্যক্তিগত প্রেমের সঙ্গে অপসারক সময়ের দ্বন্দ্বে সঞ্জাত মৃত্যুচিন্তনের কবিতা এরা। অমঙ্গলের ভাবানুষঙ্গী চিত্রকল্প ছাড়াও আরেকটি বোধ এই কবিতা দুটিতে লক্ষ্য করি, রবীন্দ্রনাথের অন্ত্যমধ্য পর্বের 'ছবি'তে—অনুরূপ অজস্র যোগ করা বিন্দুমাত্র কঠিন নয়—প্রেম ও বিশ্বজগতের যে পারস্পরিক যোগাযোগের বার্তা পরম আস্থার সুরে ব্যক্ত হয়েছে, তার সামান্যতম আভাস তাঁর প্রথম বা শেষ পর্বের ও দুটি কবিতার কোনোটিতেই নেই। অবশ্য এই দুই কবিতার পাশাপাশি একই রচনাকালে প্রণীত, এমন অনেক রচনা পাওয়া সম্ভব যেখানে কবির মনে বিশ্ব ও ব্যক্তির দ্বিধাহীন অভিন্নতা অভিব্যক্ত হয়েছে, কিন্তু এই দুটি কবিতার সহযোগী এমন কবিতাও অসংখ্য যে সব ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও বিশ্বের সমান্তর, ক্ষমাহীন ব্যবধান তীব্র নিখাদে উচ্চারিত। দুই পর্যায়ের কবিতার অন্তর্বর্তীকালে এই ব্যবধান কমিয়ে আনা হয়েছে কবির সচেতন অথচ উদ্বেল আনন্দময় জীবনবোধের সাহায্যে।

এই প্রসঙ্গে 'সচেতন' শব্দটিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া অসম্ভব। রবীন্দ্র-নির্মিত ভূমণ্ডলের অধিকাংশ বাসিন্দা কবির আশ্চর্য কল্পনাশক্তি এবং সচেতনতার সমবায়ে গ'ড়ে তোলা। রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিপুল গগনচুম্বী শৃঙ্গময় পর্বতের ঊর্ধ্বগ প্রতিটি স্তর তাঁর নিজেরি সচেতন প্রতিভার সৃষ্টি। কিন্তু একথা যদি বলি সেই পর্বত নিঃসীম জলরাশি থেকে উঠে গিয়ে সূর্যতারা খচিত আকাশ ছুঁয়ে অন্তিমে আবার নেমে এসে নিঃসীম জলরাশি স্পর্শ করতে চেয়েছে, তবে বোধ হয় রবীন্দ্রপ্রতিভাকে অপমান করা হবে না। ঐ আরোহণ এবং অবরোহণের মুহূর্তে জলমগ্ন শিলার যেটুকু আমাদের চোখে পড়ে তা মনস্তত্ত্বের পরিভাষাঅনুযায়ী অবচেতনার এলাকা। তাঁর কিশোর বয়সের লেখা 'কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন' প্রসঙ্গে মানবমনের অন্ধকার প্রদেশের সঙ্গে কবিতা ও কাব্যরূপের নিগূঢ় সম্বন্ধ তিনি ব্যক্ত করেছেন। তাঁর শেষের দিকের নানান রচনা ও আলোচনায় তিনি অবচেতনার প্রসঙ্গে নানা ইঙ্গিতগর্ভ মন্তব্য করেছেন। দুয়েকটি উদাহরণ এখানে অবান্তর হবে না :

১. ছেলে ভোলাবার ছড়া শুনলে একটা কথা স্পষ্ট বোঝা যায়, এতে অর্থের সংগতির দিকে একটুও দৃষ্টি নেই, দৃষ্টি দেবার দরকার বোধকরা হয়নি···স্বপ্নের মতো একটা আকস্মিক ছবি আর একটা ছবিকে জুটিয়ে আনছে···আধুনিক য়ুরোপীয় কাব্যে অবচেতন চিত্তের এই সমস্ত স্বপ্নের লীলাকে স্থান দেবার একটা প্রেরণা দেখা যায়। আধুনিক মনস্তত্ত্বে মানুষের মগ্নচৈতন্যের সক্রিয়তার

উপর বিশেষ দৃষ্টি পড়েছে। চৈতন্যের সতর্কতা থেকে মুক্তি দিয়ে স্বপ্নলোকের অসংলগ্ন স্বতঃসৃষ্টিকে কাব্যে উদ্ধার ক'রে আনবার একটা প্রয়াস দেখতে পাই।

—বাংলা ভাষা পরিচয়

২. অবচেতন মনের কাব্যরচনা অভ্যাস করছি। সচেতন বুদ্ধির পক্ষে বচনের অসংলগ্নতা দুঃসাধ্য। ভাবীযুগের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য ক'রে হাত পাকাতে প্রবৃত্ত হলেম··· কেউ যদি বুঝতে না পারেন, তা হলেই আশাজনক হবে।

(শনিবারের চিঠি, ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ। রবীন্দ্ররচনাবলি ২৬, পৃ ৬৪৬)

'অসংলগ্নতা' 'স্বতঃসৃষ্টি' ইত্যাদি শব্দ পরা-বাস্তব কবিতার উপাসকের কাছে আকর্ষণীয় মনে হবে, কেননা Andre Breton-র 'Pure Psychic automatism—the absence of all control exercised by reason' প্রভৃতি উক্তি পরা-বাস্তব কবিতার সংজ্ঞা হিসেবে আদৃত। আধুনিক মনস্তত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্টতার কোনো বিশদ বৃত্তান্ত আমাদের জানা নেই। তাছাড়া উপাদানের সঙ্গে শিল্পকর্মের অন্তঃশীল সূত্র আবিষ্কার করার আগ্রহে আমাদের সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, কেননা স্বয়ং ফ্রয়েডও স্তেফান ৎস্‌ভাইগকে চিঠিতে বলেছেন,

সমালোচনাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, শিল্প তার সংজ্ঞাশীল স্বীকার করেই তার সাধ্য পরিসরকে ততোদুর বাড়িয়ে নিতে পারে না। যদি অ-সচেতন উপাদান ও তার প্রাক্-সচেতন বিস্তারের আনুপাতিক সম্পর্ক সীমাবদ্ধ না রাখা যায়।

রবীন্দ্রশিল্পে ফ্রয়েডীয় দমিত আকাঙ্ক্ষার সন্ধান সুতরাং নিরর্থ, নিষ্ফল। বরং ইয়ুং-এর কোনো-কোনো চিন্তা আমাদের এই প্রসঙ্গে সাহায্য করতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রধানতম সমস্যা ব্যক্তি ও বিশ্বের সম্পর্ক এবং সেই সূত্রে ইয়ুং-এর বক্তব্য ফ্রয়েডের চেয়ে দূরস্পর্শী। কিন্তু তার বিশেষ কবিতায় ইয়ুংপ্রসঙ্গ অবতারণার পূর্বে অন্ত্যপর্বের রবীন্দ্রকবিতা-ধারার কয়েকটি লক্ষণ স্মরণযোগ্য। প্রথমত 'পরিশেষ' থেকে তাঁর কবিতায় পুনর্বিবেচনার প্রবর্তনা লক্ষণীয়। পুনর্বিবেচনা বলতে পূর্ববিশ্বাসের উত্তরাধিকার বজায় রাখবার আগ্রহ বোঝাচ্ছে। 'বিস্ময়' 'মৃত্যুঞ্জয়' কি 'পয়লা আশ্বিন' প্রভৃতি কবিতায় এই আগ্রহ শিল্পের সিদ্ধি পেয়েছে। এইসব কবিতার 'পাশাপাশি' আগমন কবিতা আমাদের চোখে পড়ে যেখানে কবি তাঁর অভ্যস্ত বিশ্বাস উচ্চারণের ব্রতে প্রধানুগতরূপে সজাগ, এবং সে-সব ক্ষেত্রে বিশ্বাস ফুটে উঠতে চেয়েছে ক্লান্তির ও অবসাদের পটে। দ্বিতীয়ত, এক ধরণের প্রেমের কবিতায় অকৃতার্থ ব্যক্তির বাসনাব্যঞ্জক পৌরুষ ঘোষণা। 'ব্যর্থ মিলন' কবিতাটির 'যদি কভু হয়/তপস্যা সার্থক, তবে পাইব হৃদয়। না-ও যদি ঘটে তবে আশা চঞ্চলতা/দাহিয়া হইবে শান্ত। সে-ও সফলতা' প্রভৃতি পংক্তিতে বাসনায় যেন শুধুমাত্র পরিবেশনিরপেক্ষ প্রেমের প্রতি মূল্যবোধ স্থাপনের অভীপ্সা। এর মধ্যে রোগশয্যায়-এর ৩৯ সংখ্যক

কবিতাটি মিলিয়ে পড়লে আরো একটি বিদারক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হবে : প্রেমিকা এখানে নিখিল ভুবন বা বিশ্বপরিবেশের চেয়ে অনেক বড়ো ও অনেক কাঙ্ক্ষিতা হয়ে বিরাজিত। 'দেখি তুমি নতশিরে বুনিছ পশম/বসি মোর পাশে/সৃষ্টির অমোঘ শান্তি সমর্থন করি'-এর তিনটি চরণের প্রকৃত তাৎপর্য নিঃসন্দেহে এই যে ঐ রমণীয় সান্নিধ্যের উপরেই সৃষ্টি বা পৃথিবীর শান্তি নির্ভর করছে। রবীন্দ্রনাথের নাটকে ও পূর্বতন কাব্যধারায় নারী সমগ্র বিশ্ব ব্যাপারে একটি আপেক্ষিক অংশ মাত্র, পরবর্তী পর্যায়ের প্রেমের কবিতায় সেই নায়িকা মানুষের আপেক্ষিক অবস্থানের নিয়তি, জীবনানন্দের ভাষায় সুরঞ্জনা, যিনি 'ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্য এক সাধনার ফল'। তৃতীয়ত, শিল্পের সম্মোহিত করবার ক্ষমতায় আস্থাসম্পন্ন এক ধরণের কবিতা আমরা পাচ্ছি যা ঠিক বলাকার 'তাই তব শঙ্কিত হৃদয়/চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয় হরণ/সৌন্দর্যে ভুলায়ে' এই মীমাংসায় মসৃণ নয়। বীথিকার 'নাট্যশেষ' কবিতার 'সে ভাঙা যুগের 'পরে কবিতার অরণ্য লতায়/ফুটিছে ছন্দের ফুল, দোলে তারা গানের কথায়। / সেদিন আজিকে ছবি হৃদয়ের অজন্তা গুহাতে/ অন্ধকার ভিত্তিপটে ; ঐক্য তার বিশ্বশিল্প সাথে' প্রভৃতি পংক্তিতে শিল্পের সঙ্গে জীবনের নয়, মৃত্যুর যোগ প্রকাশিত হয়েছে। যেন যা কালের কবলগ্রস্ত তার উপরেই শিল্পের কর্ম। এবং বিশ্বশিল্পের সঙ্গে যুক্ত হবার অভিপ্রায় যতোই প্রকট হোক শিল্প মানুষের নিরুপায় একটি বিকল্প মাত্র, এই বোধ এখানে মুদ্রিত।

এই লক্ষণগুলি ছাড়াও বাইরের দিক থেকেও যে ক্রান্তিসূচক সূত্র তাঁর অন্তিম কবিতাগুচ্ছ দেখা যাচ্ছে তা হলো কবিতার নামহীনতা। রবীন্দ্রনাথ একটিমাত্র ছবিরই নাম রেখেছিলেন। গানগুলির নামকরণের প্রশ্ন তো ওঠেই না। কিন্তু এমন কী ক'রে হলো যে 'প্রান্তিক' থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রচিত বিরাট একটি অংশের কবিতার নামকরণে তিনি উদাসীন হলেন? রবীন্দ্রনাথের বেশির ভাগ কবিতাই নামার্পিত এবং সেই সঙ্গে, স্বভাবতই, পরস্পরের থেকে স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত। নাম দিয়ে ব্যক্তি ও বিষয়কে আমরা চিনে নেই, পরস্পরের থেকে আলাদা ক'রে দেখি। তাই রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথমার্ধের কবিতার প্রায় প্রতিটিই অনন্য—'যেতে নাহি দিব' ও 'বসুন্ধরা' 'অনাবশ্যক' ও 'শুভক্ষণ'—এরা শুধু পাঠকের স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত নয়, নিজ নিজ দূরত্বে স্থিত। কিন্তু শেষের দিকের কবিতা—যে-সব ক্ষেত্রে নাম সন্নিবিষ্ট হয়েছে সে-সব স্থলেও—পাঠকের স্মৃতিতে একাকার। যেন একটি কবিতা থেকে অপরটিকে ভিন্ন করবার ইচ্ছা কবিরও নেই। মহুয়ার 'নাম্নী' পর্যায়ের কবিতাগুলিতে কবি প্রমাণ করলেন যে স্বতন্ত্র সত্তার স্বতন্ত্র নামকরণে তিনি উন্মুখ ও সার্থক, কিন্তু তা যেন পাঠকের কাছে জানিয়ে রাখা যে নামহীনেরও সত্তা আছে, নাম আছে এবং তাই তিনি নামকরণে

ক্রমশই নিস্পৃহ হয়ে পড়লেন। ফলে পাঠকের দিক থেকে একটি অসুবিধে এই যে এই পর্যায়ের অনেকগুলি কবিতা একসঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হয়, কিন্তু সুবিধেও এই যে পরস্পরস্পর্শী এই কবিতাগুলির ঘনিষ্ঠ বসতি থেকে মূল প্রবণতা খুঁজে বের করা অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য হয়ে আসে। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের নামহীন এই কবিতাগুলির মধ্যে অবিচ্ছেদ একটি অন্তর্বয়ন রয়েছে, একটি কবিতা থেকে আরেকটিকে ছিঁড়ে নেওয়া কঠিন। এক ঝোঁকের কবিতাগুলি তাই একই সঙ্গে, অনতিব্যবধানে, পড়তে হবে, যতোক্ষণ কবির গূঢ়েষণা আমাদের আয়ত্তে না আসে। এই প্রস্তুতি নিয়ে যদি 'শেষ লেখা'র শেষ তিনটি কবিতা পড়ি তবে কবির অবচেতন এষণাকে হয়তো অনুমান করতে পারব। ২৭ থেকে ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে রচিত এই তিনটি কবিতার বিষয় ব্যক্তিসত্তার আত্মসন্ধিৎসা এবং বৃহতের সঙ্গে অভিযোজন রহস্য। এই সম্বন্ধে ইয়ুং Weltanschuung শব্দটির ব্যাখ্যা স্মরণীয়। শব্দটির অর্থ বিশ্ব সম্পর্কে ব্যক্তির জটিল attitude বা মনোভঙ্গি যা সজ্ঞান ধ্যান ধারণায় আত্মস্থ হয়েছে। ইয়ুং-এর প্রাসঙ্গিক চিন্তার অংশ বিশেষ এখানে অনূদিত হলো ঃ

> বিশ্ব সম্পর্কে আমরা মনে-মনে যে-ধারণা এঁকে তুলি তাকেই আমরা বিশ্ব বলি। আর সেই অনুযায়ী আমরা নিজেদের সাজিয়ে নিই, পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে তুলি। এটি সবসময় সচেতন ভাবে ঘটে না। প্রায়ই পরিবর্তমান মুহূর্তের নানা বিক্ষেপকারী সমস্যা থেকে সজোরে মনকে সরিয়ে এনে একটি মনোভঙ্গির অভিমুখে চালিত ক'রে দিতে হয়।···Weltanschauung থাকার অর্থ বিশ্ব ও নিজের সম্পর্কে একটি চিত্র রচনা, বিশ্ব কী এবং আমি কে সে বিষয় জানা। আক্ষরিক অর্থে এ যেন অসম্ভব শোনায়। কেউ জানতে পারে না বিশ্ব কী, আর নিজেকেই বা কতোটুকু সে জানবে? তবু এই দৃষ্টিভঙ্গিই শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞান যা প্রজ্ঞাকে শ্রদ্ধা ও সমীহ করে, স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত আর নীতিবাগীশের মতামত সমান অগ্রাহ্য করে। এই প্রজ্ঞান খোঁজে শুধু ভিত্তিসহ অনুমানকে, এবং এটাও ভোলে না যে জ্ঞান ব্যাপারটি সীমাবদ্ধ, ত্রুটিসাপেক্ষ।
>
> বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণার ছবি যদি আমাদের উপর না বর্তাতো তবে আমরা যে-কোনো সুন্দর বা বিভ্রান্তিকর অসত্য নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারতাম। কিন্তু এ-রকম আত্মপ্রতারণা আমাদের শুধু অবাস্তব, নির্বোধ ও নিষ্ফল ক'রে তোলে। যেহেতু আমরা বিশ্ব সম্পর্কে নিজেদের একটা প্রতিভাসিক প্রতিবিম্ব দিয়ে ভোলাতে চাই। আমরা বস্তুবিশ্বের প্রচণ্ড ক্ষমতার দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়ি। এভাবেই আমরা অভিজ্ঞতার কাছ থেকে শিখি যে সুচিন্তিত একটি দৃষ্টিভঙ্গি (weltanschauung) থাকা আমাদের পক্ষে কত্যে আবশ্যক। weltanschauung বিশ্বাস নয়, hypothesis বা অনুমিতি। বিশ্ব তার মুখচ্ছন্দ পালটাচ্ছে, বিশ্বকে আমরা আমাদের মানস চিত্রকল্পেই

ধারণা করি এবং এটা সব সময় নিরূপণ ক'রে ওঠা কঠিন কখন সেই ছবিটা বদ্‌লাচ্ছে, বিশ্ব বা আমাদের কোন্‌ দিকে বদল হয়েছে, নাকি উভয়তই ব্যাপারটা ঘটেছে। বিশ্ব সম্পর্কে চিত্রটি যে-কোনো মুহূর্তে পরিবর্তিত হতে পারে, যেমন আমাদের নিজের সম্বন্ধেও ধারণার পরিবর্তন স্বাভাবিক। প্রতিটি নতুন আবিষ্কার, নতুন চিন্তা, বিশ্বের উপর একটি নতুন প্রচ্ছদ আনতে পারে। এর জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে, নতুবা অকস্মাৎ আমরা নিজেদের এক প্রত্ন-পরিত্যক্ত পৃথিবীতে দেখতে পাবো, যা চৈতন্যের নিম্নশায়ী স্তরগুলির অবশেষ। আমরা একদিন মৃতকল্প হয়ে যাবো, কিন্তু জীবনের স্বার্থে সেই মুহূর্তকে আমরা যেন যতোদিন পারি স্থগিত রাখি। আর তা তবেই সম্ভব যদি বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণার চিত্রটি অপরিবর্তনীয় না হয়। প্রত্যেক নতুন চিন্তা Weltanschauung-এ কতোদূর যোগ করেছে, তা ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখতে হবে। (Analyticshe Psychologic und Weltanschauung)

রবীন্দ্রনাথ কি বিশ্ব সম্পর্কে তাঁর অনুশীলিত ধারণাকে ঈষৎ শিথিল ক'রে দিয়েছিলেন? সোনার তরীতে 'আমার পৃথিবী তুমি বহু বরষের' এই কথা যিনি বলেছিলেন তিনিই পত্রপুটে বলেছেন: 'শুভে অশুভে স্থাপিত তোমার পাদপীঠে/তোমার প্রচণ্ড সুন্দর মহিমার উদ্দেশে/আজ রেখে যাবো আমার ক্ষতচিহ্ন লাঞ্ছিত প্রণতি'। ইতিমধ্যে সেই কবি কোথায় হারিয়ে গেলেন যিনি জানতে চেয়েছিলেন, 'আকাশে দুই-হাতে বিলায় প্রেম ওকে?' তাহলে এটাই কি ধ'রে নেওয়া সমীচীন যে তাঁর কবিতায় এমন একজন প্রেমিক জেগে উঠেছেন যিনি প্রেমিকার চেয়েও অনেক বড়ো, প্রেমিকার প্রদত্ত অনিশ্চিত প্রেমের চেয়ে মহত্তর যাঁর নিরভিযোগ ভূমিকা? ইয়ুং Weltanschauung-এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তদনুরূপ একটি সুসমঞ্জস দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি আমৃত্যু অবলম্বন করেছিলেন, এমন-কি পৃথিবী যখন তাঁকে প্রতারণা করেছে তখনো? এই প্রশ্নের ভিতরেই সম্ভাব্য উত্তর নিহিত আছে। প্রেমিকা বা পৃথিবীর দুঃখ দেওয়ার ক্ষমতা অপরিসীম, এই কথা মেনে নিয়েও যদি একটি অপীড়িত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা যায়, তাই ছিল সম্ভবত অভিপ্রায়।

শেষ তিনটি কবিতায় একাধিকবার ব্যবহৃত শব্দের কোনো-কোনটি থেকে একটি হদিশ পাওয়া অসম্ভব নয়। 'ছলনা' পাঁচবার, আর 'প্রশ্ন' 'আঁধার' 'দুঃখ' 'রাত্রি' 'মিথ্যা' ও 'আপন', শব্দগুলি দুবার ক'রে ব্যবহৃত হয়েছে। অধিকাংশ শব্দই নেতি-র দিকে উন্মুখ। তিনবার প্রয়োগ-করা শব্দটির বিশেষণও একবার 'মিথ্যা' অন্যবার 'সহজ'। মিথ্যা বিশ্বাস কি illusion এবং সহজ বিশ্বাস বিশুদ্ধ চৈতন্যের প্রতিশব্দ? ১৩ সংখ্যক কবিতাটিতে সত্তাকে ঘিরে নিরন্তর কাল, পরের কবিতাটিতে দেখা যাচ্ছে ভয়ই হয়ে

উঠেছে চলচ্চিত্র, মৃত্যুই শিল্প এবং সত্তা সেই দৃশ্যের আবেদনকে মেনে নিয়েও অবিচলিত। মনে রাখা প্রয়োজন কবিতাটি তাঁর অবচেতনা থেকেই প্রদত্ত শ্রুতিলিখন যা তিনি অতঃপর সংশোধনের সুযোগ পাননি। এই কবিতায় তাই স্ববিরোধী উক্তির প্রাচুর্য। তবু আগের দুটি কবিতা থেকে সূত্র নিয়ে এর এটুকু অর্থ করা কঠিন নয় যে সত্তার পক্ষে একটি চৈতন্য উদ্দীপিত রাখাই শ্রেয়; কেননা ইন্দ্রিয়-সংগৃহীত সমস্ত উপকরণই তার বিরুদ্ধে উদ্যত হলেও সেই সব বিরুদ্ধতাকে সে নিজ মহিমায় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়ে ছলনাময়ীর হাত থেকে বরমাল্য পাচ্ছে। এই ছলনাময়ীর কণ্ঠে কবি যে বিরোধাভাস-খচিত অলংকার পরিয়েছেন তা থেকে তাঁর মৌলিক পরিচয় নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু প্রথমেই সাংখ্যের পরমা প্রকৃতির সঙ্গে তাঁকে মিলিয়ে দেখার প্রলোভন জাগে। বিশেষত গীতার 'প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি / বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান্ / কার্যকরণকর্তৃত্বে হেতু প্রকৃতিরুচ্যতে / পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে' শ্লোক দুটি মনে প'ড়ে যায়। প্রকৃতির সমস্ত সম্মোহসূচক কার্যকলাপ পুরুষ ভোগ করেন, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগ অধ্যায়ে এ-কথা বলার প্রায় অব্যবহিত পরেই পুরুষের অপর একটি পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে যে, যুক্ত অথচ মুক্ত এক পুরুষ দেহের ভিতরে বাস করেন যিনি 'উপদ্রষ্টা' অর্থাৎ সাক্ষী এবং 'অনুমন্তা' অর্থাৎ প্রকৃতির অনুমোদন-কারী। 'বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু / এই নিয়ে তাহার গৌরব'— এ কি সেই পুরুষ নয় যে প্রকৃতির আয়োজিত মোহন যোগসাজসে জড়িত হয়েও বিবিক্ত, অংশ গ্রহণ ক'রেও সাক্ষী, এবং তার উন্নত অবস্থান থেকে প্রকৃতির প্রতি প্রসন্ন? ১২ সংখ্যক কবিতাতে এই আনন্দিত, অনুমোদনকারী সাক্ষীর কথাটি বলা হয়েছে; 'তাঁর কবিত্বের তুমি সাক্ষীরূপে দিয়েছ দর্শন / বৃষ্টিধৌত শ্রাবণের / নির্মল আকাশে।' আরেকটু তলিয়ে দেখলেই মনে হবে, প্রকৃতির পরিবেষিত সুন্দর ও নিষ্ঠুর বিচিত্র বিচিত্র আয়োজন সবি পরীক্ষা ক'রে তার শিল্পের দিকটির সপ্রশংসা অনুমোদন করতে হবে, তার ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত ব্যবহারে এতোটুকু মানসিক ভারসাম্য হারালে চলবে না। 'বিচিত্র' শব্দটি ১২ ও ১৫ সংখ্যক দুটি কবিতাতেই ব্যবহৃত—প্রথমটিতে জন্মদিনের অভিনন্দন-জানানো পরীক্ষামূলক চক্রান্তের বিশেষণ হিসেবে। কখনো সে মধুর, কখনো মারাত্মক। এমন-কি প্রথমোক্ত কবিতাটিতে দেখতে পাই প্রকৃতি যে পুরুষকেই শুধু পরীক্ষা করে তা নয়, নিজেও করে: 'প্রকৃতি পরীক্ষা ক'রে দেখে / ক্ষণে ক্ষণে আপন ভাণ্ডার তোমারে সম্মুখে রাখি পেল সে সুযোগ'। শেষ কবিতাটিতে 'আপন ভাণ্ডার' ব্যবহার ফিরে এসেছে: 'কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে / শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে / আপন ভাণ্ডারে' এই 'সে' বলা-ই বাহুল্য, পুরুষ বা চৈতন্য। দেখা যাচ্ছে, প্রকৃতি পুরুষকে তার নিজস্ব ভাণ্ডার অর্পণ করছে, তার ফলে 'দাতা আর গ্রহীতার যে-সংগম

লাগি বিধাতার নিত্যই আগ্রহ' তা চরিতার্থ হচ্ছে। ছলনাময়ী কবি পুরুষ বা উপযুক্ত গ্রহীতাকেই সমস্ত মহার্ঘ দিয়ে দেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চৈতন্য তার স্বয়ংস্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর হয়ে ওঠে। সুষুপ্তির মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে, সে ফিরে আসে এক ধরণের স্বায়ত্তশাসনে, স্বাবলম্বিতায়। এখানেই আর সাংখ্যের জোর খাটে না, বেদান্তের কাছে ফিরতে হয়। বেদান্তের 'স্বাপ্যয়াৎ' এই নবম সূত্রটির তাৎপর্য যে-পুরুষ সুষুপ্তি মুহূর্তে আত্মায় লীন হয়ে যান এবং তখন তাঁর উপর প্রকৃতি কোনো কাজ করতে পারে না, তিনি চৈতন্যস্বরূপ লাভ করেন। এই অর্থে শেষ কবিতাটি প্রকৃত থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত চৈতন্যের কবিতা, সুষুপ্তিতে আত্মস্থ পুরুষকারের কবিতা। যে-পুরুষকার নিজের নিয়তিকে নিজেই আকার দিচ্ছে, তার তো গৃহীত পরাভব ব'লে কিছু থাকতে পারে না, চৈতন্যের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার স্বপ্রতিষ্ঠ পৌরুষের অহমিকা সে প্রকাশ করে—কবিতাটির তাৎপর্য এই। সমস্ত কবিতাটির নিহিতার্থ ঃ প্রকৃতি (নিয়তি, বিশ্ব প্রভৃতি) তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি বাঁকে সুকৌশলে পৌরুষনাশী ছলাকলার জাল বিছিয়ে রেখেছেন। সরলচেতা পুরুষকেও সে বিপর্যস্ত করতে চায় মায়াবী মুখোশ প'রে। কিন্তু সরলচেতা পুরুষ সেই অন্ধকারের পটেই নিজের মহত্ত্বকেই স্পষ্ট ক'রে প্রতিষ্ঠা করেন তার ব্যক্তিগত সাধ-স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে। ছলনাময়ী বা প্রকৃতি তাঁকে যে আলোক বা পথ-নির্দেশ দিচ্ছে ব'লে মনে হচ্ছে তা আসলে কবির নিজের কাছ থেকেই পাওয়া, এবং নিজের সেই ঋজু বিশ্বাসের কিরণ দিয়ে বিশ্বের জ্যোতিষ্ককে সে চিরদিনের উজ্জ্বলতা দিচ্ছে, এই দিক থেকে সে উত্তমর্ণ অধমর্ণ নয়। বহির্জীবনে বা বাহিরের জগতে তার গতিপ্রকৃতির অপব্যাখ্যা সম্ভব, কিন্তু সে তার নিজের কাছে বিবেকী, সৎ। পৃথিবীর মানুষ তাকে বলে সে তার প্রাপ্যমূল্য পেল না, সে ট্র্যাজেডির চরিত্র বা বঞ্চিত, কিন্তু সে তো জানে ঘটনা, দৈব দুর্ঘটনা বা পরিণামী ঘটনায় সত্য নেই, শেষ সত্য নির্ভর করে সংক্রান্ত (affected) ব্যক্তিচরিত্রের নিজের উপরে, আর সে-ই তো সমস্ত ট্র্যাজিক বহির্ঘটনা বিশ্বকে তার নিজের একটি সতর্ক অথচ সহিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপান্তরিত করছে। সর্বশেষ পুরস্কার তারি করতলগত হয়, তার অসীম ধৈর্য দিয়ে সেই পুরস্কার অর্জন করে। হয়ত প্রথম সহজলভ্য রম্য তরল উপঢৌকন সে পায় না, কিন্তু দৃঢ়তা তাকে গভীরতর পুরস্কারে সম্মানিত করে। অতএব যে নিয়তির সমস্ত চাতুরী নিরভিযোগ ভঙ্গিতে উপেক্ষা করতে শিখেছে, সে নিয়তির হাত থেকে শান্তির ছাড়পত্র পায়। এই নিয়তি, শেষ বিশ্লেষণে দেখা যাবে, সাংখ্য বা বেদান্তের প্রভাবস্পৃষ্ট নয়। এই নিয়তি বা ছলনাময়ী' কবির ঈশ্বরী যিনি দিতি ও অদিতির যুগল-প্রতিমা, কবি প্রকৃতপক্ষে তাঁরি স্বোপার্জিত পুরস্কার দেওয়ার অধিকারিণী ব'লে সাব্যস্ত করেছেন। এই দাত্রী সুতরাং নতুন কিছু দিচ্ছেন না, কবির মৌলিক ঐশ্বর্য

তাঁকে প্রত্যর্পণ করছেন। কবি চিরদিনই নারীর হাত থেকে উষ্ণীষ নিয়েছেন এবং শেষ মুহূর্তে ও তার ব্যতিক্রম স্থাপন করলেন না তিনি, এখানেই তাঁর জন্মার্জিত সৌজন্য আবার প্রমাণিত হলো। নিজের কৃতিত্ব পরমাশক্তির উপর আরোপ করলেন, আরো মহৎ হয়ে উঠলেন যেন। নিজের নির্বাচিত প্রেরণাশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে ইয়েট্‌স যেমন অসামান্য হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথও। তফাৎ, রবীন্দ্রনাথ ইয়েট্‌সের মতো আত্মপুরাণকে কোথাও স্পষ্ট ক'রে জানতে দিলেন না আমাদের, নিজের উপরে একটি মায়াবী আবরণ টেনে দিলেন।

রোমাঁ রোলাঁ রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে বীজমন্ত্রের মতো বলেছেন, 'He recoiled from everything that stood for 'No'.' এ-কথার অর্থ কি এই নয় যে না-র পুঞ্জীভূত শক্তি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, কিন্তু তার কাছ থেকে প্রত্যার্পিত হয়ে একটি অস্তিসূচক দৃষ্টিকোণে ফিরে এসেছেন। শ্যামলীর 'আমি' কবিতাটি আমাদের অনুমানের স্বপক্ষে অকপট বিবৃতি ঃ

অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করছেন সাধনা / মানুষের সীমানায় / তাকেই বলি 'আমি' / সেই আমির গহনে আলো-আঁধারের ঘটল সংগম / দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস / 'না' কখন ফুটে উঠে হল 'হাঁ' মায়ার মন্ত্রে / রেখায় রঙে সুখে দুঃখে।

রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ কবিতাতেও 'না' হয়ে উঠেছে 'হাঁ', ঊষর গহ্বর সেই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা হয়ে উঠেছে উর্বরা মাটি, অবিশ্বাস সাজানোর গুণে বিশ্বাস হয়ে উঠেছে। আর তাঁর কবিতার তত্ত্ব সম্পর্কেও এই একটি নতুন আবিষ্কার এখানে উন্মোচিত হয়েছে যে আলো আর অন্ধকার, চৈতন্য আর অচেতনার সংগমেই শুদ্ধ কবিতার জন্ম। এই রহস্যের বোধ না থাকলে তাঁর এ-কবিতাটি 'Crossing the Bar'-এর মতো ভিক্টোরিয় একটি মনোমুগ্ধকর ভক্তিরসের কবিতা হয়েই থাকতো, আমাদের বিবেকী অস্তিত্বকে এমন ক'রে বিদ্ধ করতো না।

কবিতা ও গান

দ্বৈত পটভূমি : কবির প্রেমসংগীত

প্রস্তাবনা

'প্রতিটি প্রিয় বিষয় এক-একটি স্বর্গের কেন্দ্রকারক', বীজমন্ত্রের মতো নোভালিসের এই উক্তিটি রবীন্দ্রনাথের প্রেমসংগীতের অন্যতম সূত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তাঁর প্রতিটি প্রেমের গানেই আমরা এরকম এক-একটি সীমাস্বর্গ নির্ধারণ করে নিতে পারি। প্রত্যেক স্বর্গেই একটি প্রিয় বিষয় উপস্থিত, যদিও সেই বিষয় সব সময় নারী অথবা একই নারী নয়। বিষয়ী, কবিপুরুষ নিজে, সাধারণত একই ব্যক্তি হলেও, পরিবেশের চাহিদায় মাঝে মাঝে নিজেকে দুই অংশে বিভক্ত করে নিয়ে দ্বিতীয় অংশটিকে একটি বিষয়ের মর্যাদা দিয়েছে। শুধুমাত্র স্বগত পরিপ্রেক্ষিত বা আত্মদেবায়নের আয়োজনে এই গানগুলি লেখা, এরকম অনুমিতি-র কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বিষয়ী ও বিষয়ের এই প্রতিসাম্য ও পরস্পরস্পর্শিতা এই পর্যায়ের গানের একটি শর্ত এবং এটিকেই আমরা 'দ্বৈত পটভূমি' ব'লে চিহ্নিত করতে চাই।

এখানে এরকম নির্ণয় নিলে ভুল হবে যে পরস্পরস্পর্শী বিষয় এবং বিষয়ী অচ্ছেদ্য পারস্পরিকতায় আক্রান্ত অথবা সব ক্ষেত্রেই গোড়া থেকে তাদের আনুপাতিক সম্পর্ক প্রকাশ্যত ২ : ১ ; কখনো-কখনো এমন মনে হতে পারে বিষয়ী নিছক নিজেকে আস্বাদন করবার গরজে প্রপঞ্চমদির অছিলা হিসেবেই বেছে নিয়েছে তার বিষয়কে। যেমন, 'দিবসরজনী আমি **যেন** কার আশায় আশায় থাকি', এই গানে, অন্তত গানের সূচনায়, উৎপ্রেক্ষার অলংকরণ নয়, মনোভঙ্গির বিন্যাসই আকর্ষণের বিষয়। উৎপ্রেক্ষাময় 'যেন' পুনর্বার গানের শেষ পঙ্‌ক্তিতে বেজে ওঠে, কিন্তু ততক্ষণে প্রেমিক 'বাসনা ব্যাকুল আবেগে' নিজেকে তার অপর অংশীদারের সঙ্গে দেয়া-নেয়ার মর্মে তৈরি করে নিয়েছে। নিজেকে এই তৈরি করে নেওয়া, এই আত্মপ্রস্তুতির প্রক্রিয়াকে আমরা অনেক

সময়, লঘু সামান্যকথনের লোভে, মরমী আধ্যাত্মিকতার পরিচয়ে সনাক্ত করে বসি। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথ প্রায়শই তাঁর যাবতীয় আয়োজনে উর্ধ্বায়নের রশ্মি জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছেন। এবং সেই অভীপ্সা, সন্দেহ নেই, তাঁর কবিব্যক্তিত্বের একটি ঈপ্সিত প্রস্থানভঙ্গি। কিন্তু ঈষৎ তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে উর্ধ্বতর কোনো ঐশী সত্তার মধ্যে আত্মনিরঞ্জনের আর্তি নয়, অন্যতর অংশীদার বা গ্রাহকোপম বিষয়সত্তার সঙ্গে যোগাযোগ রচনার এষণা বিষয়ীকে প্রধানত অধিকার করে আছে। এবং কোনো অর্থেই শীলিত সংবেদনের মাধ্যমে কোনো উত্তরণের সহজ সোপান নয়, সংবেদনশীল দ্বিতীয় মানসের সাড়া পাওয়া-ই এ ক্ষেত্রে বিষয়ীর অনন্য অভিপ্রায়।

আধ্যাত্মিকতা : পুনর্বিবেচনা

আমরা এখানে রাবীন্দ্রিক থিয়লজির পূর্বপটের দিকে এক লহমা তাকাতে পারি। রাজা রামমোহন রায়ের কর্ষিত একাভিমুখী তত্ত্ব ('একমেবাদ্বিতীয়ম্') মহর্ষির বিভাবনায় তিন ভাগে ছিটিয়ে পড়েছিল : ভূ, ভুবঃ স্বঃ—পরমতায় আশ্রিত এই তিনটি উপাদান শেষ পর্যন্ত, ভিক্তর কুজাঁ-র থিয়োরির প্রণোদনায়, সত্য (Du vrai), সুন্দর (du beau), মঙ্গল (du bien) এই তিনটি উপপাদ্যে পরিণত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে ও চর্যায় যথাক্রমে এই দুই পূর্বসূরি-র একায়ত এবং ত্রিমুখী ধ্যানধারণা অজস্রবার ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু সৃষ্টিমুখী ভক্তিবাদের ভূমিকায় তাঁর ব্রহ্মণ্ বা ভূমা এইভাবে দ্বিধান্বিত :

ক.	জীবনদেবতা / বিশ্বদেবতা	খ.	সীমা / অসীম
গ.	রূপ / অরূপ	ঘ.	লীলা / দুঃখ

এই চতুর্বর্গ-ক্লিশে লাঞ্ছিত, এই মর্মে ন্যায্য অভিযোগ উত্থাপিত হতে পারে। কিন্তু এই-সমস্ত শব্দদ্বৈত কবি নিজে এবং তাঁর মুগ্ধ সমালোচকের দল অসংখ্যবার ব্যবহার করে প্রায় ক্ষয় করে ফেললেও এদের মধ্যে থেকে বিয়োগফল হিসেবে এই সত্যটি থেকে যাচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ এক বা তিনের (শেষোক্ত মানদণ্ড দান্তেকে মনে পড়িয়ে দেয়) বদলে দার্শনিক দুয়ের চালটিকেই পছন্দ করেছেন। আমাদের কাজ-চালানো তালিকাটির সর্বশেষ শব্দদ্বৈত (লীলা : দুঃখ) নিয়েও এই বৈধ মন্তব্য গ্রাহ্য যে রবীন্দ্রনাথ ক্রমান্বয়ে বৈষ্ণব ও খৃস্টীয় ভক্তিবাদ থেকে উপাদান সংগ্রহ ক'রে তাঁর প্রেমের গানে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আসল কথা কিন্তু এখানে এটাই নয় যে রবীন্দ্রনাথ এই অথবা ঐ ধর্মতত্ত্বের দ্বারা কী ভাবে এবং কতদূর প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি তাঁর প্রেমের গানগুলিতে ঐহিক প্রাণবেদনায় এমন এক-একটি স্বর্গ তৈরী করেছেন যা কোনো স্বর্গীয় তত্ত্বের দ্বারা পূর্ব-নির্ধারিত নয়, এটাই এখানে একটি বক্তব্য। এবং এটাও বলার কথা যে, সেই বেদনা দুয়ের চাল বা চলনের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে।

'আমরা দু'জন দু-দৃষ্টিকোণ দিতাম তাকে হেসে'—জীবনানন্দ

আরেকটু বিছিয়ে এখানে কথাটা বলা যেতে পারে। 'দোঁহারে দেখেছি দোঁহে'—এই মূল্যায়নের মধ্যেই তাঁর প্রেমের গানগুলির পরিচিতি। দুজনে এখানে দুজনকে দেখছে এবং এই দৃষ্টিকোণের দোটানার মধ্য দিয়ে যা সঞ্চারিত হচ্ছে তাকে আমরা 'প্রেম' বলে নির্দিষ্ট করতে পারি। অখণ্ড গীতবিতানের সৌজন্যে এখানে স্পষ্ট করে আজ বলা সম্ভব, রবীন্দ্রনাথ এই দৃষ্টিকোণ-বিনিময়ের অভিজ্ঞতাকে 'প্রেম' ব'লে অভিহিত করতেও তেমন উৎসুক ছিলেন না। পূজা পর্যায়ে প্রেম-বাচক শব্দ অন্তত ১৩১ বার ব্যবহৃত হয়েছে। 'বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে'—এই ১৫ লাইনের গানটিতে 'প্রেম' শব্দের উদ্‌বেলিত প্রয়োগ ঘটেছে ধ্রুবপদের মুখে এবং অনুভাবের বৈচিত্র্যে, ছ'বার। পূজা-বর্গের আরেকটি গানে ('বেঁধেছ প্রেমের পাশে ওহে প্রেমময়') বারো লাইনের মধ্যে ন'বার আলোড়িত হয়েছে 'প্রেম' শব্দটি। সেই তুলনায়, তাঁর প্রেমের গানেই শুধু এই শব্দের অনটন নয়, প্রেম-বিষয়ক নাট্যগুচ্ছে—'মায়ার খেলা' 'চণ্ডালিকা' 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'শ্যামা' সব মিলিয়ে প্রেমসংক্রান্ত শব্দপুঞ্জ (৬৭ বার) এবং 'ভানুসিংহের পদাবলী'তে (২৩ বার) নির্মম কার্পণ্যের সঙ্গে ব্যঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। বলা বাহুল্য, 'প্রেম' শব্দের পৌনঃপুনিক প্রয়োগপ্রাচুর্যেই প্রেমের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয় না। এবং রবীন্দ্রনাথ নামক গরঠিকানিয়া সত্তার ক্ষেত্রে এই ধরনের পাথুরে প্রমাণ সন্ধানের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এটা লক্ষ্য না করে উপায় নেই যে, এই শব্দটি সম্পর্কে কবি-গীতিকার নিজে আদৌ কৃপণ ছিলেন না, বরং শব্দটিকে যত্রতত্র তিনি কাজে লাগিয়েছেন। শুধু তাঁর প্রেমের গানেই শব্দটি সম্পর্কে তাঁর সতর্ক সমীহা চোখে পড়ার মতো। এই পর্যায়ের কোথাও নেই ব্রহ্ম-সংগীতের অনায়াস প্রেমিকোপমতা : 'নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও।'

আধুনিকতা, বিরোধাভাস (ambivalence)

এখানেই প্রখর হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের সেই দুর্মর দুরবগাহ মন, বিরোধাভাসের মধ্য দিয়ে যার অভিব্যক্তি। গীতবিতানে প্রকৃতি-পর্যায়ের গানগুলিতে—যেখানে প্রেমবাচক শব্দ প্রত্যক্ষত সাত বার ব্যবহৃত—এই দ্বন্দ্ববোধ বোধ হয় সব চেয়ে তির্যক। নবমী তালের 'ব্যাকুল বকুলের ফুলে' গানটিতে 'পুলকে উঠে দুলে দুলে', যদিও তার মুখচোরা উপলক্ষ (প্রেম) কোথাও উল্লিখিত হয় নি। গানটি নাটকীয়তা নিহিত হয়ে আছে শেষ পঙ্‌ক্তিতে, যেখানে নিখিল ভুবন বিরহসমুদ্রের কূলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরি মধ্যে অতর্কিতে ঘটে গেছে মন-চুরি করার সমাচার।

রবীন্দ্রনাথ, বিশেষত তাঁর প্রেমের গানে, স্থির করে নিয়েছেন, ধরা দেবেন না, সম্ভব হলে এক মুহূর্তের জন্যেও। তাই প্রেম-পর্যায়ের গানে তাঁর

অন্যতম আকাঙ্ক্ষা প্রেমের প্রথানুগত ধারণাটিকে ভেঙে দেবেন। বিনিময়ে অন্য কোন্ প্রেক্ষণী রেখেছেন তিনি? অর্তেগা ঈ গ্যাসেট-ও তাঁর Estudios Sobre el Amor (প্রেমের বিষয়ে) বইটিতে প্রেমবিষয়ক যাবতীয় সংস্কারগুলি ভেঙে দিতে চেয়ে একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন: ekstasis, অর্থাৎ নিজের এবং জগতের বাইরে বেরিয়ে-পড়া-র উত্তাল প্রবণতা। গ্যাসেট, প্রসঙ্গত, দু-পর্যায়ের মানুষের কথা বলেছেন: একদল, যারা নিজেদের বাইরে বেরিয়ে যেতে পারলেই (তু. 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া') আনন্দ পায়, আর অন্যেরা, যাদের চিন্ময় বা দিব্য উন্মত্ততা স্বয়ংসিদ্ধ অস্তিত্বের আস্বাদেই। এখানে এক মুহূর্ত দ্বিধা না করেই বলা যায়, প্রেম-সংগীতের রবীন্দ্রনাথ প্রথমোক্ত পর্যায়ের বিশ্বনাগরিক। নিজের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসার তাগিদেই তিনি ভালোবাসার গান লিখেছেন, পথ কেটেছেন তার হৃদয়ে, যেখানে তার সম্পূরক আরেকটি উপস্থিতির চরণ পড়ে। আর এই আত্ম-অতিক্রান্তির প্রক্রিয়ায় তিনি তুলে ধরেছেন আধুনিক মনের প্রথম এবং প্রধান বিভাব; যাকে আমরা, তাঁরই ভাষায়, 'আত্মপ্রতিবাদের ঐক্য' ব'লে মুদ্রাঙ্কিত করতে পারি।

'আমি কি নিজেরই প্রতিবাদ করছি? হ্যাঁ, আমি নিজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থাপন করছি; কেননা আমার মধ্যে সন্নিহিত হয়ে আছে বিশ্ব-সমগ্র'—হুইটম্যানের এই পরিপ্রেক্ষণীর পটে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানের অমোঘ অভিঘাত বুঝে নেওয়া সম্ভব। বিশ্ব অথবা বিশ্বোপম একটি সহ-অস্তিত্ব বা সতীর্থ নশ্বরকে নিয়ে তিনি এই পর্যায়ের গান বেঁধেছেন এবং একটি গানের সঙ্গে পরবর্তী গানের ব্যবধানকে দুস্তর করে দিয়েছেন। গীতবিতানের ৩৯৫টি প্রেমের গানের প্রায় প্রতিটিই স্বীয় সত্তার প্রতিবেদন, অর্থাৎ একটি গানের সঙ্গে অন্য গানের পরিবেশিত জগতের কোন আপাতমিল নেই। অসংখ্য অণুবিশ্ব বা multiverseই এখানে সম্পাদ্য সূত্র, একটি সর্বান্বয়ী বিশ্বলোক বা universe নয়।

এবং এই গানগুলি শুনতে-শুনতে যদিও-বা ভাবানুষঙ্গের আকর্ষে আমরা একটি সামগ্রিকতার সম্মোহে নিজেদের নিবেদন করি, পড়তে গিয়ে দেখতে পাই, এদের মধ্যে উচ্চারিতভাবে দ্বৈতায়নের রহস্য লেগে আছে। প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে তা হল গ্যাসেট-কথিত দ্ব্যর্থদ্যোতক দৃষ্টিভঙ্গি। গ্যাসেট এই সূত্রে একটি শব্দ নিয়ে খেলা করেছেন: tacto; স্পেনীয় এই শব্দটির দুটি অর্থ: ১. সদর্থক অর্থেই tact বা 'অবস্থা অনুযায়ী আরেকজনের মন-বুঝে-চলার সামর্থ্য' ও ২. 'স্পর্শচেতনা'। আলোচ্য প্রসঙ্গেও আমরা এমন একটি চিত্তবৃত্তির সন্ধান পাই যা অনুরূপ অভিযোজনে আস্থাবান, এবং 'একটুকু ছোঁয়া' লাগলে যার মধ্যে বাণীর সন্দীপন জেগে ওঠে। এই দুটি স্তরের কোনোটিই আলাদাভাবে চূড়ান্ত সত্য নয়। এবং এই দুয়ের নিরন্তর

সমন্বয়সাধন কোনোক্রমেই গীতিকারের উদ্দিষ্ট ব'লে গৃহীত হতে পারে না। হতে যে পারে না, অথবা ওরকম কোনো সারূপ্য যে তাঁর অভিপ্রেত নয়, সেদিকে দৃষ্টি রেখে তিনি বিষয়ী ও বিষয়ের এই দ্বৈত-সম্পর্কময়তাকে সুন্দর-ভাবে ভেঙে দিয়েছেন সংখ্যাতীত অনুপুঙ্খ মুড বা মর্জির আশ্রয়ে, দুয়ের চলনে। এই বিভাজনের আরম্ভ প্রচলিত 'তুমি-আমি'-র দ্বৈতায়নে, প্রেম-পর্বে যে-যুগ্মকের ব্যবহার ১৪১ বার। এই 'তুমি-আমি'-র যুগ্মতাকে তিনি ক্রমশ চূর্ণ করে দিয়েছেন নানা ধরনের যুগ্মক মুহূর্তে ও মেজাজে। এখানে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রধানত তারই ব্যবহৃত শব্দবন্ধের মাধ্যমে নির্মিত ঃ

১ সীমা ঃ অসীম
২ বেলা ঃ অবেলা
৩ বিরহ ঃ মিলন
৪ আনা ঃ গোনা
৫ সুখ ঃ দুখ
৬ চেনা ঃ অচেনা
৭ আঁধার ঃ আলো
৮ হারানো ঃ খুঁজে-পাওয়া
৯ এ কূল ঃ ও কূল
১০ জোয়ার ঃ ভাঁটা
১১ দেহ ঃ মন
১২ ভিতর : বাহির
১৩ দিবস ঃ রাতি
১৪ সাগর ঃ কিনার
১৫ আশা ঃ নিরাশা
১৬ জাগরণ ঃ ঘুম
১৭ প্রাণ ঃ মরণ
১৮ স্বর্গ ঃ ধরণী
১৯ কাছে ঃ দূরে
২০ নূতন : পুরাতন
২১ মৃত্যু ঃ অমৃত
২২ দেয়া : নেয়া
২৩ স্মৃতি ঃ বিস্মৃতি
২৪ ধরা ঃ অধরা
২৫ বাঁধন ঃ নাশ

এই পঁচিশটি শব্দযুগ্মকের পাশাপাশি নিশ্চয়ই, তালিকাটিকে শরীরীতর ক'রে তুলবার প্রবর্তনায় এখানে অন্তত আরো পঁচিশটি বর্গ অন্বিত হতে পারে। কিন্তু সেই সাংখ্য সংযোজনের ফলে মূল প্রস্তাবটি অযথা আরো-কিছু জোরালো হয়ে উঠবে না। তাই, শুধুমাত্র প্রদত্ত এই শব্দজোড়ের ভিত্তিতেও যদি গীতিকবির বিরোধাভাসের আধুনিকতাকে একটি প্রমাণিত তথ্য ব'লে স্থাপন করা যায় তা হলে কোনো গুরুতর প্রমাদ ঘটবে না।

তার তাৎপর্য এই, এ-সমস্ত গানে একমাত্র বিষয়ী-ই নিজেকে রোমাণ্টিক কোনো 'অহংধর্মী উত্তরণে'র (egotistical sublime) পরমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে নি। বরং আপাতদৃষ্টিতে, কবিপুরুষের অপরিহার্য 'আমি'র উহ্য ব্যবহার খনন ক'রে দেখলে উহ্য-'তুমি'র ব্যবহারের তুলনায় (১৬৮ বার) অনেকটা অনির্ণীত হয়ে পড়ে। অনির্ণীত এই অর্থে যে কবির অস্মিতা এই-সব ক্ষেত্রে অনুমানের সামগ্রী। বলা বাহুল্য, সব কবিই নিজেকে দিয়ে শুরু করেন, ধ্রুপদী / রোমাণ্টিক / মিস্টিক—যে-নামেই তাঁকে চিনিয়ে দেওয়া যাক-না কেন। কিন্তু সৃষ্টির প্যাটার্নের মধ্যে নিজেকে কোথায়

কেমনভাবে স্থাপন করেন তাই নিয়েই তাঁর প্রধান পরিচয়। প্রেমের গান লিখতে বসে রবীন্দ্রনাথ নিজের অনুভূতি রোমাণ্টিক ধরনে জারি করতে চান নি। বিষয়ের মধ্যে নিজেকে ধ্রুপদী ভঙ্গিতে লুপ্ত ক'রে দেওয়া এবং ঊর্ধ্বতর সত্তার কাছে নিজেকে নিঃশর্ত মিস্টিক মুদ্রায় সমর্পণ ক'রে ফেলা, এদের মধ্যে কোনোটিই তাঁর কাম্য ছিল না। এই-সব গানে—প্রকৃতি বা পূজা-র গানগুলি সম্পর্কে এ কথা পুরোপুরি প্রযুক্ত হতে পারে কিনা সেটা এখানে জরুরি প্রশ্ন নয়—কবি রচনা করেছেন দুটি ভিন্নমুখী মানসিকতা, প্রতিবেশ বা মুহূর্তের সহাধিষ্ঠান যেখানে আমি ও তুমি, বিরহ ও মিলন সমান সাজে মিলে যায়। এই দুয়ের মিলন বিরোধাভাসের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে।

আমরা এই মনোভঙ্গিকেই বলব আধুনিক। আজ পর্যন্ত আমাদের আর কোনো কবি-গীতিকার তাঁদের প্রেমের গানে এই আধুনিকতা দেখাতে পারেন নি। তার প্রধান কারণ এই যে তাঁর প্রেমের গান রচনার মুহূর্তে প্রচলিত রোমাণ্টিক গীতিকবিতার অনতিজটিল মেজাজটি মনে রেখেছেন। আর সেই মেজাজ হল পলগ্রেভ-নির্দেশিত : 'lyrical has been here held essentially to imply that each poem shall turn upon a single thought, feeling, or situation.' এক-এক মুহূর্তের এক-একটি ভাবমণ্ডল বা অনুভূতি অথবা পরিমণ্ডলের উপরেই এই লিরিকধর্মিতার ভর একথা জেনেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রেমের লিরিকে একই মুহূর্তে দুই বিভিন্ন ভাবমণ্ডল বা অনুভূতি অথবা পরিমণ্ডলকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একান্ত স্বগত আদলের গানেও আমরা এই দুই ভিন্নধর্মী সত্তার নানামুখী একাঙ্ক্ষা দেখতে পাই যেখানে স্বগতোক্তিগুলি একটি প্রতিমুখী বিভাব বা প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশী। এই ধরনের প্রচ্ছন্ন, তীব্র নাটকীয়তায় স্পন্দমান একটি গান, 'কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে'। 'একটি আঁধারক্ষণে' কী ভাবে দীর্ঘায়িত সাধনার একান্ত উপহার একটি গান, একটি ভালবাসার গান, কবি পেয়ে গিয়েছিলেন, গানটির ভাবগত আরোহে তার বৃত্তান্ত আছে। অবরোহে দেখতে পারছি পরিস্থিতি আমেরু আলাদা, প্রেমিকার শারীরিক উপস্থিতি সত্ত্বেও সেই গানটি আবার তৈরি হয়ে উঠতে পারল না। এখানে আমরা নানা স্তরে কবির প্রত্যাশিত বিসংগতি অনুভব করতে পারি : কবি ও প্রেমিক, প্রেমিক ও প্রেমিকা, প্রেম ও শিল্প, পরিবেশ ও মন, এদের মধ্যে বিছানো রয়েছে দ্বন্দ্বময়তার চিকন কারু-কাজের মায়াজাল। এই সূত্রে আরো একটু এগিয়ে গিয়ে একটি তৃপ্তিকর অনুমিতির সম্ভাব্যতা বিচার করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানে প্রকৃতি কি এসেছে আলম্বন-বিভাবের মর্যাদায়? অনেক সময় এই গানগুলিতে প্রেমিক এইরকম একটি ভঙ্গি পোষণ করে যে তার সংগীত বা আঙ্গিকটি যেন নিতান্তই প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভর ক'রে আছে। যেন প্রকৃতিই চরিত্রেই মনোভাবনা ঘটিয়ে দিচ্ছে। এরকম কয়েকটি বিখ্যাত উদাহরণ :

১. চাঁপার কলি চাঁপার গাছে
সুরের আশায় চেয়ে আছে,
কান পেতেছে নতুন পাতা গাইবি ব'লে।
২ শিশির-ধোওয়া হাওয়ার ছোঁওয়া লাগল বনে—
সুর খুঁজে তাই শূন্যে তাকাই আপন-মনে॥
৩. আজি অকারণ বাতাসে বাতাসে
যুগান্তরের সুর ভেসে আসে,
মর্মরস্বরে বনের ঘুচিল মনের ভার।

এরকম উচ্চারণ প্রেম-পর্যায়ের প্রত্যেকটি বাঁকেই শুনতে পাই আমরা। এবং এই-সমস্ত উচ্চারণেও আমাদের মনে নন্দিত হতে থাকে এই একটি বাসনা, অসহায় প্রেমিক নিজেকে প্রকৃতির কাছে বিলিয়ে দিচ্ছে অকাতরে, আর তার ফলেই পাচ্ছে তার অবচ্ছিন্ন স্নায়ব অস্তিত্ব মেদুর আরাম ও আশ্রয়। দ্বিতীয়বার পিছনে ঘুরে তাকালেই কিন্তু ভেঙে যাবে এই স্বস্তিময় ভুল ধারণা। প্রকৃতি এখানে প্রেমের পাশাপাশি আরেকটি শক্তি। সে আরো শক্তিশালী নয়। তার ভূমিকা হল সাহচর্যের, কখনো-বা প্রতিযোগিতার, অর্থাৎ অপর অস্তিত্বের বিন্যাস। কখনো-কখনো প্রেমের উপর তার চাপ পড়ে ঈষৎ বেশি, যেমন কখনো-কখনো প্রেম প্রকৃতির উপরে একটু-বা তীক্ষ্ণ করক্ষেপ ক'রে বসে ('তব কুঞ্জের পথ দিয়ে যেতে যেতে / বাতাসে বাতাসে ব্যথা দিই মোর পেতে', এই দ্বিপদীতে যেমন নিসর্গ উদ্দীপন-বিভাবেরও কৃতিত্ব নিয়ে আসে না)। এবং এই দারুণ টানাপোড়েনে জয়ী হয় না কোনো শক্তিই শেষ পর্যন্ত, না-প্রকৃতি, না-প্রেম। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের অনিঃশেষ আততি তাঁর প্রেমের গানগুলিকে দিয়েছে অমীমাংসিত এক জটিলতা। এই কারণেই বোধ হয় আধুনিক ভারতীয় মানসের কাছে তাদের আবেদন এত প্রবল।

তত্ত্ব, না নান্দনিক ঝোঁক ?

তাঁর সংকলন থেকে পলগ্রেভ, যাঁর আদর্শে গীতবিতানে 'ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে গানগুলি সাজানো হয়েছে'—সেই-সমস্ত তত্ত্বনির্ভর কবিতা বর্জন করেছেন যাদের মধ্যে নেই গতিচ্ছন্দ, মিতকথন এবং মানবিক ভাবাবেগের বর্ণালি ('didactic poems···unless accompanied by rapidity of movement, brevity and the colourings of human passions, have been excluded')। রবীন্দ্রনাথের দ্বিতাত্ত্বিক প্রেমের গানেও পলগ্রেভ-বর্ণিত বিশেষত্বগুলি লক্ষ করা যায়। আমরা এরকম কোনো থীসিস প্রণয়ন করতে চাই না যে রবীন্দ্রনাথের এই-সব গানে নেই কোনো তত্ত্বগত প্রকল্পের তাড়না, নান্দনিক প্রস্বর দেখিয়ে দেওয়াই রচয়িতার অদ্বিতীয় উদ্দেশ্য। এটুকুই প্রাসঙ্গিক বক্তব্য, তত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্বের সমাহার গীতিকারের দুরূহ দাবি। জানি, এই উচ্চাশা সব সময় কৃতার্থ হয় নি। তাই 'দুঃখের যজ্ঞ-

অনল-জ্বলনে জন্মে যে প্রেম / দীপ্ত সে হেম'—এ-জাতীয় উপদেশাত্মক নিরুক্তি আমাদের বিরক্তই করে, যেহেতু রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্ব এখানে কবিব্যক্তিত্বের স্বাধিকারকে রীতিমত ক্ষুণ্ন ক'রে বসে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান বলতে আমরা বিশেষ যে-শিল্পকাজটি বুঝে থাকি সেখানে নেই পূর্বধার্য কোনো তত্ত্বের অবান্তর পরাক্রম। আরো একটু ঝুঁকি নিয়ে এ কথা বলা সম্ভব যে কীট্‌সীয় 'মহতী অনিশ্চিতি'র (negative capability) তুল্য একটি ক্ষমতা সেখানে লক্ষণীয় যার সাহায্যে কবিপুরুষ নিজে সৃষ্টির মুহূর্তে রূপান্তরিত হতে থাকে। আর এর ফলে উপপাদ্য-তত্ত্ব ম্লায়মান হতে থাকে, নান্দনিক ঝোঁকটি হয়ে ওঠে ক্রমশই মনোরম, এবং নতুন একটি 'তত্ত্ব' দেখা দিতে থাকে। তাই 'রবীন্দ্রগীতির অন্তরা তাঁর গানে-রত মানসলোকে ধ্রুব অবসর দান করেছে, এরকম বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। ভাবনা ও সুরের সন্ধিক্ষণে যেন তিনি সেইখানে এসে দাঁড়িয়েছেন, সৃজনগতিকে নূতন পথে চালিত করেছেন। অনেক সময়ে দেখা যায় অন্তরা-য় এসে তাঁর গানের মোড় ঘুরে গেল, ঝোঁক বদলিয়ে অথবা অপ্রত্যাশিত শিল্পিত নূতন গলি বেয়ে তাল এবং **বাক্য সাধিত হল**। বলা বাহুল্য **অবচেতনার তলে তলে গান তৈরি হয়ে ওঠে**, সেই ধ্বনির তরঙ্গময় চিত্তবেগ গণনা করা যায় না'—অমিয় চক্রবর্তীর এই নিরূপণ ("রবীন্দ্রগীতির অন্তরা", গীতবিতান পত্রিকা, ১৯৬১, পৃ. ৬৫। বিশেষ চিহ্নটি এখানে অন্বিত হয়েছে) নির্ভুল বলে মনে হয়। স্রষ্টার এই রহস্যময় রূপান্তর এবং 'বিশেষ দৃষ্টির ক্রিয়া' অনেক সময় প্রথম ঝোঁকে উত্থাপিত বা সমাপ্ত হয় নি, সেজন্য দরকার হয়েছে নতুনতর স্তবকের, যেখানে আচম্‌কা বলার কথাটি সূচিত হয়েছে বলে কবি তাকে পরিণতি দিতে চেয়েছেন। এই ধরনের একটি গান 'আরো কিছুখন নাহয় বসিয়ো পাশে।' নিতান্তই কথা-র জাল বুনতে-বুনতে সম্পন্ন হয়ে গেছে প্রথম রবীন্দ্রকর্ষিত সেই চলন যার মধ্যে স্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগের আপাত-সম্পূর্ণতা আছে। কিন্তু এই চলন শেষ হয়ে যাবার পরেই কবির কাছে আসল কথাটা উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে ব'লে আরো একবার দ্বিতীয় ঝোঁকের চাহিদায় স্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগ নিয়ে তাঁকে আরেকটি আয়তন নির্মাণ করতে হচ্ছে।

> দ্বিধাভরে আজো প্রবেশ কর নি ঘরে
> বাহির আঙনে করিলে সুরের খেলা।

আর সেই উদ্‌ঘাটনের আলোয় তিনি 'গভীর বাণী'র সন্ধানে নিবিষ্ট হয়েছেন :

> যে গভীর বাণী শুনিবারে কাছে এলে
> কোনোখানে কিছু ইশারা কি তার পেলে
> হে পথিক, বলো বলো—
> সে বাণী আপন গোপন প্রদীপ জ্বেলে
> রক্ত আগুনে প্রাণে মোর জ্বলোজ্বলো॥

স্পষ্টতই, আবিষ্ট হবার পর রহস্যের ঘোর কাটিয়ে উঠে, বুঝতে পারা যায় কবি বা গীতিকার 'বাণী' বলতে কোনো প্রস্তারিত তত্ত্বকে বোঝান নি। প্রতারক এই 'বাণী' শব্দটি এই ধরনের আরো কোনো-কোনো গানে উঠে এসেছে, এবং এটা অনুধাবন করে ওঠা কঠিন নয়, এই বাণী ধ্রুবপদের মতো একাধিকবার ব্যবহৃত 'না-বলা বাণীর'ই সমার্থক। অর্থাৎ কবি আমাদের কাছে মূলত কোনো তত্ত্বধর্মী বক্তব্য দাখিল করতে চান না, নিজেকে, এবং সেই সূত্রে বিষয়ের আবিষ্কার করবার প্রবণতাই তাঁর প্রিয়, এবং এই আত্মআবিষ্ক্রিয়ার প্রক্রিয়া থেকেই কোনো একটি জায়মান বক্তব্য শেষ মুহূর্তে তার পরিণামী স্বরূপ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সুরের পর্যালোচনা এখানে করা হচ্ছে না। একটি অনিবার্য উদাহরণই শুধু দেওয়া যেতে পারে। কানাড়াশ্রিত 'আমার পরান লয়ে কী খেলা খেলাবে' গানের সমাপনের মুখে 'কে আসে কাহার পাশে কিসের টানে' অংশের শেষ ধ্বনিতে দেশ রাগের আরোহণের অভ্রান্ত সংস্পর্শ যখন লাগে, তখনই গানটির মর্জি ও ডৌল প্রকাশ পায়, তার আগে নয়। গীতিবন্ধের প্রসঙ্গেও এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ আমাদের এভাবে বুঝিয়েছেন, 'একটি গান যখনই ধরা যায় তখনই তার রূপ প্রকাশ হয় না ; তার একটা অংশ সম্পূর্ণ হয়ে যখন সমে ফিরে আসে তখন সমস্তটার রাগিণী কী এবং তার অন্তরাটা কোন্ দিকে গতি নেবে সে কথা চিন্তা করবার সময় আসে' ("ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা", রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬, পৃ. ৩৭৪)।

তাঁর প্রেমের গানে সব চেয়ে বড়ো কথা এই রূপের গতি যার ফলে সমস্ত সময় চোখে পড়তে থাকে একটি পরিবর্তনের পরম্পরা। কোথাও তা স্থিরচিত্রার্পিত নয়, অথবা একটিমাত্র মুহূর্তে মর্জিকেই এঁকে-তোলার অনুশীলনে যেখানে শিল্পীর সমস্ত উদ্যম সমাপ্ত হয়ে যায় নি।

তাঁর গদ্য সন্দর্ভের সঙ্গে ভাবগত আত্মীয়তা সন্ধান করতে গেলে স্ফুটতর হয়ে ওঠে প্রেমের গানের জঙ্গম এক রহস্যধর্ম। এখানে পর-পর একটি গদ্য অনুচ্ছেদ এবং একটি গীতিস্তবক সন্নিবেশিত হতে পারে :

> বহুদিনের কর্মক্ষোভ হতে উত্থিত ধূলির আবরণ ধুয়ে আজ ভেসে যাক—পবিত্র হই, স্নিগ্ধ হই। এসো, এসো, তুমি এসো—আমার দিক্‌দিগন্ত পূর্ণ ক'রে তুমি এসো! হে গোপন, তুমি এসো! প্রান্তরের এই নির্জন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে, আকাশের এই নিবিড় বৃষ্টিধারার মধ্য দিয়ে তুমি এসো!

> আমার নিশীথরাতের বাদলধারা, এসো হে গোপনে
> আমার স্বপনলোকে দিশাহারা ॥
> ওগো অন্ধকারের অন্তরধন, দাও ঢেকে মোর পরান মন—
> আমি চাই নে তপন, চাই নে তারা ॥

দুটি অংশেরই বক্তব্য, এমন-কি স্বরায়ণ (intonation) প্রায় এক। প্রথম

অংশের প্রার্থী 'আমি' যৌথ, 'তুমি'-ও সম্মেলক উপাসনায় উদ্‌যাপিত ঈশ্বর, দ্বিতীয়টির শরণার্থী একান্ত একক, এবং 'নিশীথরাতের বাদলধারা'তার অন্তরঙ্গ যুগ্মতার প্রতীক। কিন্তু প্রথম অনুচ্ছেদের প্রার্থনা শুদ্ধ হবার উদ্দেশ্যে নির্মিত একটি আদর্শ ভাবচ্ছবি, দ্বিতীয় স্তবকের গূঢ়ৈষণা একটি নির্মীয়মাণ চলচ্ছবির প্রাণবন্ত উপাদান। এই সংকেতের তাৎপর্য এই নয় যে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানে শুদ্ধতার কোনো আর্তি নেই। রবীন্দ্রনাথ যাকে 'নিভৃত শুভ্রতা' বলেছেন তার স্থান এখানে প্রকটিত অন্ধকারের অব্যবহিত পাশেই। 'মম রুদ্ধ মুকুলদলে এসো সৌরভ-অমৃতে / মম অখ্যাত তিমিরতলে এসো গৌরবনিশীথে' এই সংহত গানটির মধ্যে অতর্কিতে যেন অবৈধ ভঙ্গিতে প্রবর্তিত হয়েছে উত্তরণের উৎকাঙ্ক্ষা: 'নব অরুণের এসো আহ্বান / চিররজনীর হোক অবসান—এসো।' কিন্তু রাত্রির পাশে সকালকে স্থাপিত করা কোনো দিক থেকেই প্রেমিক কবির অভিপ্রেত নয়, কেননা 'রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে', ঠিক সেই অনির্ণেয় মোহনায় এসে সম্পূর্ণ হয়েছে তাঁর বক্তব্য: 'এসো শুভস্মিত শুকতারায় / এসো শিশির-অশ্রুধারায় / সিন্দুর পরাও উষারে তব রশ্মিতে।' মিলনের একটি আলেখ্যে এখানে আয়ত হয়েছে একটি আকাঙ্ক্ষা, আত্মশুদ্ধির উদ্দীপনা নয়।

এই মিলনরাত্রির প্রহর গোনার পালাও এক সময় শেষ হয়ে যায়। তার অনিবার্য বিকল্প বিপ্রলম্ভ তবুও প্রেমিকের মনে রেখে যায় না অনপনেয় দাগ। তাঁর কাছে মিলন ও মাথুর সমমূল্য। সম্ভোগ মানেই অশুদ্ধি এবং বিরহের মানেই আত্মশুদ্ধির ভূমিকা নয়। তাই দুয়েরই অতিক্রান্তির আশংকা তাঁকে বিপন্ন করে না। তাঁকে তখন শুধু আলোড়িত করে 'সুরের রূপে'র সমস্যা, এবং দ্বৈত পটভূমির শিল্পায়ন কী ভাবে সম্ভব শুধুমাত্র সেই উৎকণ্ঠা:

> হয়েছে শেষ, তবুও বাকি কিছু তো গান গিয়েছি রাখি—
> সেটুকু নিয়ে গুনগুনিয়ে সুরের খেলা খেলো।

যে-বাণী ওই ধানের ক্ষেতে

'সাহিত্যের আদিম সত্য হচ্ছে প্রকাশ মাত্র, কিন্তু তার পরিণাম-সত্য হচ্ছে ইন্দ্রিয় মন এবং আত্মার সমষ্টিগত মানুষকে প্রকাশ। ছেলেভুলানো ছড়া থেকে শেক্‌স্‌পীয়রের কাব্যের উৎপত্তি। এখন আমরা আদিম আদর্শকে দিয়ে সাহিত্যের বিচার করি নে, পরিণাম-আদর্শ দিয়েই তার বিচার করি'—কবির এই নির্ধারণ হার্ডারের লোকায়তিক ভাবনা থেকেই নিষ্ক্রান্ত। হার্ডার তাঁর 'লোকপদাবলি' (Folkslieder/১৭৭৮-৭৯) সংকলনের যুগেই এই ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন। লোকসংগীতের মধ্যেই শিল্পসংগীতের উপাদান প্রচ্ছন্ন, এটি কোনো বৈপ্লবিক সমাচার নয়। আমাদের মার্গসংগীতের পরতে-পরতে 'বৃহদ্দেশী' আত্মা ও আবহ জড়িয়ে আছে। পরবর্তীকালে 'উচ্চাঙ্গ সংগীত' সংজ্ঞায়ন তাই আসলে আমাদের অবক্ষয়গ্রস্ত বর্ণহিন্দু সংস্কারেরই অন্তিম অভিক্ষেপ। লোকসংগীত কখনোই অন্ত্যজ নয়, এবং শাস্ত্রিক শিল্পরীতির তুলনায় মন্ত্রবর্জিত তো নয়ই। দুয়ের মধ্যে তফাত কোথাও মেরুপ্রমাণ নয়, মাত্রাগত। এরা একই কবিতার দুই পাঠভেদ। তার মানে এই নয় যে প্রথম পাঠটি অশুদ্ধ। তবু যে সংস্কারগ্রস্ত বিশেষজ্ঞেরা কেন এক থেকে আরেকের উত্তরণের কথা অতিরিক্ত জোর দিয়ে বলেছেন, তার কারণটি এখানে ভেবে দেখা প্রাসঙ্গিক।

গত কয়েক শতকে যাঁরাই লোককবিতা সংগ্রহ ও প্রচারের কাজে বৃত হয়েছিলেন, তাঁদের মনে এই বোধ বদ্ধমূল ছিল যে এই ধারাটিকে সুচিহ্নিত করতে গেলে তাকে তথাকথিত শীলিত শিল্পগাথা থেকে ছিন্ন করে দেখাতে হবে। এমন-কি এ ব্যাপারে এখনো অতুতীয় গ্রীম-ভ্রাতৃদ্বয় এই বিভাজনের নেশায় মেতেছিলেন। তাঁদের প্রচারিত 'প্রাকৃত কবিতা' (Naturpoesie) ও 'শিল্প কবিতা' (Kunstpoesie) সংক্রান্ত তত্ত্বে তার নজির আছে।

অবজ্ঞাত অতল থেকে আলোয় তুলে আনার তাগিদে প্রাকৃত কবিতাকে নন্দিত করা সত্ত্বেও বিদগ্ধমহলে ফল হল ঠিক বিপরীত। পণ্ডিতেরা তখন থেকেই ঠাউরে নিলেন লোককবিতা নিচুতলার ঘটনা, আলোর নীচের অন্ধকারের মতো। এমন-কি তার ভিতরে যে অধ্যাত্ম অনটন রয়ে গিয়েছে, এই মর্মেও তাঁরা রায় দিয়েছেন। উত্তরণস্পৃষ্ট মানসের কাছে তার ফলে লোকগীতি সম্পর্কে এই বাসনা এখনো প্রবল যে তার মধ্য থেকে বিবেকী ব্যছাই করে নিতে হবে, তা না হলে সহৃদয়ের কাছে তাকে পরিবেশন করা যাবে না। এমন-কি হার্ডার বা রবীন্দ্রনাথও এ ধরনের শুদ্ধসত্ত্ব মনোভাবের শিকার হয়েছেন। তাই, শরীরী নিগ্রো স্পিরিচুয়্যাল যেমন গোঁড়া ক্যাথলিক সন্ত প্রকৃতির কাছে আজও অপাঙ্‌ক্তেয়, ভাওয়াইয়া-র মতো প্রাণমণ্ডিত গীতিধারাকে রবীন্দ্রনাথও সেদিন তেমনি সন্তর্পণে এড়িয়ে গিয়েছেন। পূব-বাংলার মারফতী-মুর্শিদ্যার উদাস বিবাগী আত্ম-সন্ধিৎসা তাঁকে টেনেছে, লালন ফকির গগন হরকরার সূফী উত্তরীয় স্পর্শ করেছে তাঁর সত্তাশরীর, কিন্তু বীরভূমের বাউলেরা তাঁদের বিচিত্র সম্ভার দিয়েও তাঁকে জয় করতে পারেন নি। তার কারণ নিশ্চয়ই শেষোক্ত ধারায় সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের বহিঃ-শরীরে সংরক্ত উগ্রতার ছোঁয়াচ। তাঁর উদ্দিষ্ট লোকচেতনা ও মরমী চৈতন্যের সরাসরি সেতুটির মাঝখানের স্তম্ভগুলি এখানে দেহাত্মবাদের উপকরণ দিয়ে গড়া বলেই হয়তো কবি এই জীবন্ত গীতিধারাটিকে পরিহার করেছিলেন।

লোকগীতি অনির্দেশ্য লোকসত্তারই (Volksseele) প্রকাশ, গ্রীম ভাইয়েদের এই ভাবনা ঐ গীতিধারার সম্মান কিন্তু বাড়িয়ে দেয় নি। তাঁদের নিরীক্ষণ অবশ্য উত্তরকালে শুধুমাত্র অংশত সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। রূপকল্পের ঐতিহাসিকেরা ঠাহর করতে পেরেছেন, লোকগীতি মূলত কোনো যৌথ সৃষ্টি নয়, একক পদকর্তারই কীর্তি। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ব্যালাড-গুলির ধুয়া সেই অসঙ্গ মনেরই রচনা যে সঙ্গকাতর। সেই ধুয়া বহুব্যবহারে বারংবার যে রূপান্তরিত হয়েছে সেটাও প্রধানত ব্যক্তি-রচয়িতাদের প্রবর্তনায়। তাকে ঘিরে সমগ্র কবিতার যে বুনন ও সঞ্চার, তার অস্তিত্বও ব্যক্তিত্ব স্রষ্টার স্বত্ব, সময়ের সহযোগে যা সমবেত উত্তরাধিকারে পরিণত হয়েছে।

প্রথম যুগে আইরিশ ও স্কচ একাধিক লোকগীতির রবীন্দ্রায়ণে স্বগত সৃজনের তাৎপর্য উপেক্ষিত হয় নি। রূপান্তরণের মুহূর্তে অনেক ক্ষেত্রেই কবি একককে অনেকে পরিণত করেছেন, ব্যক্তিকে সম্মেলকে। হাম্সি লী'র মতো স্পর্শভীরু লোকধর্মী গীতি তাই 'কালী কালী বলো রে আজ' গানটিতে আরো লৌকিক স্পন্দন পেয়েছে। মূলত এই উৎস-গানগুলিও সমবেত, কিন্তু তাদের মর্জি নিতান্তই ব্যক্তিগত। রবীন্দ্রনাথ বরং তাদের 'মত্ততার গান' করে তুলে নিবিড় মৃন্ময় একরকম ব্যাপকতা প্রত্যুপহার দিয়েছেন। ক্রমশই সেই ব্যাপ্তিগুণে, নিরন্তর মুক্তকাধর্ম সত্ত্বেও, ছিদ্রঘন প্রবণতায় আক্রান্ত

হয়েছে, ধূলির ধনকে স্বর্গীয় করার অভৌম পিপাসা বেড়েই গিয়েছে। কিন্তু আইরিশ-স্কচ লোকগীতির কাছ থেকে বিচিত্র আহরণের অভিজ্ঞতা, কয়েকটি গানের পরিসর ছাপিয়েও, কবির সামগ্রিক সৃষ্টিজীবনে কাজ করে চলেছে। এই অভিজ্ঞতার উপহার রবীন্দ্রায়িত লোকসংগীতে বিবর্তমান ধ্রুবপদের (incremental refrain) ব্যবহার। এবং সেজন্য জরুরি ব্যক্তি ও বৃহতের পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রটিও কবি ঐ ঝর্নাতলায় উপলব্ধি করেছিলেন। বিশেষত আইরিশ মেলডিজ 'ফীলিদ্' (কবি) ও 'বার্ড' (কবিয়াল) এই দুই শক্তির সমন্বয়ী দোটানার ফসল। ফীলিদ্ জোগাবেন মূল পাঠ এবং বার্ড তাঁর আখরে আখরে সেটি সঞ্চারিত করে দেবেন, এটিই ছিল—এবং প্রকারান্তরে আজও—কেল্টিক লোককবিতার বিশেষত্ব।

এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছেন পদকর্তা ও পদ-প্রবর্তকের অচ্ছেদ্য আত্মীয়তা। রুথ ফিনেগান দেখিয়েছেন মধ্যযুগের 'ত্রোবাদোর' ও 'জোগ্লার'দের কাজ ছিল যথাক্রমে লোকগীতির রচনা ও অনুষ্ঠান। কয়েকজনের কাজ প্রণয়ন, অন্যান্য ক'জনের দায়িত্ব প্রবর্তনের। কখনো-কখনো এঁদের মধ্যে ভূমিকা-বদলেরও দরকার পড়ত। এঁদের পারস্পরিকতায় তৈরি হয়ে চলত একটি বলয়, অন্তর থেকে বাহিরে যার অভিমুখিতা। রবীন্দ্র-নাথের ঋতুনাট্য থেকে শুরু করে আশ্রমিক বৃক্ষরোপণের ব্রতগীতি পর্যন্ত আমরা স্পষ্টতই এই কৌম পার্বণের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করি। এই গানগুলির বহির্মণ্ডলে বৈদিক আভার আস্তর লেগে থাকলেও তাদের ভিতটি নিতান্তই লৌকিক ও লোকগীতিগন্ধি।

মনে রাখতে হবে, লোকসংগীতের প্রধানতম শর্তই হল অনুষ্ঠেয়তা। এখানেই তার সঙ্গে মননধর্মী ধ্রুপদী ও আধুনিক কবিতার ব্যবধান। তা সত্ত্বেও, ইয়েটস, রবীন্দ্রনাথও ব্রেশটের মতো আধুনিক কবিরা তাঁদের কবিতায় গানে যে অনবরতই লোককবিতার দায়ভাগ অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন, তার কারণ শ্রোতা ও পাঠকের মধ্যে মৈত্রীসাধনের পবিত্র চক্রান্তের তাড়না। এই কবিদের গীতিকবিতার বড়ো অংশেই তাই সেই নাটকীয়তা অনুভব করা যায় যার অন্তস্পটে আছে লোকসংগীতের মজ্জাগত মেজাজ: একাকী-র অনেকের মধ্যে দ্রব হবার আকাঙ্ক্ষা। এরই আঘাতে রবীন্দ্রনাটকে জন্ম নিয়েছে ধনঞ্জয় বৈরাগীর মতো চরিত্র, গেয়ে উঠেছে ভাটিয়ালিমিশ্র সারিগানে প্রাণিত রাঙা আকুতির গান 'গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ' (প্রায়শ্চিত্ত ৫/৪)। বাউল গানকে শীর্ণ অর্থে লোকগীতির বর্ণভুক্ত করা যায় কিনা, এ প্রশ্ন সংগত হলেও তার অন্তরঙ্গে ব্যক্তির আত্ম-অনুষ্ঠেয়তার যে-আয়োজন আছে সেটি যে লোক-সংগীতেরই দ্যোতনাবাহী সে কথা অস্বীকার করা যাবে না। এই শতকের প্রথম দুই দশকের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ ঐ একতারাকে যে বৃহত্তর অর্থেই আনন্দ-লহরীতে পরিণত করেছিলেন, তার গতি পরিণতি আমাদের অজানা নয়।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উদ্দীপনে প্রণীত যে আটটি বাউলগীতির উল্লেখ শান্তিদেব করেছেন, সেগুলি সর্বতোভাবেই দেশের মাটির গান এবং তাদের ধর্মই হল পার্বণময়তা। এর কয়েক বছরের মধ্যেই রচিত 'তোমার খোলা হাওয়া' বা 'ও আমার মন যখন জাগলি না রে' প্রভৃতি বাউলধর্মী গানে এই মুৎস্বভাবেই লেগেছে চিন্ময় শরতের শুভ্রতা, কিন্তু তাদের দুর্জয় অভিনেয়তা তার ফলে এতটুকুও ম্লান হয় নি।

গীতাঞ্জলি-পর্ব থেকেই শুদ্ধতা ও লোকছন্দকে মেলানোর কবি-অভিপ্রায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে। শারদোৎসব থেকে অচলায়তন উজিয়ে রক্তকরবী পর্যন্ত এরই জের চলেছে যেন দর্ভক ও শোণপাংশুদের দ্বৈতাদ্বৈতে। ভক্তি ও কর্মের এই টানাপোড়েনে লোকগীতির ঋদ্ধ রহস্য নতুন আয়তন পেয়েছে। শ্রম যে সংগীতের প্রাণ, কর্মযোগেই যে লোকসংগীতের চাবিকাঠি, সে কথা রবীন্দ্রনাথকে বই পড়ে জানতে হয় নি। জলেস্থলে যাদের প্রাত্যহ পরিশ্রমের ভিত্তিতে মানুষের সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা সেই সব মাঝিমাল্লা ও কৃষাণ-মজুরদের দুর্মর নির্মেদ পেশীর টান এই-সমস্ত গানে আভাসিত হয়ে আছে। তাই যখন অচলায়তনের গান শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ উৎসবে ব্যবহৃত হয়, তার প্রয়োগে মূল নাটকের চেয়েও বেশি নাট্যগুণ সংক্রমিত হয়ে পড়ে। এই ধরনের গানে যে কোনো প্রথানুগত পল্লীগীতির অনুসৃতি নেই, সেটা বোঝা যায় যখন দেখি পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে ব্যাপ্ত ঝুমুরের জলদ তিনমাত্রার ছন্দকে কাজে লাগিয়ে তার সুরের নজরুলি মাদকতা তিনি বর্জন করেছেন। লোকচর্যার আচার্য এল্‌মহার্স্টের প্রিয় 'আমরা চাষ করি আনন্দে' থেকে 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' / 'আয় রে মোরা ফসল কাটি' প্রভৃতি গানে তিনি লোকগীতির স্নায়ব গভীরে প্রবেশ করে সেই অজানা খনি থেকে নতুন মণি সংকলন করে এনেছেন।

প্রচলিত লোকগীতির সঙ্গে রবীন্দ্রপ্রণীত লোকায়ত গানের একটি বড়ো পার্থক্যই এই যে কবি 'আমি'কে 'আমরা'য় প্রকাশ্যত রূপান্তরিত করে দিয়েছেন। সাধারণত দেখা যায় জগতের যাবতীয় শ্রমসংগীতে কায়িক চর্যা অনুল্লেখিত এবং তার বিনিময়ে সেখানে কাব্যিক চিত্রকল্পের অমূর্ত সৌন্দর্যই উচ্চারিত। মেক্সিকোর শস্য-নিড়ানোর এই সময়হীন গানটিতে যেমন

এই দক্ষিণ পথে
এল ছুটে এস মেঘ
কেমন রাঙায় রাঙা
রাঙা ফসলেও বাহার রয়েছে মেঘের মধ্যিখানে
আহা সুন্দর মেঘ
জাদুকর রাঙা ফসল আনতে জানে ॥

এখানে শস্যকাটার ইঙ্গিত কোথাও নেই, এমন-কি দর্শক তাঁর আপ্লুত আমিত্বকেও লুকিয়ে রেখেছেন স্নিগ্ধ সৌজন্যের আড়ালে। আধুনিক ভারতীয় কবি অনুরূপ ভাবাসঙ্গে ঐ একলা-আমিকে নামিয়ে এনেছেন পথে, কর্মরত বহুবচনের জনাকীর্ণতায় তাকে দীক্ষিত করে দিয়েছেন ঃ

রোদ এসেছে সোনার জাদুকর
ও সে সোনার জাদুকর
শ্যামে সোনায় মিলন হল মোদের মাঠের মাঝে,
মোদের ভালোবাসার মাটি-যে তাই সজল এমন সাজে ॥
মোরা নেব তারি দান, তাই যে কাটি ধান
তাই যে গাহি গান—তাই যে সুখে খাটি ॥

এই গানটির মধ্যে লোকগীতির সংজ্ঞা আধারিত রয়েছে। চিহ্নিত শব্দগুলিতে চিহ্নিত হয়ে আছে লোকগীতিকারের অনুভূতি থেকে অনূদিত সম্মেলক উত্তরাধিকার। দেশজ লোকগীতির শিল্পায়নেও তাঁর এই ঝোঁক। 'মন-মাঝি তোর বৈঠা নে রে'>'মন-মাঝি সামাল সামাল'>'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে'—এই তিনের ভেদরেখা অদৃশ্য হলেও অনচ্ছ নয়। নিয়তিনির্জিত মাঝির আত্মগত বিষাদ পরের পাঠভেদে সংযত বৈরাগ্যে ও সর্বশেষ পাঠে নাবিকের গর্জমুখর প্রত্যাঘাতে দৃপ্ত হয়ে উঠেছে।

সব সময় পুরুষ, বচন কিংবা সর্বনামের সীমানায় রবীন্দ্রবাউলের এই বৈতালিক চরিত্রটি সনাক্ত করা যাবে না। বাইরের দিক থেকে দেখলে অনেক ক্ষেত্রে প্রথায়ত 'আমি'-ই তাঁর সায়ন্তন লোকধর্মী সংগীতে উত্তরোত্তর উচ্চারিত হয়েছে। এ কথা তাঁর অন্ত্য অধ্যায়ের লীরিক সম্পর্কে নিশ্চয়ই খাটে। কিন্তু যখনই সে বিষয়ে কবি সচেতন হয়েছেন, বাউলগানের বিভাবনায় আমিত্বের নিরঞ্জনবোধ জেগেছে তাঁর এষণায়। সাতান্ন বছর বয়সে লেখা 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে' এবং সপ্ততি-অতিক্রান্ত 'আমি তারেই জানি তারেই জানি' গান-দুটি আপাততুলনাতেও তার আন্তর নিদর্শন মেলে। প্রথম গানটিতে কবিপ্রকৃতির স্বাভিমান তীব্র হয়ে আছে, পরেরটিতে নিজেকে তৃতীয় পুরুষ বহুবচনে লীন করে দেওয়ার গরজ ঃ 'আপন মনের অন্ধকারে ঢাকল যারা / আমি তাদের মধ্যে আপন-হারা'।

তার মানে এই নয় যে নিজেকে কবি কোথাও বিনাশর্তে লুপ্ত করে দিচ্ছেন। এবং সেটা লোকসংগীতের লক্ষণও নয়। মুখ ফুটে একান্ত নিজের কথা বলবার অধিকার আছে লোকসংগীতকারের। এইভাবে অনিষিদ্ধ মুক্তধারায় কথা বলতে বলতেই কথ্য-কবিতায় প্রায় একই মুহূর্তে, গর্কি'র কাছ থেকে ভাষাবন্ধ ঋণ করে বলতে হয়, 'ব্যক্তিত্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়', স্বাভাবিক নিয়মেই জাগ্রত হয়ে ওঠে অগণ্য ব্যক্তিমানসের মোহনায় নিখিল আকাঙ্ক্ষার পরিমণ্ডল। রবীন্দ্রনাথের লিখিত কথ্য / মৌখিক কবিতার ভিতরেও আমরা

এই উন্মোচনের দুটি উপাদান দেখতে পাই। স্বভাবের আদিম সত্যকে সাহিত্যের পরিণামী সত্যে নিয়ে যাওয়ার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নন্দন-তত্ত্বের প্রধানতম সূত্রটি খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু লোকসাহিত্যে এরা যখন একই সৃষ্টিসময়ে ওতপ্রোত অথবা পাশাপাশি রয়ে যায়, রবীন্দ্রবাউল একটি উপাদানকে ক্রমবিকশিত করে নিয়ে যান দ্যুতিময় দ্বিতীয় পরিণতির পরমতায়। লোকায়ত ধানের ক্ষেতে যে বাণী তিনি প্রত্যক্ষ করেন তাকে মেঘের শ্যামল মায়ায় যুক্ত করেই তাঁর আনন্দ। এই পরিশীলনের প্রক্রিয়ায় মানবউপাদান ক্ষয়ে যায় না কোথাও। আর তাই হয়তো এ অনুমান অবৈধ নয় যে রবীন্দ্র-নাথের প্রণীত ও অনুষ্ঠিত এই-সমস্ত শিল্পগীতি ভবিষ্যতের লোকগীতির প্রবাহে অসংকোচে অন্তর্গত হয়ে যাবে।

সৃষ্টির বদল

'গানের সুরে যেরকম সৃষ্টির বদল করে দেয় এমন কিছুতে নয়', কবির এই উচ্চারণ তাঁর স্বরচিত সৃষ্টির প্রসঙ্গে অংশত সত্য। যেহেতু, তাঁর ক্ষেত্রে এটাও সত্য যে গানের কথায় সৃষ্টির বদল ঘটে যায়। তিনি যদি শুধুমাত্র গীতিকার অথবা সুরকার হতেন তা হলে ঐ মন্তব্যের একটি অংশ-ই স্বয়ম্পূর্ণ সমগ্রতা অর্জন করতে পারত। এবং সেই সূত্রে তাঁর গানের সৃজনসত্তার সামগ্রিক উদ্ঘাটনও হতো আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য কাজ। যদি শুধুমাত্র গীতিকার বা কবির দায়িত্ব পালন করে যেতেন, তা হলেও তিনি আমাদের দায় অনেকটা হাল্কা করে দিতে পারতেন। এই দ্বিতীয়োক্ত পর্যায়ের জগদ্বরেণ্য হাইনে। সমালোচকেরা তাঁর লেখা সাড়ে তিনশো গান (Lieder) স্বাধীন খেয়ালমতো অজস্রভাবে সাজিয়ে নিয়েছেন এবং তার ফলে ক্যালাই-ডোস্কোপের সঞ্চারবৃত্তে হাইনের 'সৃষ্টির বদল' ধরা পড়েছে। এইভাবে ভাবগত বা কালগত যে-কোনো দিক থেকেই নির্ধারণ করা যাক-না কেন বিভিন্নমুখী সন্ধানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে এক অখণ্ড কবিমূর্তি যাকে তার রহস্যময়তা বজায় রেখেও সমস্ত দিক থেকেই নির্ভুলভাবে সনাক্ত করা যায়। রবীন্দ্রনাথের লেখা ও সুর-দেওয়া প্রায় দু হাজার গান, সংখ্যাসংকুলতার সমস্যা বাদ দিলেও, আমাদের কাছে এরকম কোনো সুবিধাজনক কিনারা নিয়ে আসে না।

তার কারণ, পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডের পরিভাষায়, তিনি একজন বাগ্‌গেয়কার। ভাতখণ্ডে অবশ্য অভিধাটিকে 'কম্পোজার'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে দাঁড় করাতে চেয়েছেন। কিন্তু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি 'পদরচনা ও সুররচনা' তথা 'সাহিত্য এবং সংগীতে' বাগ্‌গেয়কারের যে সমন্বিত দক্ষতা দাবি করেছেন সেই ক্ষমতা পশ্চিমের প্রধান কম্পোজারদের কাছ থেকেও আমরা

সচরাচর পাই না। রবীন্দ্রনাথ, সেই অর্থে, অনন্য। বাক্ এবং গেয় দুয়েই তাঁর দেবদত্ত অধিকার। দুই এলাকায় অধিকারের মধ্যে যে মৈত্রীমসৃণ সামঞ্জস্য তৈরি হয় বা তাঁর গানেও সব সময় হয়েছে সেরকম নিরসন সংগত বলে মনে হয় না। শুধু সেখানেই সমস্যার গহনগ্রন্থিটি নেই। আসল কথা, সামঞ্জস্যের প্রক্রিয়াটি এত সংগ্রামী যে গ্রাহকের পক্ষে গানগুলির ক্রমবিন্যাস রচনা করে নেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

তা সত্ত্বেও গ্রন্থগারিক প্রভাতকুমার গীতবিতানের যে কালানুক্রমিক মানচিত্র এঁকে দিয়েছেন, সেটি আমাদের কাছে মহার্ঘ উপহার। এক-একটি গানের জন্মের আনুষঙ্গিক পটভূমি তিনি রেখায়িত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত ভাবক্রম তাঁর তথ্যচিত্রে বর্জিত হয়েছে, কেননা অলংকারশাস্ত্রের দোহাই দিয়ে স্থায়ী এবং সঞ্চারীকে তার কোনো গানেই বিভাজিত করা যায় না, তা সে পূজা-প্রেম-প্রকৃতি-স্বদেশ-আনুষ্ঠানিক যে-কোনো বর্গেই আয়োজিত হোক-না কেন।

ভাব ও কাল ছাড়াও অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নিজেই আরেকটি সূত্র আমাদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। সে হল রূপ। 'প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি গানে / আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে / পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্য নয়, রূপ দেবার জন্যে / তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশই রূপের বাহন'—এই উক্তিটি আপাতদৃষ্টিতে রূপের তাঁর পক্ষপাতিত্ব সূচিত করে। অন্তত অধোরেখ পঙ্ক্তিটিতে তার আভাস আছে। যদি এই মূল্যাংকন মেনে নিই, তা হলে কি আমরা বলব শেষ পর্যায়ের 'এসো গো জ্বেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি' 'মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো', 'আমি কী গান গাব যে' গানগুলিতে হৃদয়ভাবের এতটুকু অনটন ঘটেছে? গীতবিতানে দীক্ষিত এক নগণ্য শ্রোতা হিসেবে আমার মনে হয়, তাঁর অন্ত্যপর্বের গানে অনাহত হৃদয়ভাবের যে প্রাচুর্য তা প্রথম পর্বে নেই। প্রথম দিকের গানে ভাবাবেগ বিড়ম্বিত করেছে ব্যক্তিগত পরিসরকে। 'ব্যথিত হৃদয়ের প্রয়োজনটাই তাই এত বড়ো হয়ে উঠেছে', শান্তিদেব ঘোষের এই অবলোকন যথার্থ। অনেকক্ষেত্রেই ব্যথিত হৃদয়ের এই চাহিদাটিকে তিনি কোনো শ্রোতার কথা মনে রেখে বিভক্ত করেও নিয়েছেন। 'ওই জানালার কাছে বসে আছে' অথবা 'ওগো শোনো কে বাজায়' গানগুলিতে পদকর্তার এই ঝোঁক স্পষ্ট। পরের দিকের গানে সাধারণভাবে ঐ অতিরিক্ত শ্রোতার প্রয়োজন তিনি খারিজ করে দিয়েছেন। তার ফলে সেই গীতিগুচ্ছে 'ব্যক্তিগত' থাকবার আগ্রহ ও প্রবর্তনা অমোঘ। শ্রোতাকে এখানে পাঠকের মতো দূরে সরে সেই অন্তর্জগতের আস্বাদ নিতে হয়। আবার, মধ্যপর্বের কথা মনে রাখলে ভাব ও রূপের এই সুতৃপ্ত হিসেবটিও ঘুলিয়ে যায়। মধ্যন্দিন রচনা 'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে', যাট বছর বয়সে লেখা 'দীপ নিবে গেছে মম'

এবং মৃত্যুর দু বছর আগের 'আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে' গান তিনটির তুলনা করলে দেখা যায় একই সায়ন্তন রাগভিত্তিসত্ত্বেও প্রথম ও শেষ উদাহরণে রূপের সংহতির পাশে উপান্ত্যপর্বে ভাবের গাঢ়তা আরো দুরবগাহ। তলিয়ে দেখলে হয়তো মনে হবে, বিবর্তনের বিচারে রূপের সমস্যা ও এষণা তিন জায়গায় তিনরকম। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তা হলে মুশকিল বাধায় সমালোচনার পূর্বধার্য সংজ্ঞা ও অতিসুদীক্ষিত শ্রোতৃসংস্কার যা নিজেকে বারংবার পরীক্ষা করে নিতে রীতিমতো ভয় পায়।

১৮৯৭ নাগাদ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় রূপের পরিবর্তে আরেকটি প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছিলেন: 'ছন্দ'। তাঁর সংকলনে তিনি এক ধরনের শিল্পগীতির নাম দিয়েছিলেন 'ছন্দপ্রধান গীত'। তাঁর মনে হয়েছিল 'আশার ছলনে ভুলি' এই শ্রেণীর অন্তর্গত গান। তাঁর সামনে তখনো দিগঙ্গন আলো করে ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ। তাই ছন্দপ্রধান গীতের উদাহরণ হাৎড়েছিলেন তিনি রঙ্গলাল পর্যন্ত। প্রসঙ্গত তিনি জানিয়েছেন, 'ছন্দের প্রধান সামগ্রী প্রস্বন, তদ্দ্বারা ছন্দের রূপ ও লয় উভয়ই সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়।' সুরের বহিরঙ্গ সাহচর্য ছাড়াও শব্দের সংগীতস্পন্দই হল প্রস্বন। এই বিচারে, আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রসংগীতের শেষ পর্যায়ে প্রস্বনধর্ম অনেক বেশি উচ্চারিত। এই প্রস্বনধর্ম ফুটিয়ে তুলবার জন্য গীতাঞ্জলির পরবর্তীকালে প্রাক্-পর্যায়ের চেয়েও কবি-সুরকার বেশি সংখ্যক গান লিখেছেন। তাঁর কবিতার মতোই ঐ পর্বে কাটাকুটিও বেশি। তারি মধ্য দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এসেছে রূপের জগৎ কিংবা শব্দস্পন্দের অভিঘাত। প্রথম পর্বের লক্ষ্য ছিল ধ্রুবপদের বা ধুয়ার দিকে। পরের দিকের গানে ধুয়ার ব্যবহার প্রথামতো অনেক জায়গাতেই ঘটেছে, কিন্তু গানের মহিমা তারি আশ্রিত নয়। গানের কোনো একটি লাইনে ধ্বন্যুক্তির সাহায্যে অন্তর্লীন একরকম বাস্তবতা নির্মাণ করাটাই তাৎপর্বিক অভিপ্রায়। তাঁর প্রথম পর্যায়ের মুগ্ধ গ্রাহকদের কাছে সেটি এখনো গৃহীত হয় নি। তাঁর অন্ত্যপর্বের বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অনাগ্রহী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাই 'স্বপ্নে আমার মনে হল/ তুমি ঘা দিলে আমার দ্বারে হায়' গানটিতে 'ঘা' শব্দের ব্যবহার মার্জনা করতে পারেন নি। আমি কিন্তু জানি না, ও জায়গায় এর চেয়ে আর কোন্ শব্দ ইপ্সিত আঘাত তুলতে পারত! কখনো-কখনো প্রকৃতির সত্তাকে আরো সুচারুভাবে স্বননে রূপান্তরিত করার দুয়েকটি পরিচিত উদাহরণ দিচ্ছি:

১. তখন পাতায় পাতায় বিন্দু বিন্দু ঝরে জল

২. ঘন ঘন গুরু গুরু গরজিছে
ঝরো ঝরো নামে দিকে দিগন্তে জলধারা

৩. আজি তরঙ্গকলকল্লোলে দক্ষিণসিন্ধুর ক্রন্দনধ্বনি

৪. উদ্বেল উতরোল
যমুনার কল্লোল
কম্পিত বেণুবনে মলয়ের চুম্বন

৫. সেদিন বাদল দুপুরের ঘণ্টা ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর

শেষ দুটি চুর্ণাংশ প্রতিটি বাঙালির কণ্ঠস্থ দুটি নৃত্যনাট্য থেকে, কবির শেষ দশকের ধ্বনিসৃষ্টির দুটি বিপরীতধর্মী—ললিতা ও কঠোর—নজির। মনে রাখতে হবে, যে-কোনো কারণেই হোক অন্ত্যপর্যায় সম্পর্কে বীতস্নেহ আজকের শ্রোতাদের কাছেও এই উদাহরণগুলি কালমৃগয়া কিম্বা বাল্মীকিপ্রতিভা-র চেয়েও অনেক জীবন্ত। তার কারণ, কবি প্রকৃত বা পরিবেশ বা লোকায়তন থেকে সরাসরি তুলে এনেছেন এই-সব শ্রীবাস্তব স্বরপুঞ্জ ও ধ্বনি, গানের জগতে অনুস্যূত করে দিয়েছেন নতুন শ্রুতি-র অনুতরঙ্গ। একদিকে অটুট স্বগত জগৎ অন্যদিকে পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ-স্থাপনের তাড়নায় অনেক সময় অনেক গানেই আলাপচারিতা বা আলাপ্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মার্গসংগীতের পরিভাষায় বলব এরা অনিবদ্ধ পর্যায়ের গান। প্রাক্-পর্যায়ের প্রবন্ধ/চতুরঙ্গ (স্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগ) নিবদ্ধ রীতির প্রবণতা ঝরে গিয়ে এখানে কীর্ণ হয়ে রয়েছে মুক্তিপ্রিয় মনের তৈরি রূপের জগৎ। সেই জগতে গদ্যও স্বাধিকার নিয়ে অন্তর্গত।

অতএব, কোন্ যুগপর্বকে আমরা নির্বাচন করব এই প্রশ্নটি অবান্তর। বন্ধন ছাড়া মুক্তির কোনো তাৎপর্যই নেই। নান্দনিক মানদণ্ডে যদি ধরা পড়ত এই দুয়ের একটি যুগ সৃষ্টিধর্মে দরিদ্র, তা হলে বরং ওরকম কোনো বাছ-বিচার চলতে পারত। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের স্রষ্টা আমাদের রন্ধ্রসন্ধানী স্বভাবকে সেরকম কোনো সুযোগ দিয়ে যায় নি।

প্রত্যাবর্ত ও বিবর্তন

শব্দপ্রয়োগ : আধুনিকতা

কবিতার শব্দ যেদিন থেকে বহিরঙ্গ সংগীতের আশ্রয় হারালো, সঞ্চারিত হতে পারার দর্পে কোথায় যেন ঘা পড়লো। কেননা সংগীত মানবহৃদয়ের সার্বজনিক ভাষা। সংগীতকে আশ্রয় করলে মানবচেতনার সন্নিহিত এবং প্রত্যন্ত প্রদেশগুলি স্পর্শ করা যায়।* রবীন্দ্রনাথ জানতেন। তাই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কবিতাকে গান এবং গানকে কবিতা করে তুলছিলেন তিনি।

ফলত তাঁর শেষের দিকের কবিতায় আমরা দু'রকম শব্দ ব্যবহার লক্ষ্য করি—গীতিধর্মী এবং প্রত্যহধর্মী। যে সমস্ত শব্দ কোনো অদৃশ্য রাগিণীকে ভর করেছে, সেই গীতিধর্মী এবং যে সব শব্দ প্রতিদিনের বেঁচে-থাকার ক্ষিপ্র আবর্তে ঘুরতে-ঘুরতে ব্যবহৃত হয় সেই প্রত্যহধর্মী—দু' রকমের নমুনা একই সময়ের পরিবেশে রচিত কবিতা থেকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব :

১ যে কথাটি নিশীথ তিমিরে
তারায় তারায় কাঁপে অধীর মির্মিরে —কাকলি. 'মহুয়া'।
২ চোরাই করে এনেছো মোরে তুমি — বিচিত্রা, 'পরিশেষ'।

* সংস্কৃত কবিতার সঙ্গে গানের প্রকাশ্য প্রভেদ মুছে দেবার আগ্রহে তথাকথিত অ-সংস্কৃত কবিরা গীতিগুঞ্জময় মাতৃভাষার শরণ নিয়েছিলেন। আবৃত্তিসাপেক্ষ সংস্কৃত ভাষা তার স্বর্ণযুগে মননের নির্দিষ্ট স্বচ্ছতার দিকে ঝুঁকেছিল। পক্ষান্তরে, অভিমানী উত্তরসূরিদের লক্ষ্য ছিলো অনির্দেশ্য, সর্বায়ত আবেগ-ভাবনার অভিব্যক্তি। উৎকৃষ্ট গদ্যের আনির্দেশিত গুণগুলি ধ্রুপদী সংস্কৃত কবিতায় পরিস্ফুট। অর্থাৎ সংস্কৃত কবিতা উত্তীর্ণ গদ্যের মতোই নিয়মাগ্রহ, সুসমঞ্জস, পরিচ্ছন্ন এবং ভারসাম্যে স্থিত। অপভ্রংশ কবিতা কিন্তু এই গদ্যপ্রতিম কবিতার প্রতিক্রিয়ায় প্রাণবন্ত প্রতিযোগীর সুঠাম ভঙ্গিতে একটি সচেতন কার্যক্রম গ্রহণ করলো। এই কার্যক্রমের প্রধান অঙ্গ হলো সংগীত। গান, নৃত্যযুক্ত গান এবং বাদ্যসংগীতের কাছে সাহায্য নিয়ে বাংলা কবিতা শব্দকল্প ও ছন্দপ্রকল্পনার ক্ষেত্রে যে-উত্তরাধিকার রেখে গেলো, হাজার বছরের বেশি কাজ করে অবশেষে গত শতাব্দীতে অবসন্ন হয়ে 'পাঠ্য কবিতা' ও 'গীত-কবিতা'র মধ্যে পুনর্বার একটি বিচ্ছেদকে ব্যক্ত করে তুলল। আধুনিক কবিতার সংগীত জিজ্ঞাসায় এই প্রেক্ষণী স্মরণযোগ্য।

শেষোক্ত উদাহরণে দুই ধরনের শব্দসমীক্ষা মিশে গিয়েছে। নিতান্ত চলতি এবং অত্যন্ত পুষ্পল শব্দকে অভিন্ন আধারে ধারণ করার এই প্রবণতাকেই রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত মেনে চলেছিলেন বলে গদ্যকবিতা ছেড়ে ঢিলেঢালা মুক্তকবন্ধে তাঁকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছিল।

রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিরা নিঃসন্দেহে আরো এক স্তর বিবর্তিত। এই বিবর্তনের জন্য তাঁরা অবশ্যই মাশুল দিয়েছিলেন। বৃহৎ জনসভা প্রথমে তাঁদের 'দুর্বোধ' বলে যে ঠাউরে নিয়েছিল তার একটি কারণ, আধুনিক কবিরা শব্দকে তার স্বয়ংস্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে তার আপন স্বরূপে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।* তাঁরা প্রমাণ করতে চাইলেন সমার্থক শব্দ বলে কিছু নেই, আছে বোধিদ্রুমে বরদ শব্দকল্প। অথবা এক-একটি শব্দ, আজকের সময়ের বিশ্লিষ্ট মানুষের মতোই, এক-একটি ব্যঞ্জনাসংকুল দ্বীপ। অর্থাৎ একটি কবিতা একটি দ্বীপপুঞ্জ যেখানে এক-একটি শব্দের অনাশ্রয়িতা শেষ অবধি মুছে গিয়ে পরম আশ্রয়ের মতো হয়ে ওঠে।

কিন্তু এক দিনেই শব্দের এই ক্রমমুক্তি ঘটেনি। শব্দকে এ যুগের কবিরা ক্রমশই যতো ইঙ্গিতবঙ্কিম করে তুলেছেন, তার বাচ্যার্থের দিকটি উপেক্ষা করা অসম্ভব হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে যখন প্রতিপাদ্য ভাববস্তুই আধুনিকতা ব'লে গৃহীত হয়েছিল, নজরুল-মোহিতলালের উত্তেজনা আমাদের শ্রবণে এসে পৌঁচেছিল, কোনো অর্থনিরপেক্ষ বাক্প্রপঞ্চ আমরা শুনিনি। এবং দ্বিতীয় পর্বের কবিরা এক বিদ্রোহের বিরুদ্ধে আরেক সুষম বিদ্রোহ যখন ঘোষণা করলেন, তখনো। কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত সম্প্রদায়ের অধিকাংশের লক্ষ্য ছিল, বাচ্যার্থ ও মূর্ছনাকে সমাহৃত করা। তিনজন বক্তব্যধর্মী কবির রচনা থেকে দৃষ্টান্ত :

১ জানি সবই, তবু পরিবর্তনে তোমার
অপূর্ব পেয়েছে ছাড়া, এমনকি নিত্য বিধাতার
জ্যোতির্ময় সিংহাসনখানি
ডুবেছে নাস্তির গর্ভে, সে-কথাও জানি॥ —সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'সর্বনাশ'।

---

* আধুনিক কবির কাছে শব্দের এই স্বনিকেত মহিমা গটফ্রীড বেন-এর 'একটি শব্দ' (Ein Wort) কবিতাটিতে ব্যক্ত হয়েছে :

একটি শব্দ, একটি বাক্যবন্ধ : শূন্যের মধ্য থেকে উঠে আসে
অনুভূত জীবন, আকস্মিক চেতনা,
সূর্য নিশ্চল, স্তব্ধ বৃত্ত,
কেবল সব কিছু এগিয়ে আসছে একটি শব্দের কেন্দ্রে।
একটি শব্দ—আলোর এক ঝলকানি—পাখা মেলা এক উৎক্রান্তি এক আগুন
আগুনের এক ঘোরানো শিখা, ছিটকে-বেরিয়ে-আসা একটি নক্ষত্র,—
এবং অন্ধকার আবার, বিশাল আর দানবিক,
পৃথিবীর আর আমার চারপাশের শূন্য প্রান্তর॥ অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২ আনন্দ অপূর্বলোকে
অর্গল লাগাবে নাকো দ্বারে। —বিষ্ণু দে, 'জন্মাষ্টমী'।

৩ বড়ো প্রীতি করেছিলে এই পল্লীটিকে
মুক্তস্রোতা আজো বয় নদী নিরঞ্জনা—
কী চোখে এদের তুমি দেখেছিলে তাই ভাবি। —অমিয় চক্রবর্তী, 'বোধগয়া'।

তিনটি উদাহরণেই (বিষ্ণু দে-র কোনো-কোনো চমকপ্রদ, স্বতশ্চালিত ভাবপ্রবাহঘেঁষা শব্দলীলা স্মরণে এনেই বলছি) শব্দার্থ এবং শব্দমূর্ছনা তুল্য-মূল্যায়িত হয়েছে। এই কবিরা, বৃহৎ পাঠক-সংসারের সঙ্গে নিজেদের আত্মীয়তা অব্যক্ত রাখেন নি। একই কারণে ইংরেজি ভঙ্গিভণিতির নমনীয় প্রত্যক্ষতা ও সংস্কৃত ভাষার অন্তর্লীন পৌরুষের ঐশ্বর্যকে মেলানোর প্রচেষ্টা যে তাঁদের কার্যসূচীর অন্তর্গত হয়েছিল তার স্বীকৃতি আছে বুদ্ধদেব বসুর সুচিন্তিত মন্তব্যে :

> ইংরেজি যেমন আমাদের পক্ষে বিশ্বচেতনার মান্যপ্রণালী; আমাদের ভাষাজ্ঞানের ভিত্তি তেমনি সংস্কৃত ; এ দুয়ের রাজযোটক ঘটাতে পারলে, তবেই সম্ভব আধুনিক বঙ্গভাষায় নির্বস্তুক ভাবের যথোচিত অভিব্যক্তি। —সমালোচনার পরিভাষা, 'কবিতা', আশ্বিন ১৩৫৫।

সদ্যোদ্ধৃত তিনজন কবিই যে আরো পরবর্তীকালে নির্বস্তুক ভাবকে ধারণ করতে পেরেছেন, তার তিনটি প্রমাণ :

১ কখন ওঠে, পাতাল ভেদ ক'রে
অসম্ভূত অমা :
বায়ুর বেগ সহসা যায় ম'রে,
দ্রাঘিমা দেয় ক্ষমা। —সুধীন্দ্রনাথ, 'নষ্ট নীড়'।

২ শ্রুতির আক্ষেপস্পন্দে
কবিতার ছন্দের মতন। —বিষ্ণু দে, 'জল দাও'।

৩ কানে কানেই ঝরে বাঁশি
সেখানে কেউ নেই।
মধুকোরকে মুকুলরাশি
কমলদল নেই॥ —অমিয় চক্রবর্তী 'দীপ'।

ইতিমধ্যে সমর-সুভাষের খরোষ্ঠী অথবা লোকায়ত সাংবাদিকতার পর্বাঙ্ক শেষ হয়েছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার শব্দনির্বাচনে এসেছে লজ্জাবতী বধূর ছায়াচ্ছন্নতা এবং সর্বতোভদ্র ঋজুতার সমন্বয়। এবং পঞ্চম দশকের কবিদের প্রায় সবাই সেই একই অপরূপ দোটানায় নানাভাবে স্পষ্ট। কিন্তু প্রধানত কার পৌরহিত্যে এর মধ্যে কী-সেই কল্পান্ত ঘটল যার ফলে

'অ্যাবস্ট্রাক্ট' বা নির্বস্তুক শব্দ অধ্যক্ষতা গ্রহণ করলো ?* দুই যুদ্ধের অন্তর্বর্তী-অধিত্যকা এবং সম্ভাব্য অথবা অসম্ভব তৃতীয় আসন্ন যুদ্ধের সানুদেশে শব্দের ঘনশ্যাম অনুষঙ্গের মহাদেশ রচনা করলেন একজন কবি, জীবনানন্দ। তাঁর কৃতিত্ব হয়তো একক নয়, যুগযুক্তিবশত সমবায়ী হয়তো-বা। তবু তিনিই পরিপূর্ণভাবে আধুনিক মানুষের নিঃসঙ্গতার দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন ব'লে শব্দের সমস্যাকে মৌলিকতম প্রেক্ষিতে দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তাঁর সতীর্থেরা আর সবাই যেখানে সামাজিক, তিনি অ-সামাজিক (ব্লেক অথবা হ্যোল্ডারলীনের মতো) হয়ে সমস্ত অস্তিত্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন। একদা ইয়েট্‌স একটি ভীষণ গোপন প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেনঃ 'যারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে তাদেরই কেন সম্মান দেখাবো ? তার নিজের গহ্বরে প্রবেশকালে মানুষ একই রকম দুর্জয় সাহস দেখাতে পারে।' জীবনানন্দও নিজের (অর্থাৎ সর্বমানবের) অস্তিত্বের দারুণ সেই বিবরে প্রবেশ করেছিলেন যেখানে যেতে গার্গীকে বারণ করেছিলেন ভারতবর্ষের মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য। আবার, সেইখান থেকে উত্তর বয়ে নিয়ে এসে তিনি বহিঃস্থ যুদ্ধক্ষেত্রেও বেরিয়ে এসেছিলেন সাতটি তারার তিমির থেকে প্রভাতসংগীতে, মন্বন্তরণাঙ্গনে বৈতালিকের মন্ত্র শুনিয়েছিলেনঃ 'জয় অস্তসূর্য জয় অলখ অরুণোদয়, জয়।' বস্তুত, এই নিষ্ক্রমণ যে সর্বথা সার্থক হয়েছিল সেকথা বলা যাবে না। এটুকু বলা সম্ভব, জীবনানন্দ প্রমাণ করে গিয়েছিলেন আমরা যে-পরিমাণে একা হয়ে উঠি ততখানিই বিশ্বজনীন হয়ে ওঠে আমাদের ভাষা, শব্দের বিবেকও ততোই আত্মদীপ থেকে জ্বলে উঠে লক্ষ দীপের সঙ্গে অকারণে জ্বলতে থাকে।

এই বিরোধাভাসের রুচিরা তাঁর অজস্র উচ্চারণে পরিকীর্ণ। বলাকার 'চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে' থেকে সাতটি তারার তিমিরের 'ইহারা উঠিবে জেগে অফুরন্ত রৌদ্রের তিমিরে' আপাত-বিরোধের গভীরে আরো এগিয়েছে, সন্দেহ নেই। আধুনিক পাঠককে চকিত করে জীবনানন্দ যখন বলে ওঠেন 'তোমার নিশিত নারিমুখে, জান কি অন্তর্যামী !' অথবা 'গিয়েছিলে অনেক দূরে স্থির বিষয়ের দিকে,' সন্দেহ থাকে না পাঠককে তিনি আমন্ত্রণ করেছেন তাঁর আভিপ্রায়িক শব্দভূমিতে যেখানে আমাদের বিভিন্নমুখী উদ্যম, প্রশ্ন ও অভীপ্সাগুলি মিলিত হয়, একাগ্র বিশেষ্যের অনন্যতায় সমগ্র সৃষ্টি

* নির্বস্তুক' বলতে এখানে কোনো চিত্ররেখাশূন্য অনুভূতি অথবা বিবিক্ত অস্পষ্টতা বোঝাচ্ছে না। চিত্র দেশপরিবেশের আধার এবং কবিতা কালচেতনার মাধ্যম—লেসিং রচিত এই প্রাচীর ঘুচে গিয়ে আজ আধুনিক কবিতায় যে-নির্বস্তুবতা উদ্ভূত হয়েছে তা চিত্রার্পিত। ইমেজ বা চিত্রকল্প ন্যূনতম শব্দের অরণিতে যে বহ্নিবলয় জ্বেলে ধরে তার নিহিত যথাযথ, অমোঘ স্পষ্টতা অন্তর্মুখী। এই অর্থে আজকের যথার্থ নির্বস্তুক শব্দ স্পৃষ্ট, মূর্ত।

অন্তর্ভুক্ত হয় : 'এ জীবনে আমি ঢের শালিখ দেখেছি/তবু সেই তিনজন শালিখ কোথায়।' এবং বিশেষণও হয়ে ওঠে অমূর্ত বিশেষ্য : 'অকূল সুপুরিবন স্থির জলে ছায়া ফেলে এক মাইল শান্তিকল্যাণ হয়ে আছে।'

ভাষা এবং শব্দ এক নয়। ভাষার মধ্যে ধ্বনি আছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে। তা নাহলে অর্থহীন বৈদিক স্তোভধ্বনি ঐ মর্যাদা পেত না, ব্রজবুলির মতো আবেগনিয়ন্ত্রিত, ব্যাকরণবিস্মৃত ভাষা পেতাম না আমরা। আধুনিক কবিতায় শব্দই সমগ্র ভাষাকে কোণার্ক কিন্নরীর চিবুকে ক্ষোদিত করে তুলে ধরেছে। অনন্ত শূন্যের দিকে মালার্মে শাদা কাগজ মেলে রেখেছিলেন, ভাষার ভাষা পরম শব্দকে অভ্যর্থনা করে নেবেন বলে। বাংলা কবিতায় এই মুহূর্তের শব্দৈষণা বিশ্লেষণ করলে দেখবো মালার্মের নিরঞ্জন সেই শব্দসন্ধানে এসে মিলেছে জীবনানন্দের শব্দব্যক্তিত্ব। রাগ-রাগিণীর শিরোভূষা সমকালীন কবিতার নেই। কিন্তু শব্দকে সাহায্য করবার উদ্দেশে ছন্দের অক্লান্ত সন্ধান চলেছে। রবীন্দ্রসংগীত এবং অবনীন্দ্রভাষার দ্বৈত মন্ত্রণা এসে কবিতার শব্দকল্পকে ভবিষ্যতে আরো জটিল সুন্দর করবে, আলোক সরকারের এই ভাবিকথন, ইতিমধ্যেই, তাঁর নিজের এবং আরো কয়েকজনের মধ্যে আভাসিত হয়ে উঠছে।

শেক্সপীয়র ও আধুনিক বাংলা কাব্যজিজ্ঞাসা

'বঙ্গীয় যুবক যে সমস্ত রাশি রাশি গ্রন্থ পাঠ করেন, তাহার মধ্যে শেক্সপীয়র সর্বপ্রধান।' ১৮৭৮-এ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই উক্তি করেছিলেন। ১৮০০ খৃস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার অল্পকালের মধ্যেই কেরী এবং তাঁর সতীর্থমণ্ডলী অনুভব করেছিলেন, ঈসপের মতো সদুক্তিতৃপ্ত লেখককেই নয়, শেক্সপীয়রের বক্রোক্তিজীবিত কবিতাকেও বাংলা ভাষায় অঙ্গীকার ক'রে নিতে হবে। তাঁদের সেই অভীপ্সামুহূর্ত থেকে আজ পর্যন্ত শেক্সপীয়র নামক সূর্যকে ঘিরে পৃথিবীর আরো কয়েকটি দেশের মতো বাংলাদেশও বারংবার আবর্তন করেছে। এবং স্বভাবতই বাংলা কাব্যেও সেই পৌনঃপুনিক আহ্নিক-অয়নের পুঞ্জিত অভিঘাত রয়ে গিয়েছে।

আমরা সেই প্রেরণার প্রথম দিন থেকেই শেক্সপীয়রকে ভালোবেসেছি। সেই ভালবাসায় বোধকরি তখনো অনিশ্চিত মোহের চেয়েও গার্হস্থ্য বিবাহময়তা কিছু বেশি পরিমাণে কাজ করেছিল। তাই রোমিও-জুলিয়েট নলিনী-বসন্তের প্রাক্-দাম্পত্য সংস্করণে মেদুর এবং মার্চেন্ট অব ভেনিস ভানুমতী-চিত্তবিলাসের প্রহসনে আসক্ত মসৃণ হতে পেরেছিল। যদি কোনো তুলনাশিকারী জর্মন কবিতায় শেক্সপীয়রের নববর্ষা পাশাপাশি আনতে চান, তাঁর সাদৃশ্যের মৃগয়া অচিরেই হয়তো ভ্রমাত্মক ব'লে প্রতিপন্ন হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্য কোনো সুখদ ভ্রান্তিবিলাসে তিনি অপরূপভাবে আশ্রিত হতেও পারেন। জর্মন কবিরা একদিন পাগলের মতো শেক্সপীয়র তর্জমা শুরু ক'রে দিয়েছিলেন। সেই যুগক্রান্তির ভালোবাসায় বিচক্ষণতার অভাব ছিল, কিন্তু অভিযুক্ত ভুল মূল্যায়নের মুদ্রাদোষের ভিতরে ক্রমশই সৌন্দর্য ধরেছিল এবং এক ধরনের কৌণিক স্বচ্ছতা এসে গিয়েছিল। এখানে মনে রাখা দরকার কোনো সেণ্টসবিউরি বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে এসে শেক্সপীয়রকে

ভুলভাবে ভালোবাসার জন্য আমাদের দায়রা সোপর্দ করেননি, এবং আমাদের মধ্যে কোনো গ্রেগেলও ঐ ভালোবাসায় পরিমিতিবোধ রয়েছে ব'লে আত্মপ্রতীতি অনুভব করেননি। তবু এইসব নঙর্থক অনুষঙ্গ মনে রেখেও বলব : বাংলাদেশের কাব্যসমীক্ষায় শেক্সপীয়রের প্রতিফলন ঘটেনি, প্রতিসরণ ঘ'লে উঠেছে স্বগত-হৃদয়ের শুদ্ধ অথবা শ্যামচ্ছায়াসান্দ্র অনুরূপ কোনো ঘিরে-রাখা জলাধারে।

এ-কথা অবশ্যই মনে করার সংগত কারণ নেই যে একজন পেলব শেক্সপীয়রকেই আমরা প্রবণতা অনুযায়ী বেছে নিয়েছিলাম। নির্বিঘ্ন উদাসীন অথবা বিধাতার মতো প্রতিবিধানপরায়ণ শেক্সপীয়রকেই আমাদের চোখে নিষ্ঠুর অথচ অতিথি নূতন লেগেছিল। কিন্তু সেই আত্মবিস্মৃত নির্মম দেবতাকে ঘরে আনবার মুহূর্তে সৌকুমার্যদোষে তাঁকে মমতার মুকুট পরিয়েছি। শেক্সপীয়র তর্জমার বৃত্তান্ত যদি কেউ রোমন্থন করেন দেখতে পাবেন বাংলা ভাষায় 'ম্যাকবেথ' অনূদিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। কতো যে গৌণ কবি ঐ রক্তিম উচ্চাশায় উচ্ছ্বসিত হয়েছেন তার কোনো সীমাসংখ্যা নেই। গিরিশচন্দ্রের আগে থেকে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন প্রচেষ্টা পর্যন্ত কালক্রমিক একটা সংখ্যালেখ্য অনুসরণ করলে দেখা যাবে অসংখ্য হরলাল রায়, তারকনাথ মুখোপাধ্যায় কিংবা নগেন্দ্রনাথ বসুর শ্রমসাধ্য অথচ শ্রদ্ধেয় ব্যর্থতা ঐ নাটকখানিকে ঘিরে পুঞ্জীভূত হয়েছে।

কিন্তু ভাষার অভাবই কবির প্রধান অভাব। মধুসূদন দত্ত সেই কথা মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন এবং শেক্সপীয়রকে একজন প্রয়োগনিপুণ ভাষাচার্য ব'লে তাঁর কাছ থেকে পাঠ নিতে উৎসুক হয়েছিলেন। তিনি অবশ্য ডক্টর জনসনের এই উপদেশটিকেই স্বর্ণাক্ষরে প্রচার করতে চেয়েছিলেন যে প্রত্যেক দেশের একটি নিজস্ব ভাবায়তন (a certain mode of phraseology) আছে, আর প্রতিদিনের লোকায়তন থেকেই তার শব্দশরীরটিকে আবিষ্কার ক'রে নিতে হবে। জনসন ঐ ব্যবহার্য ভাষাকে লাবণ্যশাণিত করার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং শেক্সপীয়রকে তাঁর ঈপ্সিত ঐ আদর্শ ভাষার উদাহরণ হিসেবে স্মরণ করেছিলেন। মধুসূদন জনসনের বাক্য উদ্ধৃত ক'রে পরক্ষণে বলেছেন : This advice I mean to adopt except where the thoughts rise high of their own accord and clothe themselves with loftier diction and that will be in the more tragic parts of the play— সন্দেহ হয় মধুসূদন এই মন্ত্রচালিত উচ্চারণের আগে একবারো ভাবেননি কার প্রসঙ্গে তিনি নিজেকে আরেকভাবে সাজিয়ে নেওয়ার কথা ভাবছিলেন, কেননা, তাঁর অভীষ্ট স্বতঃস্ফূর্ত অলঙ্কৃত অথবা সমুচ্চকথনের কম্বুকণ্ঠও শেক্সপীয়রের মধ্যেই আছে, তার সন্ধানে অন্যতর স্রষ্টার কাছে যেতে হয় না।

গদ্যশিল্পীরা কিন্তু অবিলম্বে সে-কথা বুঝেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রে প্রথম

পর্যায়ের উপন্যাসে পরিচ্ছেদের শিরোধার্য শেক্সপীয়রীয় উদ্ধৃতিগুলি নিঃসন্দেহে গাঢ় পরিবেশ রচনার প্রয়োজনে উৎকীর্ণ হয়েছিল। তাঁর অন্তিম পর্যায়ের উপন্যাসে নায়িকার ঐশ্বর্যময় সৌন্দর্য আঁকতে গিয়ে তিনি ও-রকম বাইরে থেকে উদ্ধৃতি জ্ঞাপন করেননি, ঈষৎ ভিতরে গিয়ে অ্যাণ্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপাট্রার রাত্রিখচিত সমারোহ সজোরে মুদ্রিত ক'রে দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে গীতসর্বস্ব আপাত-অনভিজ্ঞ স্বভাবী কবিটির বিষয়ে চূড়ান্ত নিশ্চেতন ছিলেন সেই বিহারীলালও অ্যাণ্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপাট্রার চিরপরিচিত রূপবর্ণনার অকপট প্রতিধ্বনি তুলতে পেরেছিলেন :

> আহা এই প্রেম-প্রতিমার রূপ
> বয়সে বিরূপ নাহিক হবে;
> চিরদিন সুর-কুসুম অনুপ
> সমান নূতন ফুটিয়া রবে।

তার বঙ্গসুন্দরীর তৃতীয় সর্গ থেকে এই অংশ উদ্ধৃত করলাম। এই সর্গের গোড়াতেই কবি কালিদাস থেকে উদ্ধৃত করেছেন। কালিদাস এবং শেক্সপীয়রের এই সমাহার চেষ্টা সম্পর্কে দু-একটি অনুমান আরোপ করার সুযোগ নিলে তবেই পর্যালোচনার পরবর্তী পর্যায়ে প্রবেশ করতে পারবো। সুতরাং এই সমন্বয়-প্রবণতার মনস্তত্ত্বটি ঈষৎ বিশ্লেষণ করতে চাই।

মধুসূদন তাঁর তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে কালিদাস এবং কীট্‌সের পংক্তিপ্রবাহ ব্যবহার করেছেন, সে শুধু প্রধানত পরিমণ্ডল রচনার প্রয়োজনে। তাঁর আগ্রহ ছিলো দৃশ্যমূর্তনে। বিহারীলাল দৃশ্যরচনায় অনিপুণ হলেও তাঁর হাতে এক এক সময় প্রত্যক্ষধর্মী ছবি যে আঁকা হয়ে গেছে—'সহসা প্রগাঢ় মেঘ ব্যাপিল অম্বরতলে' প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন উচ্চারণে তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। কিন্তু তাঁর প্রধান আগ্রহ অমূর্তন। তাঁর অমূর্তন কখনো কখনো অনচ্ছ ভাবোচ্ছ্বাসে বিগলিত হয়েছে কিন্তু অধিকাংশ সফলক্ষেত্রে মগ্ন আবেদন রচনা করেছে। যদি বলি সেইসব জায়গা 'ভারতীয়তা' ব'লে কথিত ধ্যানধারণারই অভিক্ষেপ, অনুতায়ন হবে না। সদ্য আগে উদ্ধৃত চার ছত্রে কি সেই মূর্ত-অমূর্তের বৈদ্যুতিক সন্নিবেশ ঘ'টে যায়নি।

শেক্সপীয়রের ভিতরেই এক ধরনের বিবিক্ত চেতনা কাজ করছে, রবীন্দ্রনাথ এভাবেই তাঁকে বুঝেছিলেন। তা না হলে 'রাজা' নাটকের কেন্দ্রগ তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে সি. এফ. এণ্ডরুজকে বলতেন না :

> The human soul has its inner drama which is just the same as anything else that concerns Man and Sudarsana is not more an abstraction than Lady Macbeth, who might be described as an allegory representing the criminal ambition in man's nature.

অবচ্ছিন্ন অন্তর্জীবনের এই রূপকটিই, তাঁর ভাষায় 'বহুশাখান্বিত বৈচিত্র্য' লাভ ক'রে মূর্ত শরীর নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শেক্সপীয়রের ঐ রহস্যময়, দুরবগাহ ব্যক্তিসত্তার উপর জোর দিলেন বা মূর্তকে অমূর্ত এবং অমূর্তকে মূর্ত ক'রে : 'শেক্সপীয়রের লেখার ভিতর থেকে তাঁর একটা বিশেষত্ব খুঁজে বার করা কঠিন এইজন্য যে, সেটা তাঁর অত্যন্ত বৃহৎ বিশেষত্ব। তিনি জীবনের যে মূলতত্ত্বটি আপনার অন্তরের মধ্যে সৃজন করে তুলেছেন তাকে দুটি-চারটি সুসংলগ্ন মতপাশ দিয়ে বদ্ধ করা যায় না। এইজন্যে ভ্রম হয় তাঁর রচনার মধ্যে যেন রচয়িতৃঐক্য নেই।'

শেক্সপীয়রের রচিত চরিত্রে, কিংবা সমগ্রভাবে নাটকে, অন্তর্জীবনের সেই গুহাহিত আত্মগত রূপটিকে আবিষ্কার করার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তিতায় বাংলা কাব্যেও সংক্রমিত হলো। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, উনিশ শতকে শেক্সপীয়র-সমালোচনার ধারা বিশ্লেষণ করলে মুখ্যতম প্রবণতা দেখতে পাই তাঁর নাটকের স্বগতোক্তির উপর মনঃসম্পাত। তাঁর অধিকাংশ নাটকের সমূহ সলিলোকি স্বতন্ত্র মনোযোগে পড়া হতে লাগলো ব'লেই ব্রাউনিঙের নাটকীয় মনোকথন (dramatic monologue) এবং টেনিসনের মনোনাট্য (monodrama) উদ্ভূত হলো। ঐ মনোকথনগুলিতে আসলে বিভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ রূপায়িত হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাটিকাগুলিতে যে পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিকোণের বিন্যাস দেখতে পাই, সে-জন্য ব্রাউনিঙকে অগ্রসূরী বললে শেক্সপীয়রকেও অগ্রগণ্যতা দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' ও 'রানী' বা 'বিসর্জনে'র শেক্সপীয়র সর্বস্বতা থেকে রাজা-ডাকঘর-অচলায়তনের অর্জিত স্বকীয়তায় পৌঁছুতে গিয়ে যে সংযোজক কর্ণকুন্তীসংবাদ-গান্ধারীর আবেদন প্রভৃতি নাটিকাগুচ্ছ পাই সেটিও মূলত শেক্সপীয়রপ্রেরিত সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিতায় দৃষ্টিকোণের বিন্যাসে কি একই অর্থে শেক্সপীয়রীয়তা দৃষ্টিগোচর? এক ও অনেক শেক্সপীয়র, অনেক ও এক রবীন্দ্রনাথ। প্রথমোক্ত কবিতে একটি উৎস অজস্র কৌটিল্যে বিচ্ছুরিত; শেষোক্ত কবিকে বলতে হয়েছে 'একের চরণে রাখিলাম বিচিত্রের নর্মবাঁশি'। রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরী কবিরাও কি বিচিত্র এবং একের মধ্যে নিরন্তর আন্দোলিত হননি?

অমিয় চক্রবর্তীও রবীন্দ্রনাথের মতোই, শেক্সপীয়রের বৃহত্তর অস্মিতার কথা বলেছেন, এবং লক্ষ্য করেছেন, 'য়ুরোপীয় সাহিত্যে বোধহয় শেক্সপীয়রের কোরায়োলনাস নাটকে এই যুগ্মদৃষ্টির পরিচয় সবচেয়ে আশ্চর্য উদ্ভাসিত হয়েছে।' অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় এই যুগ্মদৃষ্টি আরেক দিক থেকে একটা পথ মিলবে, সেটি রবীন্দ্রপ্রণীত। কেউ যদি তাঁর 'সাণ্টা মারিয়া দ্বীপে' সংলাপিকায় অথবা সংলাপধর্মী আরো কোনো কোনো কবিতায় শেক্সপীয়রীয়

সমীক্ষা অপেক্ষা করেন, তাঁর আদ্যোপান্ত ঐকিক নকশার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই সেই ভুল স্পষ্ট হবে।

স্টোয়িক কবি সুধীন্দ্রনাথের পাঠক আপাতসাধর্ম্যের উদাহরণে আরো বিচলিত হবেন। আত্মসচেতনতা এবং আত্মঅনুভাব—শেক্সপীয়রের উপর স্টোয়িক চিন্তার প্রভাবনির্ণয় প্রসঙ্গে এলিয়টের আবিষ্কৃত এ-দুটি সূত্র সুধীন্দ্রনাথে আদ্যন্ত উপস্থিত, কিন্তু শেক্সপীয়রের আত্মতা তাঁর উপাস্য ছিল না। শেক্সপীয়রের সনেট অনুবাদে সুধীন্দ্রনাথ বিস্ময়কর স্থাপত্যরুচি ও চৈত্যগঠন-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু শেক্সপীয়রের সংবৃত হৃদয়ের সাংকেতিকতার বদলে তিনি এক ধরনের (অদ্ব্যর্থ অথচ সংযত) আত্মবিবৃতি দিয়েছিলেন। যে-সনেট ছিল দ্ব্যর্থসঞ্চারী তাকে তিনি নিরঞ্জন বাচ্যার্থে নিয়োজিত করার আগে যে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন তার আভ্যন্তরিক প্রমাণ বিদ্যমান। ক্রন্দসীর 'অকৃতজ্ঞ' কবিতাটির মূল প্রেরণা নিঃসন্দেহে 'No longer mourn for me when I am dead' শীর্ষক সনেটটি। কবিতাটির প্রথম স্তবক :

> আমার মৃত্যুর দিনে কৌতূহলী প্রশ্ন করে যদি—
> সাধিলাম কী সুকৃতি, হব যার প্রসাদে অমর?
> মেনে নিও মুক্ত কণ্ঠে, নেই মোর পাপের অবধি;
> সারা ইতিহাস খুঁজে মিলিবে না হেন স্বার্থপর ॥

১৯৩৩-এর ২৩ জুন এই চৌদ্দ স্তবকের কবিতা রচিত হয়েছিল, ২৩ জানুয়ারি ১৯৩৪-এ তিনি চতুর্দশপদী তর্জমায় সম্ভবত আরো সংহত হলেন :

> আমার মৃত্যুর দিনে যতক্ষণ রোষরুক্ষ স্বরে
> রটাবে বিমর্ষ ঘণ্টা পরিহরি ঘৃণ্য নরলোক
> প্রবিষ্ট হয়েছি আমি ঘৃণ্যতর কীটের কোটরে
> চাও তো আমার জন্য ততক্ষণ কোরো তুমি শোক।

প্রকৃত প্রস্তাবে, চতুর্দশপদীর শেক্সপীয়রকে ভাষান্তরিত করতে গিয়ে তিনি ব্যক্তিহৃদয়ের অনাত্মসিদ্ধি খুঁজেছিলেন। ইয়েটসের র‍্যাঁজার তর্জমা যেমন তাঁর আরো পাঁচটি মৌলিক রচনার পর্যায়ে পড়ে, সুধীন্দ্রের শেক্সপীয়রভাষান্তরও তেমনি তাঁর মৌলসৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত। এবং সুধীন্দ্রনাথের কাছে শেক্সপীয়র যে 'মহাকবিদের মধ্যেও অদ্বিতীয়' তা এই কারণে যে, 'জ্ঞানত টেনিসন-জীবনের প্রভাব কাটিয়েও আইডিলস অফ দি কিং যেভাবে টেনিসনকে ধরিয়ে দেয়, প্রস্পেরো ততখানি বিশ্বাসঘাতকতা করে না।...নৈরাত্ম্য/আর বৈচিত্র্য অন্যোন্য-নির্ভর।' সুধীন্দ্রের রচনায় এই অন্যোন্যনির্ভরতা নেই। তাঁর নির্মিত নৈরাত্মিক কবি-চরিত্রের ঐক্য যতো সুরক্ষিত, বৈচিত্র্য সে-অনুপাতে সক্রিয় নেই। ধ্রুপদী কবি হিসেবে তাঁর এই সীমাসুমিতি সমর্থনযোগ্য এবং সেখানেই শেক্সপীয়র প্রদর্শিত পথে কিছুদূর গিয়েও দুস্তর বর্গের পার্থক্য।

প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব, অজিত দত্ত—এ'রা তিনজনেই, সুধীন্দ্রীয় ধরনে বলতে গেলে, 'incorrigibly romantic'। সেই কারণে এ'দের কাছে শেক্সপীয়রের সনেট নিজস্বের বিন্যাস, অন্তত এই তিনজনের সনেট চর্চা (অথবা সনেট অনুবাদ চর্চা) দেখে সেটা মনে হয়। সনেটের বহিঃশরীরের দাবি সহজভাবে মিটিয়েও একটা থীমের মুক্তক কুণ্ডল অজিত দত্তের কাব্যে খুলে গিয়েছে। কোনো প্রভাব খনন না ক'রেও মোটামুটিভাবে বলা যায়, শেক্সপীয়রীয় অর্ধনারীশ্বর বিভূতি অপেক্ষা নারীত্বের সুষমা সেক্ষেত্রে গোচর। বরং সেদিক থেকে বিষ্ণু দে ঐ যুগ্মতা অথবা ব্যক্তিক-নৈর্ব্যক্তিকতার দিকে আরো এক স্তর অগ্রসর। তাঁর সনেট অনুবাদে শেক্সপীয়র এলিজাবেথীয় বাতাবরণে উপস্থিত, সেই বনেদি প্রত্নগন্ধে আমোদিত। শেক্সপীয়রের নাটকের অনুষঙ্গগুলি তিনিও তাঁর নিজের হৃদয়-বেদনার ছদ্মপ্রচ্ছদ (objective correlative) হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কখনো কখনো এই প্রচ্ছদবিক্ষেপ এত চতুর যে, ধরা মুশকিল হয় তাঁর ক্রেসিডা মূলত কার—চসারের, না, শেক্সপীয়রের। কিন্তু যেখানে তাঁর বেদনা এসে প্রাধান্য নিয়েছে, এই কবি উহ্য ও উচ্চারিত শোকাবেগকে কথিত ঐ যুগ্মতায় গ্রন্থনা করেছেন :

> দেখেছি তাকে পথের মোড়ে, ভিখারী, শুনি, দুর্ভোগ—
> পাগল নাকি! পাগল নয় মোটেই!
> প্রবল বেগে দুহাত নাড়ে ঝড়ে ঝাউয়ের ঝাপটানি,
> কিংবা যেন ঈগল দুটি বৈশাখীতে ছোটে।
>
> ... ...
>
> লিয়র যেন, রাজ্য নেই, দেয়নি শঠে শাঠ্য,
> পাগল নাকি, পাগল নয় মোটেই,
> বিলিয়ে দিল হৃদয়টাই এই কি তার নাট্য—
> রাজ্য তার দুপাশে কারা লোটে!
>
> ... ...
>
> কান্না তার বিদ্যুৎ বা আগুনজ্বালা চিৎকার,
> রাজ্য তার দুপাশে কারা লোটে
> ভিখারী নাচে যেন বা সারা দেশেরই কোন লিয়র,
> কান্না তার দুচোখে বাজ ছোটে॥
>
> ('তিনটি কান্না', ৩, নাম রেখেছি কোমল গান্ধার)

এই রূপান্তরকেই সম্ভবত সুধীন্দ্রনাথ 'নৈরাত্মের উপকরণে' 'স্বকীয়তার সৃষ্টি' অথবা 'ব্যক্তিগত অভাববোধের গোষ্পদে শেক্সপীয়রের বিশ্বমানবিক ছায়া' বলতে চেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, বিষ্ণু দে-র সাম্প্রতিক কাব্যবিহারে যে-বিশ্বমানবিক ছায়া পড়েছে সেটি সম্পূর্ণই অ-শেক্সপীয়রীয়।

বাকি থাকেন অনন্য আরেকজন, জীবনানন্দ। কিন্তু তিনিই বোধ হয় শেক্সপীয়রে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েছেন সবচেয়ে বেশি। উনিশ শতকে যে কৌণিক

মন্ময়তার সূত্রপাত হয়েছিল তারই তীক্ষ্ম, জ্যামিতিক পরিণতি জীবনানন্দ। গত শতকের শিল্পী-সংস্কারকের যে-সহাবস্থান দেখেছি, এই কবিতে তারো পিছুটান থেকে গিয়েছিল। কিন্তু একদিন সংস্কারকের হাত থেকে শিল্পীর মুক্তি ঘটল। তিনি কীট্স-কথিত সেই শেক্সপীয়রে পরিদৃষ্ট Negative Capability-র আশ্রয় নিলেন, সুধীন্দ্রনাথ যার প্রতিশব্দ ক'রে গিয়েছেন 'নঙর্থক ক্ষমতা'। নিকটতর প্রতিশব্দ সম্ভবত, 'স্বতশ্চল সামর্থ্য'। কীট্সের ভাষায়, অনিশ্চিত, রহস্যময়তা, সংশয়ের মধ্যে নিজেকে রাখা, বস্তুতথ্য ও যুক্তির বিরক্তিকর অনুসৃতি থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার সামর্থ্য। শেলির প্রতি কীট্সের বিখ্যাত সেই সস্নেহ ধিকার, মহানুভবতা থেকে শুদ্ধ-প্রত্যাবর্তনের সেই পরামর্শ স্মরণীয়। সন্দেহ নেই, সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় একটি চরিত্রেরই সম্প্রসারণ দৃশ্যমান। সে কারণে কবি-চরিত্রের সেই অযুত পাত্রপাত্রীময়তা সেখানে নেই। তাঁর অর্কেস্ট্রা আসলে একান্তবিহ্বল গীতিবিচিত্রা বা বাদ্য-বৃন্দের ছন্দহিন্দোল। পক্ষান্তরে, জীবনানন্দের জলের মতো একা ঘুরে ঘুরে মেলডিতে কথা বলতে বলতে ক্রমশই দ্বীপময়তা এবং সমুদ্রের বিরোধাভাসে পৌচেছিলেন। পশ্চিমী সঙ্গীতের পরিভাষায় একে হয়তো Theme metamorphosis বলা যায়। Liszt-এর সিম্ফনিধর্মী কবিতায় এই ঐক্যময়তার নব নব ছদ্মবেশ দেখা গিয়েছে।

তুলনা যদি করতেই হয়, তাহলে বলব, কীট্সের দৃষ্টিতেই জীবনানন্দ তিক্তমধুর, সংস্ত্রাতিশায়ী শেক্সপীয়রকে নিরীক্ষণ ও স্বীকরণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দেশ-কালের আপেক্ষিকতাকে, অথবা আধুনিক বাঙালী কবির রবীন্দ্রসাপেক্ষতা তিনি অস্বীকার করেননি। তাই তাঁর মনে হয়েছে, 'ইংরেজ কবিরা যেমন যুগে যুগে ফিরে শেক্সপীয়রের কেন্দ্রিকতার থেকে সঞ্চারিত হয়ে বৃত্ত রচনা করে ব্যাপ্ত হয়ে চলেছে, আমাদের কবিরাও রবীন্দ্রনাথকে পরিক্রমা করে তাই করবে।' কিন্তু প্রায় পরক্ষণেই শেক্সপীয়রের দেশকালোত্তীর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন, কেননা, 'শেক্সপীয়রের পরে অনেক সাহিত্যিকই খুব বিশ্রুতভাবে আলোকপাত করলেও বিশ শতক পর্যন্ত কোনো দ্বিতীয় শেক্সপীয়র এসে দাঁড়াতে পারে নি আমাদের মধ্যে।...পাঁচ-সাতশো—এক হাজার বছর পরে শেক্সপীয়রের অদ্বিতীয় প্রকাশপদ্ধতি বেঁচে থাকলেও দান্তেকে উল্লঙ্ঘন করে তিনি সত্যিই ব্যাপকভাবে অধীত হয়ে আধার ও আধেয়ের একটি অবিনাশ সত্যস্বরূপের অনির্বচনীয়তায় অমর হয়ে থাকবেন—আশা করা যেতে পারে হয়তো। দান্তের চেয়ে শেক্সপীয়র মহাভারতের....আদি দিকপতির মতো গভীরতা ও আকাশের ওপারে আকাশ, পৃথিবীর ভিতরে পৃথিবীকে বেশি হৃদয়ঙ্গম করে আধুনিক কালের প্রয়োজনে বেশি শুদ্ধ, স্বচ্ছ ও সকলের গোচরে এনে নিজের বইগুলোর ভিতর গ্রথিত করে রেখেছেন।'

কথাগুলি নিছক স্তুতিকথন নয় আমরা একজন ইয়েট্‌সমুগ্ধ জীবনানন্দকে জেনেছি। তাঁর সম্পর্কে ঐ অভিধা অস্বীকার করছি না, কেননা, ইয়েট্‌সকে তিনি কখনই এড়িয়ে যেতে পারেননি। দুজনের মধ্যে একটি সারূপ্যসূত্র, দুজনেই কীট্‌সের অনুরক্ত। কিন্তু শেক্সপীয়রকে নিয়ে ইয়েট্‌সের অস্বস্তি এখানে স্মরণযোগ্য। শেক্সপীয়র তাঁর কাছে কিছু সমুজ্জ্বল ভগ্নাংশের সমষ্টিমাত্র। পক্ষান্তরে, জীবনানন্দের কাছে শেক্সপীয়রের উপলব্ধি নিঃসন্দেহে 'অর্ধসত্যের চেয়ে বেশি সত্য'। তাহলে অন্তত এটা ধ'রে নিলে অন্যায় হয় না, জীবন সম্পর্কে ধারণায় জীবনানন্দ শেক্সপীয়রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রভাবনিরূপণ এখানে বড়ো কথা নয়।[১] তাই যদি এ-রকম দেখা যায় জীবন বিষয়ে শেক্সপীয়র প্রদত্ত প্রতিজ্ঞাটি তিনি গ্রহণ ক'রে বাকি অর্ধসত্যটিও সিদ্ধান্তের ভঙ্গিতে জ্ঞাপন করেছিলেন, তাহলে সম্ভাব্য প্রভাব উদ্ঘাটনের দরকার হতে পারে। শেক্সপীয়র যাকে 'degree' বলেছেন, সত্যের সেই বিভিন্ন সঞ্চলমান মাত্রা সম্পর্কে জীবনানন্দ যে কতোদূর অবহিত ছিলেন, তা তাঁর 'সত্য, তবু শেষ সত্য নয়' ইত্যাদি ধ্রুবপদে প্রমাণিত। 'রণরক্ত সফলতা' অথবা 'রক্তিল বিন্যাস' থেকে 'কল্লোলিনী তিলোত্তমার' কাছে স'রে যেতে যেতে যে-সত্য আকার থেকে অমূর্ত, অথবা অমূর্তের আকার হয়ে ওঠে, জীবনানন্দে সেই বস্তুকামী ব্যাসার্ধগুলির অপরূপ উন্মোচন আছে।

ধূসর পাণ্ডুলিপির 'অবসরের গান' জীবনানন্দের স্বোপলব্ধির প্রথম ক্রান্তিলেখ। সত্যেন্দ্র-নজরুলের স্বভাব কবিত্ব প্রিরাফায়েলিক পূর্বসংস্কার এবং ইন্দ্রিয়প্রপঞ্চ রচনার সচেতন আগ্রহ থেকে মুক্ত এই কবিতায় কবির বিভোর স্বাচ্ছন্দ্যগুণ এবং অনায়াস নমনীয়তা বিশেষভাবে চোখে পড়ে। কবিতাটির চিহ্নিত অংশ তিনটি। এই তিনটি অংশে মৃত্যু-পার্বণ-শিল্পের নক্‌শা আছে। এই তিনটি বিষয় ঠিক পর পর বিন্যস্ত নয়, পারস্পরিকতায় ওতপ্রোত। এইটেই জীবনানন্দের সমস্ত কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, পারস্পরিকতায় ওতপ্রোত হতে হতে আংশিক বৃত্তগুলির বৃহত্তর বৃত্তে অনুপ্রবেশ। শেক্সপীয়রের বিভিন্ন নাটক থেকে প্রস্বরসংগ্রহের ঐশ্বর্যে এই বৃত্তাংশগুলি কিভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা সম্ভব।

মৃত্যুচেতনার একটি বর্ণনা ঃ

> আমাদের পাড়াগাঁর সেই সব ভাঁড়—
> যুবরাজ রাজাদের হাড়ে আজ তাহাদের হাড়
> মিশে গেছে অন্ধকারে অনেক মাটির নীচে পৃথিবীর তলে :

১ ইতিহাসের একই মুহূর্তে যখন স্পেনীয় কালডেরণ এবং ইংরেজ কবি শেক্সপীয়র জীবনকে স্বপ্ন ব'লে উচ্চারণ করেন প্রথমোক্তের La Vida es Sueno-র সঙ্গে অন্যজনের Tempest-এর প্রভাব-বিনিময় আবিষ্কারের প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে এ-রকম দেখা যায় চিরদিনই অতীতকে আত্মিক প্রয়োজনে ভবিষ্যতের কবি ঢেলে সাজিয়েছেন।

অনেক মাটির নিচে তাদের কপাল
কোনো এক সম্রাটের সাথে
মিশিয়া রয়েছে আজ অন্ধকার রাতে ;
যোদ্ধা-জয়ী-বিজয়ীর পাঁচ ফুট জমিনের কাছে— পাশাপাশি
জিতিয়া রয়েছে আজ তাদের খুলির অট্টহাসি ।[২]

পাঠকের নিঃসন্দেহে মনে পড়বে হ্যামলেটের পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশে দুই ক্লাউনের কথোপকথনে নিদারুণ জীবনর । এবং করোটি হাতে হ্যামলেটের এই সংলাপ :

Alas ! Poor Yorick ! I knew him, Horatio ; a fellow of infinite just of excellent fancy.

তাছাড়া, হোরেশিওর কাছে সেই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন : 'Dost tnere think Alexander looked of this fashion i'the earth ? এবং হোরেশিওর উত্তর : E'en so.

ভাবানুষঙ্গের আকস্মিকতার চেয়েও যে নিশ্চিততর ব্যঞ্জনা নিয়ে উদ্ধৃতাংশ উপস্থিত, তার কিনারা রিচার্ড দি সেকেণ্ডের তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে মেলে। এখানে সম্রাটের সন্তাপে আরেকটি ইঙ্গিত যুক্ত হয়েছে : 'Our sighs and they shall lodge the summer corn'.

জীবনানন্দে লক্ষ্য করি, মৃত্যুর বিনিময়েই 'হেমন্তের ধান ওঠে ফলে'। রিচার্ড দি সেকেণ্ডের 'Night-owls shriek where mounting larks should sing' জীবনানন্দে 'পুরোনো পেঁচারা সব কোটরের থেকে এসেছে বাহির হয়ে অন্ধকার দেখে' ইত্যাদি অংশে নতুন প্রচ্ছায়া বহন ক'রে এনেছে। জীবনানন্দ মৃত্যুর প্রতিদানে শস্যের জন্মের ritual বা পার্বণকে প্রোজ্জ্বল ক'রে দেখিয়েছেন। প্রসঙ্গত অ্যাজ ইউ লাইক ইট-এর দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশকে তিনি স্পর্শ করেছেন আর্ডেনের অরণ্যে যেখানে 'ভুলে গিয়ে রাজ্য-জয়-সাম্রাজ্যের কথা' 'হাতে হাত ধরে গোল হয়ে ঘুরে-ঘুরে' নাচ আর গান আর 'নরম উৎসবে'র আয়োজন আছে। পাশাপাশি আরো একটি চাক্ষুষ প্রমাণ রাখা যায়। ঐ নাটকেরই চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে হরিণ-শিকার নিয়ে একটি পার্বণানুষ্ঠান রয়েছে, যা আবার জুলিয়াস সিজারের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে মানবপ্রসঙ্গে অনুরণিত হয়েছে। 'অবসরের গানে'র অব্যবহিত পরবর্তী 'ক্যাম্পে' নামক কবিতায় আক্ষর ও আন্তর অর্থে একই কৌমানুষ্ঠান।

২ সমাধিতে এই সহাবস্থান জটিল অথচ অনিবার্য আলেখ্যে পৌঁচেছে অন্তিম পর্বের জীবনধর্মী কবিতায়

না ভেবে মানুষ কাজ ক'রে যায় শুধু
ভয়াবহভাবে অনায়াসে।
কখনো সম্রাট শনি শেয়াল ও ভাঁড়
সে নারীর রাং দেখে হো-হো করে হাসে। ('মহিলা', বেলা অবেলা কালবেলা)

বনলতা সেন-এর 'শিকার' কবিতায় তা জটিলতর সাংকেতিকতায় প্রবেশ করেছে। 'অবসরের গানে' মৃত্যুর মৃত্যুত্বের উপর কোথাও জোর পড়েনি, মৃত্যুকে বৃত্তাকারে উল্লঙ্ঘন করা হয়েছে। এবং উইলসন নাইটের পর্যালোচনার সারার্থ গ্রহণ ক'রে দেখানো সম্ভব, উইন্টার্স টেলের চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃশ্যে এবং কীট্সের 'Tasting of Flora and the country green/ Dance, and Provencal song, and sun-burnt mirth'—এর মিশ্র অভিঘাত এখানে 'কার্তিকের মিঠে রোদে আমাদের মুখ যাবে পুড়ে। ফলন্ত ধানের গন্ধে-রঙে তার—স্বাদে তার ভরে যাবে আমাদের দেহ'।

'অবসরের গানে' মৃত্যু ও পার্বণের ভিতর থেকে শেষ পর্যন্ত শিল্পের কল্পবর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঃ

অলস মাছির শব্দে ভরে থাকে সকালের বিষণ্ন সময়,
পৃথিবীর মায়াবীর নদীর পারের দেশ বলে মনে হয়;
সকল পড়ন্ত রোদ চারিদিকে ছুটি পেয়ে জমিতেছে এইখানে এসে,
গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে,
এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেকদিন জেগে থেকে ঘুমাবার সাধ ভালবেসে।

অনিবার্য ভাবাসঙ্গ টেম্পেস্টের তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য ঃ

The isle is full of noises.
Sounds and sweet airs, that give delight and hurts not,
Sometimes a thousand twangling instruments
Will hum about my ears ; and sometimes voices,
That, if I then had work'd after long sleep,
Will make me sleep again.

শিল্প সত্য এবং অসত্যের সমাহার, জাগরণ ও সুপ্তি, চেতনা এবং ইন্দ্রজালের অন্বিত সম্মোহন। জীবনানন্দ 'অবসরের গানে' এই ধারণা মন্ত্রচ্ছলে জানিয়েছেন। কিন্তু উত্তরকালে এই সিদ্ধান্ত আরো ব্যাপ্ত হয়েছে, বিভিন্ন ও বিষম স্তরের বাস্তবতাকে ধারণ ক'রে 'রাঙা নদী' বা 'উড়ো নদী'র বস্তু-পরাবস্তুকে মিলিয়েছে ঃ

কেন না এখন তারা সেই দেশে যাবে যাকে রাঙা নদী বলে,
সেইখানে হাড়হাভাতে ও হাড় এসে জলে
মুখ দেখে—যতদিন মুখ দেখা চলে। ('লঘু মুহূর্ত', সাতটি তারার তিমির)

ধূসর পাণ্ডুলিপির যে-অপ্রকাশিত কবিতাগুচ্ছ পরে পাওয়া গেছে তার মধ্যে প্রথম দুটি কবিতা ('এই নিদ্রা', 'পাখি') ট্র্যাজিক প্রজ্ঞার শেক্সপীয়রীয় এষণায় মুখর। কবিতাগুলি পরিমার্জনের সুযোগ তিনি পাননি। তা সত্ত্বেও, সেজন্যই হয়তো, কবির উদ্দেশ্য ঐ অশৃঙ্খল বিস্রম্ভালাপের মধ্যে স্পষ্ট। দ্বিতীয় কবিতাটি থেকে ঈষৎ অংশোদ্ধার করছি ঃ

আমার বুকের পরে এই এক পাখি ;
পাখি না ফড়িং কীট ? পাখি না জোনাকি ?

অদৃশ্য কঠিন হাতে আমিও বসেছি পাখি, আমারেও মুষড়ে ফেলিতে
দ্বিধা কেহ করিবে না ; জানি আমি, ভুল ক'রে দেবে নাকো ছেড়ে।

মহাপৃথিবীর 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটির নিম্নোক্ত চিত্রকল্পে ভাবনাটি আরো অগ্রসর ঃ

দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরণ
মরণের সাথে লড়িয়াছে।

এবং বেলা অবেলা কালবেলার 'দেশ কাল-সন্ততি'তে চিত্রকল্পটি পূর্ণতা পেয়েছে ঃ

ছেলেটির হাতে বন্দী প্রজাপতি শিশুসূর্যের মতো হাসে ;
হয়ত তার দিন শেষ হয়ে গেল, একদিন হতই তো, যেন এই সব
বিদ্যুতের মতো মৃদু ক্ষুদ্র প্রাণ জানে তার, যতবার গভীর প্রয়াসে
বাঁধা ছিঁড়ে যেতে চায়—পরিচিত নিরাশায় ততবার হয় সে নীরব।

....

অলজ্য অন্তঃশীল অন্ধকার ঘিরে আছে সব ;
জানে তাহা কীটেরাও পতঙ্গেরা শান্ত শিব পাখির ছানাও
বনহংসীশিশু শূন্যে চোখ মেলে দিয়ে অবাস্তব
স্বস্তি চায় ; হে সৃষ্টির বনহংসী কী অমৃত চাও ?

প্রথম প্রেরণা একমাত্র নির্দেশ্য অনুষঙ্গ কীং লীয়র-এর ঃ

In the last night's storm I such a fellow saw
Which made me think a man a worm···

... ...

As flies to wanton boys, are we to the gods,
They kill us for their sport. (IV, i)

এবং পঞ্চম অঙ্কে কীং লীয়রের সেই আপেক্ষিক মানবনিয়তির শান্ত শিবায়ন ঃ

We two alone will sing like birds i'the cage,
When thou dost ask me blessing, I'll kneel down,
And ask of thee forgiveness ! so we'll live
and pray, and sing, and tell old tales, and laugh
At gilded butterflies (V. iii)

চতুর্দিক থেকে সংরুদ্ধ মনুষ্যনিয়তিকে এখানে যে আজানু উপাসনাসঙ্গীতে পরিণত করা হয়েছে, জীবনানন্দ কঠিনের সেই অনন্য কোমলীকরণকে অস্পৃশ্যত তাঁর উপযুক্ত বিবর্তনে তুলে নিয়েছেন। শেক্সপীয়রে এই রকম ধ্বংসাবশেষ

মেদুরতা অন্যত্র খুব কম ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়। বরং গ্রীক নাটকে Sophrosyne-তে এই ধারণা সর্বব্যাপী, যা জীবনানন্দে কীং লীয়রের প্রদত্ত ইশারা ঘুরে 'দীনতা অন্তিম গুণ, অন্তহীন নক্ষত্রের আলো'য় পরিণতি পেয়েছে।

জীবনানন্দের কবিতার মধ্যপর্যায় থেকে অন্ত্যপর্যায় পর্যন্ত একটি জগৎ রয়েছেঃ মানুষের ভিতরে মানবেতর প্রাণিলোক। এটি শেক্সপীয়র থেকে গৃহীত এবং নবত্বে আক্রান্ত হয়েছে। বিশেষত ট্রয়লাস অ্যাণ্ড ক্রেসিডা, কীং লিয়র এবং টাইমন অফ আথেন্সে লক্ষ্য করি এই ভয়াবহ অধোভুবন।[৩] মানুষ এবং পশুর তুলনা এবং 'The strain of man's bred out into baboon' জীবনানন্দ রূপকের তাৎপর্যে গ্রহণ ক'রে দেখিয়েছেন:

> জীব হয়ে কবে / ভূমিষ্ঠ হয়েছি।
> এই ত জীবন: / সমুদ্রের অন্ধকারে প্রবেশাধিকারে,
> নিপট আঁধার, / ভালো বুঝে পুনরায়
> সাগরের সৎ অন্ধকারে নিক্রমণ।/ সবি আজো প্রতিশ্রুতি, তাই
> দোষ হয়ে সব / হয়ে গেছে গুণ।
> বেবুনের রাত্রি নয় তার হৃদয়ের / রাত্রির বেবুন। ('উন্মেষ', সাতটি তারার তিমির)

জন্তু-জগতের অনপনেয়তা কীং লিয়ারের 'hog in sloth, box in stealth, wolf in greediness, lion in prey' প্রভৃতি উচ্চারণে অসংবৃত এবং শেক্সপীয়র দেখিয়েছেন, জীবাত্মার পুনর্জাতকচক্র (transmigration of souls) আছে ব'লে পশুদের আত্মা একদিন কালক্রমে মানবশরীরে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। জীবনানন্দ স্বরবৃত্তে এই চিন্তার তর্জমা ঘটিয়েছেন:

> বাহক নেই,—দুরন্ত কাল নিজেই রয়েছে
> নিজেরি শব নিজে মানুষ,
> মানবপ্রাণের রহস্যময় গভীর গুহার থেকে
> সিংহ শকুন শেয়াল নেউল সর্পদন্ত ডেকে। ('অনন্দা', শ্রেষ্ঠ কবিতা)

সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে না কঠোপনিষদের একটি অংশকে (২।১৯) এরি মধ্যে একবার ছুঁয়ে গিয়েছেন। সেই নরক, আনন্দ, যেখানে কৃপণতার দোষে অথবা খণ্ডিত দানের অপরাধে পাপীকে যেতে হয়। আর সেই নরক থেকে উত্তীর্ণ হবার পথরেখাও:

> চারিদিকে নীল নরকে প্রবেশ করার চাবি
> অসীম স্বর্গ খুলে দিয়ে লক্ষ কোটি নরক কীটর দাবি
> জাগিয়ে তবু সে-কীট ধ্বংস করায় মত্ত হয়ে
> ইতিহাসের গভীরতর শক্তি ও প্রেম রেখেছে কিছু হয়ত হৃদয়। (ঐ)

৩ দ্রষ্টব্য, ব্র্যাডলির শেক্সপীয়রীয়ান ট্র্যাজেডি, পৃ ২৬৬, ২৬৭।

শেক্সপীয়র দেখিয়েছেন :

It will come

Humanity must perforce prey on itself

Like monsters of the deep.

কিন্তু জীবনানন্দ স্নিগ্ধতর। তিনি বিলয়াত্মক উপসংহারে বিশ্বাস করেন না, রূপান্তরণের মধ্য দিয়ে উত্তরণকে মানেন। তাই,

অনেক গন্ধর্ব, নাগ, কুকুর, কিন্নর, পঙ্গপাল
বহুবিধ জন্তুর কপাল
উন্মোচিত হয়ে বিরুদ্ধে দাঁড়ায়ে থাকে পথে পথান্তরে ;
তবুও ঐ নীলিমাকে প্রিয় অভিভাবিকার মতো মনে হয়,
হাতে তার তুলাদণ্ড,
শান্ত—স্থির,
মুখের প্রতিজ্ঞাপাশে নির্জন নীলাভ বৃত্তি ছাড়া কিছু নেই।
('অভিভাবিকা', সাতটি তারার তিমির)

দুটি জিনিস লক্ষ্য করবার। এক, শেক্সপীয়রের ভাববস্তুকে নিয়ে মানবসত্তার উধর্বায়ন ; দ্বিতীয়ত, 'নীল' রঙের প্রতীক। ঈষৎ আগে উদ্ধৃত 'নীল নরক' এবং এখানে 'নীলাভ বৃত্তি' নীল রঙকে পাপ ও করুণার অসাধারণ দ্বৈতাভাস দিয়েছে। এই প্রতীকের মধ্যে অমূর্ত আকার পরিগ্রহ করেছে। আরো একটি কথা ঘাতকের আত্ম-উত্তরণ। জীবনানন্দের ভাষায়, 'হৃদয় আছে বলেই' ঘাতকের শোচনা। রিচার্ড দি থার্ডের প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যের দুই ঘাতক (অপরাধ এবং অপরাধবোধ) এবং ম্যাকবেথের দ্বিতীয় দৃশ্যে লেডি ম্যাকবেথের উল্লিখিত 'শুভ্র হৃদয়ের অস্বস্তি' জীবনানন্দ তার যুদ্ধোত্তর ও দাঙ্গাদুর্গতিপর্যায়ের কবিতায় বারংবার প্রয়োগ করেছেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে বলা ভালো, উইলসন নাইট কথিত 'Pilgrimage of Hate' এবং রিচার্ড দি সেকেণ্ডের অন্তিম 'Voyage to the holy land' মিলিয়ে দেবার প্রয়াসে যেন শিশু-তীর্থের নতুন ভাষ্য রচনা করেছেন।

শিশু-তীর্থের নতুন ভাষ্যে ব্লেকের ভাষায় Marriage of Heaven and Hell ঘটেছে নিশ্চয়। কথাটা উদাহরণ দিয়ে নিষ্পন্ন করতে চাই। জীবনানন্দ এক পর্যায়ের কবিতায় শিশুর মতো প্রকৃতিময় সহজাত অনাবিল প্রাণদ জীবনী-শক্তি এঁকেছেন :

শ্যামলী, তোমার মুখ সেকালের শক্তির মতন :
যখন জাহাজে চড়ে যুবকের দল
সুদূর নতুন দেশে সোনা আছে বলে
মহিলার প্রতিভায় সে ধাতু উজ্জ্বল—

জানি না সমর্পণের আগে হেলেন প্রসঙ্গে ডক্টর ফস্টাসের 'Was this the face that launched a thousand ships' ইত্যাদি সংলাপ জীবনানন্দের সচেতনতায় ছিল কিনা। কিন্তু একটা কথা ঠিক যে জীবনানন্দ সেই পরিণতি খুঁজছিলেন যেখানে নারীপ্রকৃতি তার স্বাভাবিক প্রকৃতির নিছক প্রসাদগুণকে অতিক্রম করে। বেলা অবেলা কালবেলায় এই মনন-'নিশিত নারী মুখে'র কথা আছে। 'চারিদিকে অন্ধকারে জলের কোলাহলে' যার আহ্বানে সমবেত নাবিকযুবার অর্জিত, পরিণামী মৃত্যু :

তবুও সব রণক্লান্ত নাবিক ফিরে আসে,
তারা যুবা, তারা মৃত, মৃত্যু অনেক পরিশ্রমের ফল

উৎসসূত্রে জাগে পেরিক্লিসের এই ক-টি লাইন :

To show his sorrow he'd correct himself
So puts himself unto the shipman's toil,
With whom each minute threatens life or death (I, iii)

এবং পেরিক্লিসের কন্যাকা যে 'like patience gazing on King's graves and smiling / Extremity out of act', যে মিরান্দার সারল্য থেকে অভিজ্ঞতা ঘুরে মারিনার নারীত্বে জটিল সারল্য পেয়েছে, জীবনানন্দ তাকেই 'আজকের এই অন্ধজগতে' পটভূমির মর্যাদা দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গ আরো একটু প্রসারিত ক'রে দেখি উইন্টারস টেলের পারডিটার চরিত্রণ জীবনানন্দের প্রিয়। ঐ নাটকে 'নিজের মতো ক্ষমতায় প্রকৃতিস্থ প্রকৃতি' (Great creating Nature') 'পবিত্র-অগ্নি-সূর্য' ('the fire-rob'd god, golden Apollo') 'আর সূর্যের বনিতা তপতী' 'নারীসবিতা' ('Perdita') যে বিশ্বময় ব্রতের উদ্‌যাপন করেছে, জীবনানন্দ বেলা অবেলা কালবেলায় তার ফসল ফলিয়েছেন। এবং ঋতুর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক, প্রৌঢ়তার সঙ্গে প্রেম ও প্রকৃতির প্রজ্ঞাময় অভিযোজনসূত্রে Perdita যে বলেছে :

Sir, the year growing ancient,
Not yet on summer's death, nor on the birth
Of trembling winter, the fairest flowers of the season
Are our carnations....
Here's flowers for you :
The marigold, that goes to bed with the sun,
And with him rises weeping ; these are flowers
Of middle summer, and I think they are given
To men of middle age. (IV, iv)

বনলতা সেন-এর 'অঘ্রাণ প্রান্তরে' এবং 'মহাপৃথিবীর জার্নাল : ১৩৪৬' (পরে শ্রেষ্ঠ কবিতাসংকলনে অন্তর্ভুক্ত) কবিতায় তারই অনুসরণে নারীর

'স্পষ্ট নির্লিপ্ত' দেখানো হয়েছে যার পটভূমিকায় 'নিখিলের বৃক্ষ নিজ বিকাশে নীরব' এবং বলা হয়েছে, 'কঠিন এ সামাজিক মেয়েটিকে দ্বিতীয় প্রকৃতি মনে করে', তাকে 'সময়ের মুখপাত্রী' ব'লে প্রৌঢ় প্রেমিকটি প্রস্তুত হয়ে উঠছে। অবহিত পাঠক জানেন, ইয়েট্সের Crossways পর্যায়ের 'The Falling of the leaves' এবং 'Ephemera' কবিতার ক্লান্ত নির্বেদ এবং অনন্তের অভিমুখে অনিশ্চিত প্রস্থানভূমির কথা জীবনানন্দে আছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে অভিযোজনের স্বাভাবিকতার ভিতর দিয়ে স্বর্লোকে উত্তরণের ইঙ্গিত শেক্সপীয়র থেকেই এসেছে তাতে সন্দেহ নেই।

শুধু উত্তরণের উন্মীলিত স্তরপর্যায় নয়, এক অদ্ভুত সময়-চেতনা জীবনানন্দে আছে। তিনি এক ধরণের পথচারী, ভিখারী কিংবা নির্বোধের মুখে আশ্চর্য প্রজ্ঞার কথা বসিয়ে গিয়েছেন। এখানেও শেক্সপীয়র তাঁর প্রদর্শক। প্রসঙ্গ ছুঁয়ে পাঠকের মনে পড়বে সিঞ্জ, ইয়েট্স, রিলকে অথবা ইঙ্গমার বের্গমানে হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে-বসা নির্ধন পথচারীর সার্থক স্পর্ধা, অথবা ভিক্ষুকের নিদারুণ কাণ্ডজ্ঞান। ধুী বেগার্স-এর সঙ্গে আপাতসাযুজ্যে অর্থময় লঘু মুহূর্তের 'আধো আইবুড়ো ভিখারী', সময় নিয়ে যে প্রবল দার্শনিকতা করে তাদের সঙ্গে প্রকৃত সাদৃশ্য অ্যাজ ইউ লাইক ইট-এর সেই motley fool—যার মনে হয়েছে :

'It is ten o'clock

Theus we may see', quoth he 'how the world wags :
'Tis but an hour ago, since it was nine ;
And after one hour more 'twill be eleven ;
And so, from hour to hour, we ripe and ripe,
And then, from hour to hour we rot aud rot.
And thereby hangs a tale.' (II/vii)

এবং কীং লীয়রের সেই নির্বোধ যে বোঝে

Fortune, that arrant whore,
Ne'er turns the key to the poor. (II/vi)

আর তাই জানে সে

Must make content with the fortunes fit
Though the rain it raineth every day

আধো আইবুড়ো ভিখারীরা বোঝে :

ভিখিরীকে একটি পয়সা দিতে ভাসুর ভাদ্র-বৌ সকলে নারাজ।
বলে তারা রাঁমছাগলের মতো রুখু দাড়ি নেড়ে
একবার চোখ মেলে মেয়েটির দিকে
অনুভব করে নিল এইখানে চায়ের আমেজে

নামায়েছে তারা এই শাকচুন্নিকে।
এ মেয়েটি হাঁস ছিল একদিন হয়তো বা, এখন হয়েছে হাঁসহাঁস।
দেখে তারা তুড়ি দিয়ে বার করে করে দিল আরেক গেলাস:
'আমাদের সোনারূপো নেই, তবু আমরা কে কার ক্রীতদাস।'

এবং এরাই 'জীবনকে আরো স্থির, সাধুভাবে ব্যবহার করে নিতে' গিয়ে 'পৃথিবীর ন্যায় অন্যায়' এবং মানুষের মৃত্যুর বিষয়ে গবেষণা ক'রে অতঃপর কালোত্তীর্ণ পরিণতিতে উপনীত হয়েছে। সাতটি তারার তিমিরের 'কবিতা' নামক কবিতাটিতে এই কথাটিকে তিনি মন্ত্রের মতন বাজিয়ে দিচ্ছেন:

বানরী ছাগল নিয়ে যে ভিক্ষুক প্রতারিত রাজপথে ফেরে—
আঁজলায় স্থির শান্ত সলিলের অন্ধকারে—খুঁজে পায় জিজ্ঞাসার মানে।

সুতরাং জীবনানন্দের সময়চেতনা অনন্তের বোধে সমীকৃত। শেক্সপীয়র যেখানে সময়ের চোরাবালির ভিতর নিস্তব্ধ চৌর্যবৃত্তি দেখে বলেছেন:

Ah! yet doth beauty, like a dial-hand.
Steal from his figure, 'and no pace perceiv'd. (Sonnet 104)

জীবনানন্দ, জানি না সেজানের সেই বিখ্যাত ছবির সাদৃশ্যে কিনা, দেখেছেন:

ওই দিকে সৃষ্টি যেন উঁচু স্থির প্রেমের বিষয়
প্রিয়ের হাতের মতো লেগে আছে ঘড়ির সময় ভুলে গিয়ে
আকাশের প্রসারিত হাতের ভিতরে। ('আবহমান', শ্রেষ্ঠ কবিতা)

এবং অনুভব করেছেন:

অনেক মুহূর্ত আমি ক্ষয়
করে ফেলে বুঝেছি সময়
যদিও অনন্ত, তবু প্রেম সে অনন্ত নিয়ে নয়।

তবুও তোমাকে ভালোবেসে
মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এসে
বুঝেছি অকূলে জেগে রয়:
ঘড়ির সময়ে আর মহাকালে যেখানেই রাখি এ-হৃদয়। ('রাত্রিদিন', ঐ)

শেক্সপীয়রকে অবলম্বন ক'রে জীবনানন্দের এই আবিষ্কার, অপ্রেম ও প্রেমকে তুল্যমূল্য দিয়ে 'জয়জয়ন্তীর সেই সূর্য'কে জানা যাকে 'শত শত রূপান্তর ভেঙে' পেতে হয়; এবং উপলব্ধি যে:

অন্ধকার সব চেয়ে সে-শরণ ভালো:
যে-প্রেম জ্ঞানের থেকে পেয়েছে গভীরভাবে আলো।
('যতদিন পৃথিবীতে', বেলা অবেলা কালবেলা)

সন্দেহ নেই, জীবনানন্দ তাঁর পরবর্তী বাংলা কবিতায় সবচেয়ে অপব্যবহৃত প্রতিভা। কোথাও কোথাও চল্লিশ পঞ্চাশের কোনো কোনো কবির শেক্স-পীয়রের সনেট তর্জমায় একরকম কমনীয় একাগ্রতাগুণ দেখা যাচ্ছে, সেটি, আশার কথা। এই সূত্রে মণীন্দ্র রায় অনূদিত 'শেক্সপীয়রের সনেট পঞ্চাশৎ' (১৩৭০) উল্লেখযোগ্য। আবার যদি কোনো তরুণ কবি মেটারলিঙ্কের কণ্ঠে শেক্সপীয়রীয় বস্তুবিশ্বকে তিরস্কার করেন সেটি এই কারণেই আশাপ্রদ যে তা শেক্সপীয়রকে মূল্যায়ন ক'রে নব্য প্রতীক-প্রস্থানের সম্ভাবনায় আভাময়। দীপিত হবার আরো একটি কারণ আছে। জীবনানন্দ যাকে ভবিষ্যকথন ক'রে গিয়েছিলেন 'কবিতায় নাট্য': 'ইতিপূর্বে গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যা দিয়েছেন তার চেয়ে বেশি দেশী ও গ্রীক (কারো হাতে) ও বেশি শেক্সপীয়রীয় (অপরদের হাতে—কিন্তু নতুন, জটিল সময়ের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রী ধারণ করে) বাংলাদেশে খুব শিগগির না হলেও সৃষ্টি হবে একদিন; কেবলই খণ্ড কবিতার সিদ্ধি নিয়ে দূরতর ভবিষ্যৎ তৃপ্ত হয়ে থাকবে বলে মনে হয় না।' সেই দূরতর ভবিষ্যৎ এখনো আসেনি, খণ্ড কবিতার ক্লান্তি থেকে নিষ্ক্রমণের আর্তি এখনো দেখা যায়নি; কিন্তু খণ্ডকবিতায় কৌণিক মন্ময়তার কিছু নকশা এরি মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে যা সংলাপিকার লক্ষণান্বিত। কিছু স্বগত সংলাপিকাও যে পাওয়া যাচ্ছে না এমন নয়। এবং আধুনিক বাংলা কাব্য-ভাবনায় সেই আত্মনাট্যের মুদ্রাটুকুও রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ এবং 'ইংল্যাণ্ডের দিক্‌প্রান্তের কবির' বিমিশ্র উপহার।

সুধীন্দ্রনাথের হাইনে

'বিশ্ব ইতিহাস এমন-কি হাইনের চেয়েও বড়ো কবি', মার্কসকে এই মর্মে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন এঙ্গেলস্। অনেকেরই মনে হয়েছে, মার্কসের প্রিয় এই 'বিপ্লবী' কবি তাঁর রচনায় মার্কসীয় মুদ্রা ও মনন প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন, অনেকেই আবার এরকম ধারণায় আদৌ সায় দেন নি। ভাবুক, বলে উঠেছেন কেউ, ভৌম সময়ের অন্তশীল দুঃখতাপ চিরে চিরে নাকি দেখিয়ে দিয়েছেন। আবার ভল্‌ফ স্টের্ণবের্গের তো ভাবনা-চিন্তার এরকম কোনো ভারাক্রান্ত দায়ভাগই তাঁর ভিতরে দেখতে পাননি। রাজনীতি আর দর্শন বিন্দু-মাত্র বুঝতেন না বলেছেন যাঁরা তাদের সিদ্ধান্ত যুক্তিতর্কে ছিন্ন করতে প্রয়াস পেয়েছেন অন্যশিবিরের সমালোচক দল। 'ধর্মহীন' বলেছেন কেউ; ধার্মিক সৌন্দর্যবাদী বলে উঠেছেন অন্যেরা। ব্যক্তিগত জীবনদেবতায় আশ্রিত বলে নন্দিত করেছেন তাঁকে খৃস্টীয় ভক্তকুল, অন্যদল তাঁকে 'স্বনিকেত' চিহ্নিত করেই তৃপ্ত। স্বাধীনতার সৈনিক হাইনে, স্ত্রী-স্বাধীনতার ঘাতক তিনিই, একই মুহূর্তে একই বিচারকের মুখে এ-জাতীয় রায় পাওয়া গিয়েছে।

আসলে এ ধরনের দ্বিপ্রতীপ সিদ্ধান্ত মহাকবির প্রসঙ্গেই সম্ভব। শুধু এদেশেই নয়, ইয়োরোপেও অনেক সময় একজন মহাকবি কতোখানি 'মহান্', সেই মোকাবিলা চলতে থাকে এখনো। তাঁর রচনাবলি নিংড়ে নিয়ে নির্ণয় করা হয় স্মৃতিধার্য ভাবার্থসমূহ। তিনি কবি কিনা, এ-প্রশ্নও অতর্কিতে তলিয়ে যায় অনবগাহ কোন্ অতলে। তবে হাইনের প্রসঙ্গে বিবদমান বিশারদবর্গের আলোচনায় প্রায়ই প্রত্যাশার বেশি একটি ব্যাপার পেয়ে যাই আমরা: সকলেই নিজেদের মেজাজ ও স্বভাবের সঙ্গে কবিকে প্রত্যক্ষত মিলিয়ে নিচ্ছেন। শুধু তো জ্ঞানীরাই নন, দিগ্বিজয়ী সুরশিল্পীরাও। তাই শুবার্ট বেছে নিয়েছেন তাঁর তীব্র ট্র্যাজিক নাটকীয় কবিতা, তার অঙ্গে-অঙ্গে ভরে

দিয়েছেন অনর্পিত সংরাগ, আর শূন্যমান সনাক্ত করেছেন শান্তসমাহিত সেই কবিকে, ত্রিতাপ ভেঙে-ভেঙে যিনি ঈথার বানাচ্ছেন।

সুধীন্দ্রনাথের স্বভাবে এই দুই সুরকারের প্রকৃতি এসে মিশেছে। হাইনেকে নির্বাচন করবার মুহূর্তে তাঁর কবিচিত্তে এই দোটানা তাঁর নিখাদে ঝংকার দিয়েছিল। অর্কেস্ট্রা-তেই সুধীন্দ্রনাথের ঋদ্ধ ভারসাম্যের একটা আদল দেখতে পাই আমরা, যদিও অদীক্ষিত পাঠকের চোখেও একথা গোপন থাকেনা যে সেই ঋদ্ধিতে—তাঁরি ভাষায় বলতে গেলে—'নিস্তাপ স্মৃতির অন্তর রোমন্থন' তখনো মেলেনি। 'অনুষঙ্গ' (১৪ এপ্রিল ১৯৩০) থেকে 'উদ্‌ভ্রান্তি' (৪ মার্চ ১৯৩১) পর্যন্ত যদি কেউ কোনো ভাবক্রম খুঁজবার চেষ্টা করেন, তাঁকে বারংবার অভিমুখী ও প্রতিমুখী নানা সংশয়ে বিদ্ধ হতে হবে, তিনি সহজেই ধরতে পারবেন যে কবি এখনো এই মমতাহীন গ্রহের পরিচ্ছন্ন নাগরিক হিসেবে তাঁর বর্ম খুব নিপুণভাবে ধারণ করতে পারছেন না। এই সময়েই তিনি হাইনের কবিতা, স্বরচিত কবিতার উৎক্রান্তির প্রয়োজনেই, আশ্রয় করেছেন। এরকম বললে অত্যুক্তি হয়না, সুধীন্দ্রনাথের স্বরায়ণে যে-'আপেক্ষিক গুরুত্বে'র মূর্ছনামীড় শোনা যায়, যে-লঘুগুরু প্রবণতার সাহায্যে উদাসীন পাঠককেও তিনি জয় করে নেন, তার আড়ালে ক্ষণিকার রবীন্দ্রনাথ ও রোমানৎসেরোর হাইনের ভূমিকা অত্যন্ত অব্যর্থ।

'প্রতিধ্বনি'র উৎসসূত্রে পৌঁছে লক্ষ্য করা যায় শেক্সপীয়রের পরেই হাইনের জায়গা। শেক্সপীয়রের তেইশটি সনেট, হাইনের ষোলটি গীতিধর্মী কবিতা, যার মধ্যে সেই কবির একটিও 'ফ্রেস্কো-সনেট' নেই। দ্বিতীয়োক্ত কবিকে কোন ধারাবাহিকতার পারম্পর্যে ফেলে যাচাই করার কোন আগ্রহও তাঁর বঙ্গীয় সতীর্থে ছিলনা। তার কারণ, হাইনের কবিতায় যেখানেই গাহন করছিলেন, সেখানেই একধরনের স্বাভাবিক আত্মীয়তার আরাম পাচ্ছিলেন তিনি। অনেকটাই যেন রবীন্দ্রনাথ-আমিয়েল সম্পর্কের মতো তাঁর মধ্যে একটি যুগ্মতা তৈরি হয়ে চলেছিল। শুধু এসময়েই নয়, এক দশক পরে যখন এই সব 'আদি রচনা'র পরিমার্জনা ঘটিয়েছেন, তখনো—কিংবা বুঝি বলা যায় তখনই—এই সম্পর্কের ভিতরে একটি স্বাভাবিক নাটকীয়তার পরিচয় পাচ্ছি আমরা। তার সেই পর্বের কবিতার পরোক্ষ আস্বাদ নিলে এটাও বোঝা যায়, এই সম্পর্কের বীজাংকুর তাঁর কবিপ্রকৃতির মধ্যেই রয়ে গিয়েছিল, ঐ আত্মীয়তা তাকে 'তৈরি' করে নিতে হয়নি যেন। যাঁকে কোন কোন ঐতিহাসিক 'ঊনবিংশ শতাব্দীর সমানবয়সী' বলে মনে করেছেন সেই কবির সঙ্গে তাই 'বিংশ শতাব্দীর সমানবয়সী' বাঙালি কবির সারূপ্য এক স্বাভাবিক ঘটনা।

'ফলত সাম্প্রতিক বাঙালি লেখকের পক্ষে তর্জমা আর মূল রচনার সমস্যা সমান', সুধীন্দ্রনাথের এই অঙ্গীকার এখানেও অনুবাদের একটা মাপকাঠি হিসাবে ধরতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-র হাইনে যদি হন কান্তকোমল,

তার সূত্র হিসাবে জানতে হবে ঐ দুই কবির রোমাণ্টিক-মিস্টিক মানসিকতা। সুধীন্দ্রনাথের হাইনে যদি হন বিষামৃতময়, সেখানে, শেষ পর্যন্ত, একাধারে বেতালসিদ্ধ ও ট্র্যাজিক সুধীন্দ্রস্বভাবই আমাদের ঔৎসুক্যের বিষয় হতে পারে। সেই সঙ্গে যখন আমরা লক্ষ্য করি, তাঁর অনূদিত অন্যান্য কবিদের তুলনায় হাইনের ক্ষেত্রেই তিনিই সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা নিয়েছেন, আমাদের সেই আগ্রহে নতুন একটি মাত্রা এসে অন্বিত হয়। মার্ক ওয়ার্ডলের প্রবর্তনায় তাঁর ভালেরি-ভাষান্তর অথবা মালার্মে-তর্জমায় শুধু রূপের কাছেই নয়, ভাবগত গঙ্গোত্রীর কাছেও কবির আনুগত্য সীমাহীন। এবং সুধীন্দ্রনাথের অনুবাদতত্ত্বের ঔপপত্তিক ধ্যানধারণার সঙ্গে যাঁদের সামান্য পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন বিশ্বসংস্কৃতির সাধক এই কবি মৌল সংস্কৃতির স্থানিক বা ভৌম বর্ণিমাকে ক্ষুন্ন করতে চান নি। মালার্মে-ভালেরির স্থানান্তরণেও তাই আমরা দুই সংস্কৃতির সন্নিবেশে তেমন কোনো গুরুচণ্ডালী দেখিনা। তাঁদের বেলায় 'ক্রিসমাসের পরিবর্তে জন্মাষ্টমির ব্যবহার' করতে তিনি অনিচ্ছুক। এর কারণ এমনও হতে পারে, তাঁর থিয়োরির ঘনীভবনের মুখেই তিনি ফরাসী প্রতীকী কবিতার দিকে ঝুঁকে পড়েন, তার আগে পর্যন্ত তাঁর প্রধান অভীপ্সা ইংরেজীজর্মন কবিতায় ন্যস্ত। পরবর্তীকালে, সচেতন হয়ে যখনই এই পর্বের অনুবাদের উচ্চাবচতা পর্যালোচনা করেছেন, তাঁকে মানতে হয়েছে, 'ইংরেজী বা জার্মান দশ অক্ষরে আঠারো অক্ষরের বাংলা লাইন ভরানো এত শক্ত লেগেছিল যে কেবল পাদপূরণের গরজে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সাধু রূপ গ্রহণ ও বর্জন, তথা আরও অনেক সুবিধাবাদী প্রকরণ, এড়িয়ে যেতে পারিনি ; এবং তৎসত্ত্বেও যেখানে মাত্রাগণনায় কম পড়েছিল, সেখানে অগত্যা যে-পুনরুক্তি বা বিশেষণ-বাহুল্যের শরণ নিয়েছিলুম, তাতে ওই কবিযুগলের মতিগতি প্রকাশ পায় নি।' (প্রতিধ্বনি, প্রথম সংস্করণ, পৃ ১০)।

শুধু কি ঐ প্রাকরণিক সুযোগ সন্ধান? নাকি নিজের জায়মান কবি-স্বরূপের জমিনু রচনা করার তাগিদে ঐ কবিযুগল এবং হাইনেকে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন তিনি? ভাব ও রূপ উভয়ত এই দীক্ষার্থী কবি সেদিন তাঁর জর্মন সতীর্থের সমীপে অঞ্জলি মেলে দাঁড়িয়েছিলেন। তার অর্থ এই নয়, নিঃশর্ত সমর্পণেই তাঁর উপাংশুব্রত সেদিন ক্ষান্ত হয়েছিল। গুরুদক্ষিণা দ্বিগুণ মাত্রায় প্রত্যর্পণ করবেন বলে তাঁকে অনেক সময় সরে দাঁড়াতে হয়েছিল দায়িত্বময় ব্যবধান মেনে। হাইনের দুর্বলতম কবিতার বই থেকে কবিতা নিয়ে তাকে আক্রান্ত করতে হয়েছিল পুনর্নব অনন্যতায়। গদ্যের অনুবাদক যেখানে মূল রচয়িতার সেবাব্রতী, কবি-অনুবাদক সেখানে মৌল স্রষ্টার প্রতিস্পর্ধী, রুশ সমালোচকের এই অবলোকন এখানে অবান্তর হয়ে যায় না। এই প্রতিস্পর্ধা কতোদূর শিল্পায়িত সার্থকতা পেয়েছে, সে-বিধান যেমন, তাঁর ব্যক্তিত্ব কীভাবে বলয়িত হয়ে উঠেছে, সেটিও তাই তেমনি, প্রাসঙ্গিক।

'প্রতিধ্বনি' থেকে আমাদের প্রিয় তিন-চারটি কবিতার অন্তঃসাক্ষ্যে সেই সন্ধান সূচিত হতে পারে।

যে কবিতা দিয়ে তাঁর হাইনে-পর্যায় শুরু হয়েছে, সেটির কোনো তর্জমা-তারিখ অনুবাদক আমাদের জানান নি। হাইনের 'ঘরে ফেরার বাঁক' (Die Heimkehr)-পর্যায়ের সপ্তম এই কবিতাটির সাত স্তবক 'গোধূলি' নামে আজ আমাদের কবিতার ইতিহাসে একটি আভাবিভূতি বিস্তার করে আছে। স্তবক ধরে-ধরে, সুধীন্দ্রনাথের অপ্রতিম ভাষ্যের পাশাপাশি পাংশু পেঙ্গুইন গদ্যে তার ভাষান্তর সমান্তর সাজানো যেতে পারে:

১ মাঝি-মাল্লার বৈকালী সভা:
আকাশ, বাতাস গোধূলি মাখে:
তার পাশে ব'সে, বাহিরে তাকাই,
যেখানে সিন্ধু অসীম ডাকে

২ জ্বলে একে একে দিশারী প্রদীপ,
আলোকমঞ্চ অভয়ে ভাসে;
দূর দিগন্তে বিবাগী জাহাজ
এখনও দৃষ্টিগোচরে আসে॥

৩ আলোচনা হয় নাবিক জীবন:
তুফানে কি ক'রে নৌকা ডোবে,
শূন্যে ও জলে ঘেরা কাণ্ডারী,
দ্বিধাটলমল খুশিতে ক্ষোভে,

৪ অভাবনীয়ের লীলানিকেতন
অবাচী, উদাচী, প্রতীচী, প্রাচী:
আচারে, বিচারে বিপরীত মতি,
মানবসমাজ সব্যসাচী॥

৫ স্রোতে প্রতিভাত লক্ষ মাণিক
মত্ত মলয় বকুল বনে,
গঙ্গার তীরে সৌম্য পুরুষ
সমাধিমগ্ন পদ্মাসনে॥

৬ ল্যাপ্‌দেশীয়েরা বামনের জাতি,
নোংরা, হাঁ বড়, চ্যাপ্টা মাথা,
আগুন পোহায়, মাছ সেঁকে খায়,
কথা কয় না তো, ঘোরায় জাঁতা।

১ আমরা বসেছিলাম ধীবরের কুটিরের পাশে,/
আর তাকিয়েছিলাম সমুদ্রের দিকে,/
সান্ধ্য কুয়াশাপুঞ্জ এসেছিল,/
উঠেছিল ঊর্ধ্বমুখে

২ বাতিঘরে আলোগুলি/
ক্রমশ দীপিত হতে থাকল,/
আর দুরাতিদূরত্বে/
ব্যক্ত হয়ে উঠল আরো একটি জাহাজ।

৩ আমরা বলাবলি করছিলাম ঝড় আর জাহাজ ডুবির,
নাবিকের কথা, আর কী করে সে বাঁচে/
আর আকাশ ও জলের মাঝখানে,/
আর ভয় ও খুশিতে স্পন্দমান।

৪ আমরা বলাবলি করছিলাম দুরান্ত সৈকতাবলির,/
দক্ষিণের আর উত্তরের,/
আর অদ্ভুত অধিবাসীদের
আর তাদের অদ্ভুত যতো রীতিনীতি নিয়ে/

৫ গঙ্গার কূলে সুগন্ধিময়, ভাস্বর,/
আর দৈত্যের মতো গাছগুলি বিকচ/
আর সুন্দর, সমাহিত মানুষেরা/
নতজানু হয় পদ্মফুলের কাছে।/

৬ ল্যাপ্‌ল্যাণ্ডে থাকে নোংরা লোকেরা,/
মাথা মোটা, থ্যাব্‌ড়া-মুখো ক্ষুদ্রাকার;
আগুন ঘিরে উবু বসে থাকে, সেঁকে নেয়/
মাছ, আর কিচির মিচির করে, আর চেঁচামেচি জুড়ে দেয়।

৭ যে যা বলে, সে তা কান পেতে শোনে
তার পরে মুখ খোলে না আর ;
দেখা যায় না সে বিবাগী জাহাজ,
বাহিরে গভীর অন্ধকার।

৭ মেয়েরা শুনছিল একাগ্র গভীর, /
শেষে আর কেউ আর কিছুই বলল না ; /
জাহাজটা আর রইল না দৃষ্টিগোচর, /
অন্ধকার ঘনালো খুব বেশি।

শুধু যতিচিহ্ন প্রয়োগে নয়, স্তবকের অন্তর্লীন প্রবহমানতাকে সুধীন্দ্রনাথ যতোদূর সাধ্য পংক্তিসংবৃত করার ফলে অনুবাদে একধরনের বিদগ্ধ সংহতিগুণ এসেছে, সন্দেহ নেই। অনুবাদক যে ইতিমধ্যেই 'হাইনেনামাঙ্কিত স্তবকে'র (Heinestrophe) মন্ত্রগুপ্তি আয়ত্ত করে তাকে বাংলা ভাষায় সুদে আসলে খাটিয়ে নিতে পারবেন, সে বিষয়েও সংশয় করা চলে না। শেষ স্তবকের মায়াবী বহুবচন সে—সর্বনামের একবচনে সংকুচিত হয়ে হয়তো একটি বিশেষিত ধৃতিমহিমা এনেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা থাকে, এই 'সে' কে ? কোথায় যেন 'সোনার তরী'র অনুশ্রুতি আমাদের একবার অনিশ্চিতভাবে ছুঁয়ে যায়। আমরা সুধীন্দ্রীয় মন্ত্রের মায়ায় চোখ বুজে আত্মসমর্পণ করতে গিয়েও ভাবি, এর বৃহদংশই হয়তো রাবীন্দ্রিক। না কি ভারতীয় ? হাইনে যেমন হের্ডের-গ্যোয়েটে-হোল্ডারলীনের পথেই কল্পিত ভারতবর্ষের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে গিয়ে কালিদাসের দুয়েকটি চিত্রকণা লোভীর মতো কাজে লাগিয়েছিলেন, সুধীন্দ্রনাথ যেন এখানে হাইনের হাত ঘুরে একটি আশ্চর্য অলীক ভারতীয়তাকেই অর্জন করতে চেয়েছেন। মালার্মের কাছ থেকে বৌদ্ধ নির্বেদ ও প্রতীত্যসমুৎপন্ন শূন্যবাদ অঙ্গীকার করছেন তিনি, সে অনেক পরের ঘটনা। এই পর্বে তিনি তাঁর নিজস্ব অন্তর্জ্বালা বিসর্জন না দিয়েই মনে প্রাণে ভারতীয় হতে চেষ্টা করছিলেন, সেকথা বললে কি অন্যায় হবে ?

আর তাই অব্যবহিত পরবর্তী 'তত্ত্বকথা' (Doktrin) কবিতার প্রথম স্তবকে 'Das ist der Bucher tiefster sinn' বেদ-বেদান্তে নেই কিছু তার বাড়া' এবং শেষ স্তবকে 'Das ist die Hegelsche Philosophie' 'যা বলেছেন শঙ্করাচার্য'-তে পরিণত হয়েছে। 'অধঃপাত' (Entartung) নির্বাচনের মূলেও কাজ করেছে স্বভাব ও ধর্মের মধ্যে একটি সমন্বয়ের সাধনা ঃ

অনাচারে ডোবে নিসর্গসুন্দরী—
মানবধর্মে নিয়েছে কি সেও দীক্ষা ?

যদি কারো উৎসের

Hat die Natur auch Verschlechtert ;
Und nimmt die Menschenfehler an ?

প্রারম্ভিক এই শ্লোকাংশ এখানে মনে আসে, তাঁকে মানতেই হবে প্রতীপসম্মিতি বা ambivalence-এর কবি সুধীন্দ্রনাথ ঈষৎ প্রশ্রয় আর কর্ষিত ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে প্রকৃতিতে অদ্বৈতবাদীর দৃষ্টিতে প্রাতিভাসিক সুন্দর বিভ্রম আরোপ করেছেন। আর মূলে উল্লিখিত 'মানুষের ভুল বা রিপুকে' মানবধর্মে

রূপান্তরিত করেছেন, যদিও রবীন্দ্রপ্রদর্শিত মানুষের ধর্মের সঙ্গে তার কোনোই যোগ নেই। পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে আপাতত জানবার উপায় নেই দশমীর প্রাক্-পর্বেই আলবালের মুহূর্তে এই ভাবান্তরগুলি সুধীন্দ্রনাথ অনুবাদের শরীরে সাধিত করেছিলেন কিনা। শুধু একটি অনুমান এখানে দ্বিধান্বিত নিশ্চয়তা নিয়ে উচ্চারণ করা যেতে পারে। অরুণকুমার সরকার বলেছেন, 'দশমীর যুগেই কবি তাঁর সব খেলাধুলো সাঙ্গ করে রবীন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথের কুলায়ে ফিরছিলেন। মনে হয়, কালপুরুষের সেই ফেরার টান শুরু হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই, শুরুর মধ্যেই ছিল শেষের রুদ্রাক্ষরক্তিম অভিমান। তাই বেদান্তের প্রস্থান ভূমিকা থেকে প্লেটোর প্রাক্‌রূপলোক অতিক্রম করে বৌদ্ধ বিহারে কিছুদিন বাস করে পুনর্বার বৈদান্তিক জীবন্মুক্তির অসাধ্য বাসনা তিনি শিরায়-শিরায় অনুভব করেছিলেন বলে মনে হয় (সই নষ্ট পর্বে, আশ্চর্য, তুলসীদাসের দিকেও, একই কারণে, মুগ্ধ বিষণ্ন চোখ পড়েছে তাঁর)। অনূদিত হাইনের আরো দুয়েকটি জায়গায় ভারতীয়তা আরোপণ কখনো কখনো জ্যোতিরিন্দ্রের 'হঠাৎ নবাব' অনুবাদের দেশজ মাধ্যাকর্ষদোষ মনে পড়ায়। সীতা (Lucretia), শকুন্তলা, কালিদাসের (die Heniade Voltaires), কাদম্বরী (Klopstocks Messiade), কৃষ্ণ (der Sohn den Thetis), তানসেন (Alexander Dumas) প্রভৃতি নামাবলিতেই নয়, তাদের যাবতীয় অনুষঙ্গকে মাটিসুদ্ধ উপড়ে এনে কর্কটক্রান্তির গৌর-শ্যামল অঙ্গনে রোপণ করার দৃষ্টান্ত রসাভাস নিয়ে আসে।

'মহাকাব্য' (Das Hohelied) এই ধারার শ্রেষ্ঠ কবিতা। কিন্তু ভারতীয় ভাবানুষঙ্গ জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার ফলে তার নন্দনমূল্য বাড়েনি। 'বিশ্বমহাভারতের অন্তর্গত গীতা' (ins grosse Stammbuch der Natur) থেকে 'মহাকাব্য সরস সার্থক' (Das Hohelied der Lieder)—এই বীক্ষণে বাঁক নেওয়ার মুখেই পাঠকের কাছে ধরা পড়ে অমরু-বিহ্লন গোবর্ধন আচার্যের ঘরানার রাজসভাশ্রিত শৃঙ্গারাশ্রিত কবিতার আবহকেই এখানে ছেঁকে নিচ্ছেন তিনি। আর তাই মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্যের দুই দ্বিধাবিভাজিত জগতের মধ্যে যে-অবিশ্বাস্য দূরত্ব আমাদের সংস্কারে প্রোথিত, তাকে অতিক্রম করতে অনেকখানি সময় লেগে যায়। শেষ পর্যন্ত আমাদের মনে জেগে থাকে, অত্যাশ্চর্য প্রয়াসের বিয়োগফলের মতো ব্যবহৃত অন্ত্যমিলের কারুকলার সপ্রশংস স্মৃতি!

স্তবকের সঙ্গে অন্ত্যমিলের নিগূঢ় সম্বন্ধের সমাচার জানতেন হাইনে, সুধীন্দ্রনাথ। দুজনেই ব্যাপক পরিমাণে প্রাস্তপ্রাস ব্যবহার করেছেন, স্বয়ংসম্পূর্ণ স্তবকের গাঁথুনি অটুট রাখবার জন্যে। এঁদের দুজনেরই কবিতায় অপ্রত্যাশিত অন্ত্যমিল এসেছে আরো একটি কারণে। স্তবকের স্থাপত্য অক্ষুণ্ন রেখে, তারি মধ্যে—রঁজার ও বীরবল যেমন তাঁদের সনেট-অবরোহের বিবিক্ত

প্রথম দ্বিপদী-অংশে—জীবন সম্পর্কে তীক্ষ্ম অনুজ্ঞ নানা নিরীক্ষণ এঁরা নিপুণভাবে অনুস্যূত করে নিয়েছেন। এই ঈক্ষণ প্রধানত: স্যাটায়ারশাণিত এবং ভাবানুগ অন্ত্যমিলগুলি ক্ষিপ্রতায় এতই সপ্রতিভ যে মাঝে-মাঝেই মনে হতে থাকে এই বুঝি স্তবকের আরামে রাখা নিরাপত্তামূলক তাদের ঘরখানি ভেঙে পড়ল। আমাদের অভ্যস্ত সংস্কার ভেঙে গিয়ে এমনকি কবিতার অন্তঃশরীরেও ফাটল ধরিয়ে দেয় এই সব আচমকা প্রান্তমিল। এই কি ছিল সুধীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত? এটা যে অন্তত অবচেতন অভিপ্রায় ছিল, বিবেকী পাঠকের তাই মনে হতে থাকে। এই অনুমিতি এক এক সময় এতটাই প্রবল হয়ে ওঠে যে বলতে ইচ্ছা করে, দশমী-র পরে যদি সুধীন্দ্রনাথ আরো কিছুকাল ধরে কবিতাটা করতেন, তাঁকে অনিবার্যত মেনে নিতে হত একরকমের ঢিলেঢালা চাল। প্রায় গদ্যকবিতার কাছাকাছি, যার প্রতি তিনি আজন্ম বিরূপাক্ষ ছিলেন। দশমীতে তাঁর কবিতায় আলংকারিক পরম্পরা (Poetic convention) এমন একটি সিদ্ধির শেষাদ্রিচূড়ায় পৌঁচেছে যেখানে অতঃপর দুটিমাত্রই পথ কবির সামনে খোলা থাকে: সংহারময় আত্মপ্রত্যাহার, অথবা অর্জিত সার্থকতাকে অল্পস্বল্প এলিয়ে দিয়ে সমতলপ্রয়াণ। দ্বিতীয় পথটি যে গোপনে তাঁকে টানছিল তার প্রমাণ তাঁর জীবনের শেষ কাজ আপাতবিন্যস্ত হোল্‌টহুজেন অনুবাদের নির্ভার জল্পনার মুক্তধারায়, যা অনুভূতির শ্রুতিলিখন ধর্মে কোথায় যেন আমাদের 'শেষ লেখা'র উদাসীন ধ্রুবতায় তছনছ করে দিয়ে যায়।

অন্ত্যমিল আর প্রবহমানতার মধ্যে একটি সহজ সেতু রচনার কথা যে অনুবাদক ভেবেছেন তার প্রমাণ 'অবিশ্বাসী' (Der Unglaubige) কবিতায়। প্রত্যেক স্তবকে চারলাইন এবং তার চারটি স্তবকে সম্পূর্ণ এই কবিতায় হাইনে যে প্রাকৃত কৌটিল্যের দক্ষতা দেখিয়েছেন, সুধীন্দ্রনাথের প্রতিমানেও তার নিদর্শন। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ মূলের চার লাইনকে ভেঙে সবসময়ই পাঁচ লাইনে পরিণত করেছেন এবং প্রথম তিনটি স্তবকের শেষে হাইনের আত্মপ্রতীতিসূচক পূর্ণচ্ছেদের জায়গায় প্রশ্নচিহ্ন স্থাপন করেছেন:

সুধীন্দ্রীয় তর্জমায় প্রথম স্তবক	হাইনে থেকে সরাসরি
পাব আমি আজ তোমাকে আলিঙ্গনে!	তুমি আজ আমার বাহুবন্ধে শয়িত
সুখের উৎস, অবরোধ টুটে,	হবে! / উত্তাল আনন্দে বাধাবন্ধ /
বারে বারে তাই বুকে নেচে উঠে,	কাঁপিয়ে লয় আর ধিকিধিকি
তাই বিমোহন স্বপনের রং ধরেছে মনে।	জ্বালায় আমার সমগ্র হৃদয়। এই মোহিনী
সত্য পাব কি তোমাকে আলিঙ্গনে?	ভাবনার আবেশে। /

মাত্রাবৃত্তের পংক্তিভিত্তিক মসৃণতা বাঁচিয়ে রেখেও যে পরিবেশে 'আঁজাবুসা'র ফল্গুস্রোত উশকে দেওয়া সম্ভব, এ তারি অব্যর্থ উদাহরণ।

'স্মৃতিবিষ' (An Jenny) কবিতায় সেটিই মূলাতিগ স্বাচ্ছন্দ্যের দরুন, আত্মসচেতন আলাপচারিতার ঘরোয়া-জড়োয়া বিরোধাভাসে।

'প্রতিধ্বনি'তে হাইনে মাত্রাবৃত্তে ৯, অক্ষরবৃত্তে ৪, স্বরবৃত্তে ২, আর স্বরমাত্তিকে ১ ('প্রায়শ্চিত্ত')—এই পরিসংখ্যার মধ্যে দ্বিতীয় বর্গে শব্দ-ব্যবহারের অমিতব্যয়িতাসত্ত্বেও সুধীন্দ্রনাথের অমিত শক্তি প্রকাশ পেয়েছে। এদের মধ্যে 'আত্মপরিচয়' (Enfant perdu) সেই কবিতা যার মধ্য থেকে পঞ্চম-ষষ্ঠ দশকের বেশ কয়েকটি শক্তিশালী কবিতার নিষ্ক্রমণ সম্ভব হয়েছে। কবিতাটি হাইনের জীবনকে যেমন, সুধীন্দ্রনাথের অনতিগোচর ব্যক্তিপুরাণকে তেমনিই, মিতালেখ্যে ধরে রেখেছে। বিশেষণ বাহুল্য, অব্যয়ের অপব্যয়ে হাইনেকে তিনি এখানেও বিকেন্দ্রিত করেছেন। সর্বশেষ চরণগুলিতে তার বিশদ অভিব্যক্তি ঃ

সুধীন্দ্রীয় তর্জমা	হাইনে থেকে সরাসরি
অনাথ দুরান্ত দুর্গ, রক্তগঙ্গা আহত প্রহরী,	একটি ঘাঁটি শূন্য—আমার সমস্ত ক্ষতগুলি
বন্ধুরা নিহত, কিংবা অগ্রগামী 'নচেৎ বিমুখ,	উন্মুক্ত—/ একজন পড়ে যায় অন্যেরা
মরণেও অপরাস্ত, অবশেষে খাতে ট'লে পড়ি,	পিছনে ধায়—/ অবশ্যই অবিজিত
	আমি পড়ে যাই, আমার অস্ত্রশস্ত্র /
ভাঙেনি আমার অস্ত্র, শুধু জানি ফেটে গেছে	ভেঙেচুরে যায় নি—শুধু আমারই হৃদয়
বুক।	ভেঙে গিয়েছিল। /

'দশমী'তে আমরা যে বলিষ্ঠ নৈরাশ্যবাদের দাহদ্যুতি দেখতে পাই, এখানে কি তার একটি পূর্বাংকুর পাচ্ছি না ? শুধু তাই নয়, 'দশমী'র পঙ্গু নাবিকের পঙ্গু পাখায় বিষাদমণ্ডিত প্রাণনপ্রেতির দাক্ষিণ্য কি হাইনেরই উপহার নয় ?

ফরাসিভাষায় হাইনের আপন রচনার স্বকৃত/অনুবাদ ও সুধীন্দ্রনাথের ইংরেজি অনুবাদে তাঁর স্বরচিত কবিতার তুলনা করলে চোখে পড়ে এক দুর্জ্ঞেয় নিষ্ঠার ছাপ। সে নিষ্ঠা কখনো কখনো মূল রচনাকে অস্বস্তিকর বিশ্বস্ততার সামীপ্যে অনুসরণ করে। সুধীন্দ্রনাথের হাইনেঅনুবাদে, পক্ষান্তরে, কবি ও কবি-অনুবাদকের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ অথচ পরিসরবহুল সত্তার অবকাশ আছে যা বন্ধুতা, প্রেম ও শিল্পের পক্ষে জরুরী। সুধীন্দ্রনাথের হাইনে তা নাহলে হয়তো আমাদের হাইনে হয়ে উঠতে পারতেন না।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা

'সবুজপত্র যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, সে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় উদ্ভাসিত ছিল বলে', এই নম্র উক্তি স্পর্ধিত প্রমথ চৌধুরীর। এঁরি যুক্তিজাগর আধুনিকতায় মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বাংলার সরস্বতীর বীণায় এ যেন তুমি ইস্পাতের তার ছড়িয়ে দিয়েছ।' রবীন্দ্রনাথ যাঁর কাছে একাধারে জীবনদেবতা এবং শিল্পবিগ্রহ সেই অমিয় চক্রবর্তী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি : 'আমার সম্পর্কীয় একটা অপবাদ শুনেছি যে আমার নিজের ছাঁদের কবিতা ব্যূহ বেঁধে আছে বাংলা সাহিত্যকে ঘিরে। তারি বিরুদ্ধে বিদ্রোহী অসহিষ্ণুতা প্রায়ই দেখা যায়। সে বিদ্রোহ জয়ী হোক এ আমি অন্তরের সঙ্গে কামনা করি। তাই আমি আনন্দ পেয়েছি অমিয়চন্দ্রের কাব্যে তাঁর স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য দেখে।'

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আধুনিক বাংলা কবিতার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই কথাটা স্বতঃসিদ্ধের মতো মনে হয়, তিনি বারংবার তাঁর উত্তরসূরীর মধ্যে এমন একজন সতীর্থ খুঁজে ফিরেছিলেন যিনি প্রতিযোগী হিসেবেও অভিনব। সেদিক থেকে প্রমথ চৌধুরী প্রথম। "প্রমথবাবু ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য অথচ ভাষার টেকনিকে এবং প্রসাধন সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে ঋণী···সবুজপত্রের যুগে রবীন্দ্রনাথের ভাষা বিশেষ উজ্জ্বল পরিণতি লাভ করেছিল," 'সাহিত্যগুরু প্রমথ চৌধুরী' প্রবন্ধে অমিয় চক্রবর্তীর ব্যক্ত এই অভিমত যথার্থ। রবীন্দ্রনাথের শেষ মুহূর্তের পুনর্নব কাব্যভাষা সম্পর্কে অমিয় চক্রবর্তীর ভূমিকা ততোটা অমোঘ কিনা তা নিয়ে উঠতে পারে, কিন্তু তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বোধহয় দ্বিধা উত্থাপনের কোনো সুযোগই নেই।

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কবিতা, অতএব, পরস্পরস্পর্শী। সন্দেহ সংশয়

নিয়ে আধুনিক কাব্যধারার দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি, সেই স্রোতের মধ্যে নিজেও গ্রথিত হয়ে পড়েছিলেন। রবার্ট ব্রিজেস যেভাবে একদিন অজ্ঞাত তরুণ কবি হপ্‌কিন্সকে কাঁপা হাতে আশীর্বাদ করেছিলেন, সেইরকম কুণ্ঠিত বিষণ্ণ বাৎসল্য নিয়ে নয়। নবীনবরণে সর্বাগ্রণী সেই বর্ষীয়ান্‌ তরুণ কবির হাতের উদ্ধত মশাল থেকে আগুন চুরি করে নিয়েছিলেন এবং অস্তসূর্যের উদ্দেশে শেষবারের মতো তাঁর নিজস্ব মশাল তুলে ধরেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের শেষ দশকের কবিতা আধুনিক বাংলা কবিতার প্রধানতম প্রস্থানভূমি। অমিয় চক্রবর্তী সেই উৎস থেকে অঞ্জলি ভরে তীর্থসলিল সংগ্রহ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনের অন্তিম গ্রন্থিতে হাত রেখে বুঝতে পেরেছিলেন, মানুষের আপেক্ষিক অভিজ্ঞতার ভিতরে চারিদিকের 'নিত্যবহমান অনিত্যের স্রোত' যদি ঢুকে পড়ে তবে এক ধরণের প্রজ্ঞা অর্জন করা সম্ভব। আমাদের বহির্দৃশ্যলিতে আপাততুচ্ছ যা-কিছু ঘটছে সেই অনুপুঙ্খের লহরীকে কবিতায় ভ'রে তুলতে পারলে শিল্পীর মুক্তি। 'আমি আছি এবং আর সমস্ত আছে, আমার অস্তিত্বের মধ্যে যুগল-মিলন', রবীন্দ্রনাথের এই অভিপ্রায়িক উচ্চারণ কী ক'রে তাঁর এবং অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় ফলিত হয়েছে, দু-তিনটি উদাহরণে সেটি অনুভব ফরা সহজ :

১ এই অজানা সাগরজলের
বিকেলবেলার আলো
লাগলো আমার ভালো।

এই দেখে মোর ভরল বুকের কোণ।
—তে হি নো দিবসাঃ, 'পরিশেষ', রবীন্দ্রনাথ।

ফুলের নোওয়ানো ছায়া ডালটা
বেগনি মেঘের ওড়া পালটা
ভরল হৃদয় তল—
একলা বুকে সবই মেলে। —বিনিময়, 'পারাপার', অমিয় চক্রবর্তী

২ মাটির কাছে কণ্টিকারির
নীল সোনালীর বাণী —কণ্টিকারি, 'পরিশেষ'।
আহা পিঁপড়ে ছোটো
পিঁপড়ে ধুলোর রেণু মাখুক —পিঁপড়ে, 'পারাপার'।

৩ জানি জানি তোমার প্রেমে
সকল প্রেমের বাণী মেশে,
আমি সেইখানেতে মুক্তি খুঁজি
দিনের শেষে। —গীতবিতান

এতোদিন আছি বেঁচে

কিছুই জানিনি, তবু শেষে

প্রাণের নিঃশেষ প্রেমে জেনেছি

সমস্ত প্রাণ মেশে। —ফ্রাইবুর্গের পথে, 'পারাপার'।

সর্বশেষে দ্বিপদীটিতে অন্ত্যমিলের মন্ত্রছলনা রবীন্দ্রপ্রেরিত। সেই সঙ্গে ট্রাজেডিরহিত, সানন্দ মনোভঙ্গি। কবিতার ক্ষেত্রে অবশ্য কবির মনোভঙ্গিটিকে উপমা, প্রতীক বা শব্দছবি থেকে কৃত্রিমভাবে ব্যবচ্ছিন্ন ক'রে দেখা যায় না। এবং অমিয় চক্রবর্তী যখনই রবীন্দ্রমণ্ডলের উপমা, প্রতীক বা শব্দকল্প পরিগ্রহণ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ নামক সমস্ত ঐতিহ্য তাঁর কবিতায় অনুপ্রবিষ্ট এবং নতুনতর আয়তনে অন্বিত হয়েছে।

জটিল চিন্তন এবং চৈতন্যে সমৃদ্ধ অমিয় চক্রবর্তীর মন। আধুনিক সমীক্ষাধর্মী কবিতার সূচনা ও বিবর্তন বিষয়ে আলোচনাকালে তিনি তিনটি অনিবার্য সূত্রের কথা বলেছিলেন ঃ

১ সময় সম্পর্কে কবির আত্মসচেতন দৃষ্টিভঙ্গি

২ একই সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সঙ্গত ও গ্রন্থিল সম্বন্ধস্থাপন

৩ বৈজ্ঞানিক ভঙ্গিতে উল্লিখিত দুটি সূত্রের পরিণামী সমীকরণ

(—The Growth of Modern Analytical Poetry, The Visva Bharati Quarterly, vol III part III নব্য পর্যায়ে প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে অনূদিত।)

তাঁর স্বরচিত কবিতায় এই ত্রিকোণমিতি স্পষ্ট ঃ

১ তুলনায় যেতে নীল সিন্ধু-পাখি ওড়া তীরে

ভালো করত যদি দেখত হলদে বালির অস্তুতার

আলগা পৃথিবী, নিত প্রেমের একান্ত ক্ষণ ঘিরে

মধ্যাহ্ন মাস্তুলে কাঁপা চিক্কণ রোদ্দুরে আড় চোখে

বৃহৎ আত্মীয় বিশ্ব ঃ প্রত্যহ সত্তার কিনারায়

ব্রুকলিন থেকে মাঝি যেখানে নৌকো বেয়ে যায়

—শ্রীমান শ্রীমতী, 'পারাপার'

২ পরে পরে নয়, এক সঙ্গে। ঝিরিঝিরি

চুলে ছোঁয় বন্য হাওয়া, কানে ঝাউগাছ শিরিশিরি,

কফির সুরভি, ঠোঁটে মাখনের স্বাদ মধু-মেশা,

ভোর সাড়ে সাতটার গোলাপি আলোর ঠাণ্ডা নেশা—

মুহূর্তের এই মূর্ত বহ

শরীরী চৈতন্যে বাঁধা আমার সংগ্রহ

ওডি-কলোনের গন্ধমাখা

• বন্ধু, তোমার আজ নীলান্তে পাঠাই দূর পাখা।

—১৬০৪ য়ুনিভার্সিটি ড্রাইভ, 'পারাপার'।

যেন ঈথার-ইন্দ্রিয় দিয়ে বহির্জীবনের শরীরকে তিনি ছুঁয়ে আছেন। 'বৃহৎ আত্মীয় বিশ্বে'র এক প্রান্তে যা ঘটছে বিপ্রতীপ প্রান্তে তার রণন থেকে যাচ্ছে, সমাপতনের এই ধারণায় হয়তো ব্লেকের প্রবর্তনা আছে। কিন্তু ব্লেক যে দেখেছিলেন খাঁচার ভিতর অবরুদ্ধ পাখি দ্যুলোকের সামসংগীত নষ্ট করে দেয়, সশস্ত্র সৈনিক চৈত্রদিনকে ম্লায়মান করে তোলে, সমাপতনে পাপের এই ভূমিকাকে অমিয় চক্রবর্তী কি স্বীকার করেন ? 'Evil is never shown as happening disconnected with the texture of an inclusive whole' —এই হলো ব্লেক প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর অবলোকন। এবং প্রসঙ্গত তাঁর উত্তরমীমাংসা : He also sees that goodness and beauty, appearing anywhere, must also charge the balance 'and affect the totality' (The Growth of Modern Analytical Poetry থেকে উদ্ধৃত) সচ্চিদানন্দকে কবিতার রুদ্রাক্ষে বিধৃত করেছেন ব'লে পাপের শাস্তিমূলক ফলশ্রুতির চেয়েও পরিশীলিত, যজ্ঞশোধিত রূপভেদটিকে তিনি বড়ো বলে মানেন। আফ্রিকার আলেখ্য আঁকতে গিয়ে তিনি দেখেন অসংখ্য পাপ যুগসত্তের প্রায়শ্চিত্তে রূপান্তরিত :

> অ্যালবার্ট শোয়াইট্‌জর আজো প্রায়শ্চিত্তে নেমে
> আশ্রমের নিত্যশ্রমে দুর্ভেদ্য আহত আফ্রিকায়
> বাঁধেন ক্ষতের অভিশাপ। —আফ্রিকা থাকর, 'ঘরে ফেরার দিন'।

প্রেমের কবিতাতেও এই কবি নিপুণভাবে রক্তরিপু থেকে সংরাগকে বিশ্লিষ্ট করে নিয়েছেন। পারমার্থিক কবি ডান্‌ও প্রেমের লিরিক লিখেছেন, কিন্তু তাতে শারীরিক নশ্বরের মৃৎস্পন্দ কিরকম বেপথুমান! মরমী কবি অমিয় চক্রবর্তীর প্রেমের লিরিকে প্রেমিকের বৈদেহী আবেগ তারসপ্তক না ছুঁয়েও কি আমাদের মুহূর্তে আচ্ছন্ন করে না ? প্রথমোক্তের 'I wonder by my troth, what thou and I Did, till we lov'd' এর সঙ্গে অন্যজনের 'জানতামই না যখন দুজন সে তো অনেক দূর' অনুষঙ্গে কাছাকাছি হয়েও কী অপরিমেয় দূরত্বে ন্যস্ত এবং দুই দূরত্বেরই অভিঘাত কী বিপুল।

অমিয়-মানসে বিভিন্ন প্রভাব একমুখী ও কল্যাণী পরিণতি পেয়েছে। তাঁর কাব্যের অজস্র ছড়ানো ইন্দ্রজালিক পংক্তি ধ্রুবপদ বা refrain-এর লক্ষণাক্রান্ত। এবং একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় আটপৌরে প্রত্যহ পরিবেশের মধ্য থেকে তাঁর হাতে অতর্কিতে ক্ষোদিত হয়ে ওঠে পরম মুহূর্ত যাকে তিনি গীতিকবিতায় ধ্রুবপদে আকারিত করে তোলেন। তখনি বিবেকী পাঠকের কাছে স্বচ্ছ হয় বিশ্বকবিতার আগোরনীয়ান ইঙ্গিত কোন্‌ পারম্যের সার্থকতা পেয়ে তাঁর কবিতায় এসে পৌঁছয়। ইয়েট্‌স অথবা এলিয়ট, কারো সঙ্গেই এই কবির সাধর্ম্য নেই, অথচ দুজনেরই প্রস্বর যে এঁর কাব্যের ধ্রুবপদে সংগৃহীত হয়ে মঙ্গলশঙ্খের মতো বেজে ওঠে, যথাক্রমে 'ওক্লাহোমা' ও 'সাবেকি' কবিতা দুটি তার অভিজ্ঞান।

ধ্রুবপদ রচনার এই শ্রীমন্ত আগ্রহে তিনি ইন্দ্রিয়চেতনাকে যেভাবে প্রয়োগ করেন, অদৃশ্যে মুহূর্ত নির্ণীত হতে থাকে : সহস্র প্রত্যহের পটে বৈদ্যুতিক বোধি জ্বলে ওঠে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সমর্পিত হতে থাকে ভুবনেশ্বরের অভিমুখে এবং পক্ষান্তরে, আকস্মিক অথচ প্রত্যাশিত বিচ্ছুরণে অতিমানস অথবা সৌর সত্তা মায়াব বোধ তারবার্তার মতো অবরোহণ করে। তাই সাক্ষাৎ সন্ধান এই পেয়েছে কি '৩-টে ২৫-এ' অথবা 'কেউ বুঝি বলেনি তোমায়/ সূর্য উঠেছে স্নাত রাঙা শূন্যে'—এইসব কথনভঙ্গি স্বাভাবিক নাটকীয়তার বিশ্বাস-যোগ্য বলে মনে হয়। এর সঙ্গে জীবনানন্দের 'সে যেন ডানা টিউব ট্রেন রাডার প্লেন টেলিপ্যাথির গতি। ছাড়িয়ে নীল আকাশে এসে নীল আকাশের নিজের পরিণতি' তুলনা করলে অনুমান করা যায় শেষোক্ত কবি আমাদের প্রস্তুত হতে সময় দেন না, মুহূর্তে যে কোনো শিখর অথবা শূন্যতায় বিপন্ন, অভিভূত অথবা ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে বক্ষ্যমান কবি অনুভূতির পরিসর প্রণয়নে পারম্পর্য রাখেন।

এক-এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথের চেয়েও হয়তো নাটকীয়তাকে ইনি ফল্গুসলিলে নিয়ে যেতে চান্। সানাই-এর 'অপঘাত' কবিতাটির শেষ দুই পংক্তিতে যে নিদারুণ স্বরক্ষেপ আছে তার বদলে অমিয় চক্রবর্তীর 'পালা-বদলে'র 'অপঘাত' নামক সনেটপ্রতিম কবিতাটির শেষ পংক্তি (কোরিয়া আগুনে পোড়ে, রেডিয়ো ছড়ায় দগ্ধ রেখা) কি অপেক্ষাকৃত অনুদাত্ত নয়? এক্ষেত্রে একটা কথা অবশ্যই মনে রাখা দরকার। আধুনিক কবিতায় ক্রমশই যখন স্বরের চেয়ে শ্রুতিই প্রাধান্য পাচ্ছে, পাশ ফিরে চাপা আত্মগুঞ্জনে কোনো কথা শোনালে তার আবেদনও অপরিসীম হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রদীক্ষিত এই কবি আরো জানেন, মিতাক্ষর সৌজন্য এক-এক সময় কতো শক্তিশালী হতে পারে।

ভারতবর্ষের বাংলা ভাষা এই কবির যথার্থ স্বদেশ। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের মানব ও মৃত্তিকার তাই তিনি অন্তরঙ্গ। বিদেশের পথে তাই তিনি যখন দেখেন একটি মেয়ে অন্যদেশী পথিককে যত্ন ক'রে খাওয়াচ্ছে, ভাবছে 'ভাই যেন এল পৃথিবীতে', অথবা বর্ষীয়সী ম্লান নারীকে নাতি-নাতনিদের সঙ্গে দেখে বুকের মধ্যে বিশ্বমৈত্রীর মিড় লাগে, তাঁর মনে হয় "যেমন ভারতী গ্রামে যে কোনো অনন্ত পরিবারে' তিনি আছেন। যখন যেখানে 'রোদ্দুরে চলেছে মালগাড়ি' অথবা 'উটসারি চলেছে সংসারে', তিনি বাংলা ভাষায় সেই নিখিল চলচ্চিত্রের ব্যঞ্জনাকে ধরে রাখেন। অথবা, এই ভাষাকে বুকে নিয়ে তিনি এমন একটা জায়গায় ফিরতে পারেন যেখানে সমস্ত দেশ শিল্পের স্বদেশে সমাহৃত, যেখানে উঠে তাঁর মনে হতে পারে : 'দোতলায় উঠে সেই কবিতার কাছাকাছি একা। ফিরেছি ক্যান্‌সসে।'

'জাগ্রতের চিরমাতৃভাষা' তাঁর কবিতায় শোনা যায়। বস্তুত যে ভাষায়

আমরা কথা বলি তাকে তিনি তাঁর বাক্ছন্দে নন্দিত করেছেন। তাঁর কবিতায় ঘরোয়া শব্দগুলি শ্বাসাঘাত নিয়ে জড়োয়া শব্দের ঘুমন্ত মুখের মধ্যে প্রাণ-সঞ্চার করেছে। মাটির ছন্দ স্বপ্নবৃত্তে তাই তিনি নিপুণ কৌশলে মুক্ত ছন্দ (ফরাসি vers libre) থেকে ঝাঁপতাল (হপ্‌কিন্সের Sprung Rhythm) অন্তর্নিবিষ্ট করে দেন। পংক্তিতে অন্তর্মিলের অভিঘাত সৃষ্টি করার জন্যও ঝাঁপতাল ছন্দটিকে তিনি হপ্‌কিন্সের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন, তাঁর Modern Tendencies In English Literature গ্রন্থটি থেকে এইরকম ইঙ্গিত পাওয়া দুরূহ নয়।

কবিতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ কিন্তু লিরিক রচনাকালে যেন তাঁর 'আঙুলে কুহক লাগে,' 'বুক ভরে শুতে যাই শ্রীরাগ ধ্রুপদ গম্ভীর'—এ শুধু তাঁর কোনো বিশেষ মুহূর্তের বিচ্ছিন্ন উচ্চারণ নয়। অতীন্দ্রিয় রাগ-রাগিনীর এক-একটা বেড় তাঁর প্রত্যেক গীতি-কবিতাতেই পাওয়া যায়। সেই কারণে তাঁর লিরিক, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে, 'সীমাস্বর্গের ইন্দ্রাণী'।

ঈশ্বরকে তিনি কি আমাদের এই নগরসভ্যতার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে একটু বেশি সপ্রতিভ সুমার্জিত করে দেখিয়েছেন? মধ্যযুগের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী লিখেছিলেন: 'এক দেব নানা মূর্তি হৈল মহাশয়। হেম হৈতে বস্তুত কুণ্ডল ভিন্ন নয়।' আধুনিক কবি অমিয় চক্রবর্তী হয়তো প্রায় একই প্রসঙ্গে: 'দেখলাম দু'চক্ষু ভরে, হে প্রভু ঈশ্বর মহাশয় / চৈতন্যে প্রসন্ন সূর্য।' 'মহাশয়' সম্বোধনে যেমন ঈষৎ কৌতুকী আমেজ লাগে, আবার মানবিক সম্বোধনের ভিতর দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে একটি নিবিড় ব্যক্তিরূপ—যে বিশ্বব্যাপার সম্পর্কে একান্ত ব্যক্তিগত একটি শুভেচ্ছা পোষণ ক'রে আছে, যার বুকে ক্ষমা করার ভালোবাসার অমেয় শক্তি আছে।

ঈশ্বর অথবা উৎসকে এই কবি কখনো-কখনো প্রমাণ করতে চেয়েছেন। সব সময় যে সেই চেষ্টায় কৃতকার্য হয়েছেন সে কথা বলা যায় না। হয়তো এক-একবার তত্ত্ব-ভাবণের প্রবণতায় বিকেন্দ্রিত হয়েছেন। কিন্তু হঠাৎ যখন উৎসকে তিনি গভীরে আমন্ত্রণ করেছেন, বাণী এবং নীরবতার অব্যক্ত কেন্দ্রে প্রত্যাদেশ পেয়েছেন, তুলনাসূত্রে মনে পড়ে যায় মধ্যযুগীয় সন্তশিল্পী কবীরের উপলব্ধি এবং আমাদের ছড়ানো-ছিটানো জীবনের অমার্জনীয় বিভ্রান্তির, বৈষম্য আর অসামঞ্জস্যকে সমাহৃত ক'রে আমাদেরই কবি অমিয় চক্রবর্তী নিস্তান অন্তর্জগতে বিশ্বকমলের সিংহাসনটি দেখিয়ে নিভৃত মন্ত্র উচ্চারণ করেন:

'মধুকোরকে মুকুলরাশি, কমলদল নেই।'

প্রথা ও প্রগতি : বিষ্ণু দে-র লিরিক

তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র শুরুতেই অনুস্যূত 'পলায়ন' কবিতাটি অনেক পাঠকের স্মৃতিতে মুদ্রিত হয়ে আছে। পান্থশালায় প্রেমিক বা পথিকের উচাটন ও নিষ্ক্রান্তির এরকম সপ্রতিভ লিরিক আমাদের পরিচিত কবিতায় সচরাচর কমই পাওয়া যায়। অন্ত্যমিলের ইচ্ছাকৃত অভাব সত্ত্বেও প্রায়-চতুর্দশপদী কবিতাটিতে তবু এমন একটি আয়তি আছে যার সঙ্গে ভারতীয় কবিপ্রসিদ্ধি অথবা কাব্যপরম্পরার যোগ অত্যন্ত স্পষ্ট। কারুকৃতির চাহিদায় লিরিক এখানে তার সীমাস্বর্গের সংহতি বজায় রেখেই তার বক্তব্য ব্যক্ত করছে। ওই লিরিকে ব্যবহার্য উপকরণগুলিও তেমন-কিছু বৈপ্লবিক নয়।

একবার রিখিয়ায় তাঁর সঙ্গে প্রভাতী আড্ডায় প্রসঙ্গত ব্রেশ্‌টের একটি সনেট ('এক তরুণীর উদ্‌ঘাটন') নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। ব্রেশ্‌টীয় রচনাটি মুহূর্তশিল্পের অনুরূপ নিদর্শন। 'পলায়ন' কবিতাটির সঙ্গে তার পরিবেশ ও অনুষঙ্গের সাদৃশ্যও লক্ষ করবার মতো। এক্ষেত্রে মনোভঙ্গির দিক দিয়ে ভারতীয়তার ('তীর্থযাত্রী হৃদয়') আভাস না থাকলেও প্রথানুগত রূপের কাছে কবির আনুগত্য উচ্চারিত।

ব্রেশ্‌টের কবিতা স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লিরিকে আরো সংগ্রামী কথ্যতার জন্য পরিসর তৈরি হয়েছে। তা সত্ত্বেও, বুঝতে পারা যায়, বিশেষত শেষ পর্বে প্রেমের কবিতা লিখবার সময় তিনি স্মিতি ও সম্মিতির সঙ্গে নিরুপায় রফানিষ্পত্তি করতে বাধ্য হয়েছেন। 'হেলেনে হ্বাইগেল' কবিতায় প্রেমিকাকে নিবেদিত তাঁর উক্তির ('এবং গোঁয়ার যারা অশিক্ষিত তাদের দেখাও / এককণা আশা-ভরসায় / তোমার মহান্ মুখ') বৈপ্লবিকতার আড়ালে বিষ্ণু দে-র প্রৌঢ়কালীন একাধিক প্রেমের কবিতার মতোই—শরণাশ্রিত দয়িতসত্তার আর্তি গোপন থাকে না। এরকম প্রকাশ্য

অথচ সুবিনীত প্রেমের কবিতা অবশ্য বেশ্টে কম। তাঁর অন্ত্যপর্বের বিখ্যাত এলিজিগুলিতে নিজের নন্দনতত্ত্ব থেকে বেরিয়ে এসে তিনি যে সব লিরিক লিখেছেন সেখানে প্রেম সাধারণত প্রচ্ছন্ন প্রসঙ্গই থেকে গিয়েছে। প্রেম-কবিতায় সনাতন রীতিকল্প অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে, এই বোধের গরজেই সম্ভবত তিনি প্রত্যক্ষত তখন প্রেমের কবিতা অল্পই লিখেছেন। অন্যান্য বিষয়ে লিখতে গিয়ে এমন-কি সন্দর্ভ বা এডিটোরিয়ালের বাগ্মিতা থেকে শুরু করে হাইকু-র মিতকথনে ব্যবহার করেছেন স্বাধীন গদ্যকেই। ঐ গদ্য লিরিকসুলভ কাব্যভাষার ধার ধারেনা।

এই স্বাধীনতা, তাঁর 'অনিষ্ট'-পর্ব থেকে বারংবার অনুশীলিত বাক্-পর্ব বা পর্বাঙ্গের কেটে-কেটে বা জিরিয়ে-জিরিয়ে চলনের প্রাচুর্য সত্ত্বেও, বিষ্ণু দে নেননি। একেবারে শেষ দিকের কিছু নমুনা বাদ দিলে বলা যেতে পারে, কবিতার জন্য গদ্যকে তিনি সর্বত্রই স্টাইলাইজড ও শীলভদ্র করে নিয়েছেন, তাকে সরাসরি কবিতায় প্রবেশাধিকার দেননি। গদ্য তাঁর কাছে অন্তর্মুখী একরকম বাক্স্পন্দের মধ্যবর্তিতায় গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে। বলা বাহুল্য, ঘরোয়া বৈঠকী কথোপকথনের মেজাজ প্রায় সব সময়েই উপস্থিত থেকেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আলাপচারিতার মধ্যেও ছন্দঃস্পন্দ আছে এবং বিষ্ণু দে তাঁর কবিতায় এই স্পন্দগুণ কখনোই অস্বীকার করেননি।

তাঁর দীর্ঘায়িত অখণ্ড কবিতায় (যেমন 'জল দাও') প্রেম আলম্বন না উদ্দীপন বিভাব হয়ে আসতে চেয়েছিল, সেই প্রশ্নের দ্ব্যর্থহীন নিরসন দুরূহ হলেও পরিণামী সংবেদনের বিচারে একথা বললে অন্যায় হবে না, লিরিকের সীমাশীর্ণতা থেকে সাময়িকভাবে সচেতন মুক্তির বাসনাই সেখানে প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাসবীক্ষা বা যুগচেতনার তাড়না এই ধরনের কবিতায় কাজ করেছে বলে রূপের সংযম সেখানে দাবি করাটাই হয়তো ভুল। আমার বিনীত বিবেচনা, এই সব এপিকপ্রবণ রচনায় কবি নিজেও এক-একবার লিরিক থেকে নিষ্ক্রমণের মুক্তিবোধ অনুভব করতে চেয়েছিলেন। তবুও এর কোনো-কোনো অংশে বলয়িত গীতি কবিতার ছোটো ছোটো হ্রদ তিনি নির্মাণ করে দিয়েছেন, যেখানে কাব্যানুশাসন রক্ষা করবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর।

কেন তাঁর খণ্ড ও অখণ্ড কবিতার মধ্যে দোলাচলের এই দোটানা? থেয়োডোর আডোর্নো তাঁর একাধিক প্রবন্ধে আমাদের জানিয়েছেন, বিশুদ্ধ লিরিক রচনার মধ্যেও রাজনৈতিক চেতনা, স্বৈরাচার ও শক্তিপিপাসু শাসকের বিরুদ্ধে এক ধরনের স্বরায়ণে, প্রকাশিত হতে পারে অখণ্ড কবিতাগুলিতে কিছুটা প্রধানত বক্রোক্তির আশ্রয় নিয়ে ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে অনায়াসেই প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা চলে। খণ্ড কবিতার একনিশ্বসিত আয়তনে সেটা কি তিনি পারতেন না? নাকি লিরিককবিতাকে তিনি যথাসম্ভব অপীড়িত রেখে দিতেই চেয়েছিলেন?

২

আমাদের ছাত্রবয়সে 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধারের' কাছে কবির প্রাগ্বর্তী ছ'টি কাব্যগ্রন্থ রাতারাতি যেন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছিল। 'অন্ধকারে আর', 'ভিলানেল', 'ক্লান্তি নেই', 'সেই তো তোমাকেই' প্রভৃতি শ্রীমন্ত সুঠাম এতগুলি প্রেমের কবিতা একসঙ্গে হাতের কাছে পেয়ে আমাদের মনে হয়েছিল প্রেমের এই ভাষ্যকার মূলত প্রেমেরই গীতিকবি। এই সময় কবিতা কর্পূরমঞ্জরীর মতো লাবণ্যে নির্ভার। যে-বিষাদ বা আনন্দ কবিচিত্তকে অধিকার করেছে তার রাজনৈতিক মাত্রা দুর্নিরীক্ষ্য। সমাজের দুর্গতি দেখেও পীড়িত কবিস্বভাব যেখানে প্রত্যাবৃত্ত হয়েছে তার এলাকা অধিকাংশতই স্বগত হৃদয়। এমন-কি রবীন্দ্রসংগীতের সৌজন্যে কোনো-কোনো গীতালিতে চিদ্‌ঘন ভক্তির সুরও বেজে উঠেছে। এদেরই পাশাপাশি আছে 'রথযাত্রা ঈদ্‌মুবারকে'র মতো সমাজচেতন লিরিক, প্রেম যেখানে প্রান্তিক হলেও অণুল্লেখ্য নয় এমন বিষয়, তার সেজন্যেই হয়তো স্বাধীনতা-উত্তর সমাজসমালোচনা প্রতিবাদের বদলে দীর্ঘশ্বাসের পেলব মাধুর্যে আকারিত হতে পেরেছে। 'পাঁচ প্রহরের মতো একাধিক লিরিকসমন্বিত দীর্ঘ কবিতার মুগ্ধ পাঠক একথা কবুল করতে বাধ্য যে কবিস্বভাবের এই লালিত্যময় লাজুক ভঙ্গিটি লিরিকধর্মী, এবং বিষ্ণু দে-র একান্ত মজ্জাগত।

মনে হয়, 'আলেখ্য' থেকেই লিরিকের কাছে কবির আস্থাময় প্রত্যাবর্তন একটি নিয়ম পেয়েছে। একথার অর্থ এই নয় যে তিনি আর দৈর্ঘ্যসঞ্চারী কবিতায় হাত দিচ্ছেন না। বস্তুত 'হেমন্ত'র মতো দৃশ্যানিষ্ঠ কবিতা প্রমাণ করে, যুগ বা পরিপার্শ্বকে নিয়ে অবলোকন বা অভিযোগ প্রকাশ করার চাহিদায় বড়ো কবিতার মাধ্যমকেই তিনি সংগত বলে মনে করেছেন। সেই কারণেই 'হেমন্তে'র শেষ দুটি পংক্তির ('অত্যাচারের অমোঘ নিয়মে সুখী অসুখীর বিচ্ছেদ ভেঙে কবে যে সবাই বাঁচবে!') স্বাভাবিকতা পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আপাতদীর্ঘতা সত্ত্বেও ঐ কবিতাটি কয়েকটি লিরিকেরই সমষ্টি। নাম-কবিতা 'আলেখ্য' সম্পর্কেও এই মূল্যাঙ্কন খাটে। ফ্রেস্কোর মতো সাজানো এই কবিতাবলিতেও দৈর্ঘ্যের নান্দনিক সুযোগ নিয়ে কবি তাঁর বিদ্রোহবীক্ষা ('কেন যে লেনিন আগুন জাগান লেনিনগ্রাদের তুষারে) উৎকীর্ণ করে দিতে পেরেছেন।

তারুণ্যের ঔদ্ধত্যে বিষ্ণু দে-কে একবার বলেছিলাম, বীজমন্ত্রের চারিত্র থাকলেও এই কবিতায় এরকম 'নিকষোপম পংক্তি' (touchstone line) তেমন বেমানান, আরোপিত ঠেকে। কবি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মুদ্রায় এই নির্ধারণে কোনো উত্তর দেননি। 'আলেখ্য'র অপরাপর লিরিক ('বৃষ্টি চলে অবিরাম', 'এবং লখিন্দর', 'সনেট') অবশ্যই ঐ প্রশ্নের শিল্পিত উত্তর। এই সব কবিতায় কোনো আদর্শবাদের বালাই নেই, তারা প্যালগ্রেভের অঙ্কিত

স্বয়ম্পূর্ণতার শর্ত মেনেই লিরিক। কিন্তু ছোট্ট 'আলেখ্য' শীর্ষক কবিতাটিতে লিরিকের সঙ্গেই যৌথ উত্তরণের এমন একটি দৃপ্ত মাত্রা ('আমরা সবাই কেনই বা পার হব না/ সামনের এই পাহাড়ের খাড়া খন্দ') অঙ্কিত হয়েছে যা কবির আশীর্বাদকে অনায়াসেই কবিতার অঙ্গীভূত করে নিয়েছে। আমাদের বিনীত অনুমান, **বক্তব্যকে মাত্রায় রূপান্তরিত করার একটি মায়াবী পদ্ধতি** কবি তখন থেকেই আয়ত্ত করে নিয়েছেন। এই বক্তব্যও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো প্রচারমূলক অনুজ্ঞা নয়। লিরিক কবি তাঁর স্বগত সত্তাকেই এখানে ব্যপ্ত করে এক ধরনের বিশ্বগত স্বভাবে পরিণত করেছেন। উপদেশ বা উপহাস নয়, প্রস্বরের (intonation) উদাত্ততায়, নিজের জগৎটিকে (multiverse) সবার জগতের (universe) সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার এই ভঙ্গিটি বাংলা লিরিক কবিতায় বিষ্ণু দে-র নিজস্ব।

'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' এবং 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' কাব্যগ্রন্থে ব্যক্তি ও বৃহতের এই সহাবস্থান একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্যে পরিণত। রবীন্দ্রনাথের কবিতা গান উপন্যাস থেকে কীর্ণাংশ ব্যবহার করে **বৃহৎ ব্যক্তিবিশ্ব** প্রণয়ন করা তাঁর পক্ষে আদৌ আর কঠিন কাজ নয়। 'বামী' ও 'দামিনী' এই চরিতার্থ প্রবণতার শ্রেষ্ঠ দুটি দৃষ্টান্ত। এ দুটি কবিতার অন্তস্পটে তাৎপর্যময় বক্তব্য আছে। কিন্তু সে বক্তব্য মাত্রা হয়ে এসেছে বলেই প্রথাবিহিত গীতিকবিতার পাঠক ও এদের দ্বারা আচ্ছন্ন হতে বাধ্য। অথচ এই দুটি কবিতার মর্মে কবির প্রগতিবাদ রক্তমাংসের অকৃত্রিমতায় মিশে আছে। সুতরাং বলা যেতে পারে, প্রথায়ত ফর্মকেই কবি প্রগতির আধার করে তুলেছেন।

বিশেষত প্রেমের কবিতাগুলিতেই এই প্রক্রিয়ার প্রবর্তনা ও সিদ্ধি সবচেয়ে দীপ্যমান। 'সে কবে' অষ্টকটির ভিতরে ঐ প্রক্রিয়ার নৈপুণ্য স্বচ্ছ। পদাবলির মাথুর এখানে কবির অভিজ্ঞতায় ন্যস্ত হয়েছে। বিষ্ণু দে-র ঘরানায় দীক্ষিত অন্যান্য কবিরা (মণীন্দ্র রায় কিংবা প্রমোদ মুখোপাধ্যায়) নিঃসন্দেহে অন্তিম একটি অবরোহ যোজনা ক'রে এক বরাভয় আশাবাদ এখানে নিয়ে আসতেন। বিষ্ণু দে ঐ সম্ভাব্য অবরোহকে অষ্টকের অন্তঃশরীরেই লুকিয়ে রেখেছেন বলে এই স্তবকদুটি গীতিকবিতার ঐতিহ্য অঙ্গীকার করেও সেই বলিষ্ঠ আশাভরসা আভাসিত করেছে। 'রৌদ্রজলে সেই স্মৃতি মরেনা, আয়ু যে / দুরন্ত লোহার' লাইন দুটি কি ভরসার না হতাশার? সেই প্রশ্নের মোকাবিলায় আমি অনেক পাঠককেই তর্কে বৃত হতে দেখেছি। আর তাই নিশ্চিত নিয়ে বলা চলে, কষ্টকল্পিত দুর্বোধ্যতায় নয়, সহজেই অস্তিত্বের রহস্যঋদ্ধ দুরূহতার সৃষ্টিতে বিষ্ণু দে-র কবিতা তথা লিরিকের অনন্যতা।

যাঁরা এখনো বিষ্ণু দে-র কবিতায় দুর্বোধ্যতা নিয়ে বাগাড়ম্বর করেন, তাঁদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই, 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি এমন একটি পংক্তিও রচনা করেননি যা স্বকপোলকল্পিত

প্রাতিস্বিকতার সামিল। এই বিস্তারিত পর্বপরম্পরা প্রতিপন্ন করে, কবি পাঠকের দিকে দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছেন। তা নইলে 'প্রাকৃত কবিতা'র মতো লিরিক রচিত হতো না। আর কোনো সমীপকালীন বাঙালি কবিই সম্ভবত এত সহজ—সরল নয়—কবিতা লেখেন নি। এই কবিতার উচ্চচূড় মুহূর্তে ('দেখব অবাক চোখে / খাবেন পুণ্য জন') দোহাচর্যা প্রাকৃতপৈঙ্গলের চিরাচরিত উত্তরাধিকার পুঞ্জিত হয়ে নতুন আয়তনে বিচ্ছুরিত। একাধারে এরকম প্রেম ও বিপ্লবের কবিতা বাংলা ভাষায় বিরল। কবিতাটির অন্তরা-মুহূর্তে ('আসবে অনেকদিনের হারের মধ্যে লড়াই জিতে / অনেক মিছিলে সঞ্চিত সংগীতে / আসবে আমার সহিষ্ণু সংবিতে') বক্তব্যাবিমুখ পাঠককে অতর্কিতেই কবি তাঁর বলার কথাটা শুনিয়েছেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লিরিকের সংগীতমায়া ও চিত্রকল্পের বৈচিত্র্যে ফিরে গিয়েছেন। বাংলা লিরিকে এই সমবায় সম্পন্ন করেছেন বিষ্ণু দে। তাঁর পছন্দসই বা অন্বিষ্ট চিন্তনের নোঙর ঘটিয়েছেন তিনি প্রচলিত কাঠামোর মাধ্যমেই। এবং দুর্বোধ্যতার সামান্যতম উপসর্গও যে তাঁর এই পর্যায়ের কবিতায় অনুপস্থিত, কবিতার পাঠকমাত্রেই সেটা মানবেন।

এখানে বিশদীকরণের ঝোঁকে তাঁর কবিতার সমবায়ধর্মের ধরনটি আরেকটু ব্যাখ্যা করতে চাই। বিষ্ণু দে সচেতন অনুবাদের সময় এমন অনেক প্রগতি-দ্যোতক প্রেমের কবিতা সরাসরি গ্রহণ করেছেন যাদের বক্তব্যসর্বস্বতা শিল্প-সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। 'যুদ্ধের মধ্যে প্রেমের সাতটি কবিতা'র (হে বিদেশী ফুল, পৃ ৪৭) সূচনাতেই আছে আরাগঁ-র সেই তিক্ত অনুযোগ : 'আমি লিখি এই দেখে যেখানে খোঁয়াড়ে ওরা মানুষকে বাঁধে বিষ্ঠায় তৃষ্ণায় আর স্তব্ধতায় আর উপবাসে।' কবিতাটিও 'ঘৃণায় আর প্রতিশোধে উৎসুক'। অনুবাদ কবিতার মধ্যবর্তিতায় আমাদের কবিও অনেক কথা বলে নিয়েছেন যা তিনি স্বরচিত কবিতায় জ্ঞাপন করতে কুণ্ঠিত বোধ করেছেন। এই কুণ্ঠার কারণটি নান্দনিক। তাঁর প্রেমের কবিতায় লিরিক ও গীতিকবিতাকে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন ব'লে প্রকট ব্যঙ্গ বা ক্ষোভ সেখানে শমিত অথবা রূপান্তরিত। তবু তাঁর সার্থক লিরিকগুলিতে তাঁর দৃষ্টিকোণ অব্যক্ত থাকেনি, এখানেই তাদের গৌরব।

৩

বিষ্ণু দে-র নিসর্গকবিতায় এই একই গরিমা জীবন্ত। রবীন্দ্রনাথের মতোই তাঁর কবিতায় প্রকৃতির সঙ্গে প্রেম অথবা অন্যতর শক্তি (তাঁর ক্ষেত্রে সমাজ পুনর্গঠনের পথে সক্রিয় কর্মী বা সত্তা) সমীকৃত হয়েছে। জীবনানন্দে 'কার্তিকের ভোরবেলা কবে' এবং বিষ্ণু দে-র 'তিনটি কাঠবেড়ালী' কবিতাদুটির তুলনা করলে দ্বিতীয়োক্ত কবির স্বকীয়তা ধরা পড়ে। জীবনানন্দের বর্ণিত

তিনটি শালিক তিন প্রেমিকারই অসাধারণ অভিক্ষেপ। বিষ্ণু দে তার লিরিকে রামায়ণের রূপকটি মৃদুভাবে ভেঙে একজায়গায় বলে উঠেছেন : 'দীন সজ্জন সাহসী উৎসাহিত / মজুরেরই মতো ভঙ্গি।' রূপকটিকে তাত্ত্বিকতায় না টেনে এনে চিত্ররূপেই কবি রেখে দিয়েছেন এবং তারি মধ্য দিয়ে মার্কসীয় মেজাজ অপূর্ব ফুটে উঠেছে। ব্যক্তিপুরাণের সংরক্ষণে জীবনানন্দের মৌলভা প্রচলিত পুরাণের সাবলীল ও পুনর্ণব পাঠভেদ রচনায় বিষ্ণু দে-র কৃতিত্ব।

এরিশ্ ফ্রীড, আরেকজন প্রগতিকবি, দাবি করেছেন প্রেমের কবিতা শুধু রাজনৈতিকতায় আক্রান্ত কেন যথার্থ রাজনৈতিক কবিতাও হয়ে উঠতে পারে। বিষ্ণু দে-র অনেক প্রকৃতিচিত্রণ ও প্রেমভাবনার কবিতায় এই অতিক্রান্তি আছে। প্রেম প্রকৃতি বা রাজনীতি সবি গীতিকবিতা বা লিরিকে অর্পিত হতে পারে, যদি কবির উদ্দেশ্যবাদ অন্তরায় না হয়ে ওঠে। বিষ্ণু দে তাঁর মাধ্যন্দিন পর্যায়ের কবিতায় তাঁর উদ্দিষ্ট ভাবনাচিন্তাকে লিরিকের অন্তঃশরীরে অথবা সরঞ্জামের সম্ভারে অন্তর্গত করেই অসাধ্যকে সম্ভব করে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের সহায়তায় কবি সংগীতকবিতা পাঠ্য লিরিকের মধ্যে নতুন করে ঘটাতে পেরেছেন বলেই এই সমস্ত কবিতা ধ্রুপদী আধুনিকতার পর্যায়ভুক্ত হয়ে আছে। এই রূপাদর্শটি তিনি শেষের দিকে এলিয়ে দিয়েছেন কথকতায়। নিশ্চয়ই নতুন কিছু বক্তব্য তাঁকে তখন প্রবুদ্ধ করে থাকবে। আমাদের কাছে তবু তাঁর সেই পর্যায়ই স্পন্দমান, যেখানে তিনি প্রথাকে স্তরান্তরিত করেছেন প্রগতিতে, গীতি-কবিতাকে লিরিকে।

মেধাবী বেদনা

বছর কয়েক আগে চল্লিশের এক উদ্‌যাপিত কবির সঙ্গে মৌলালির গোধূলিজনতা উজিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। তাঁর এক তরুণ উত্তরসাধকের কবিতায় নগদ নিবিড় প্রশংসায়-প্রশংসায় আমরা দুজনেই যখন উতরোল, এমন সময় তিনি প্রশ্ন করে বসলেন : 'এই কবি আর ক'দিনই বা তাঁর হৃদয় থেকে রসদ সংগ্রহ করবেন ?' এই প্রশ্নের প্রবর্তনায়, মনে পড়ে, বাকিটা রাস্তা আমরা হেঁটেই পার হয়েছিলাম।

বাংলা কবিতার এই মুহূর্তে ঐ জিজ্ঞাসা বোধহয় আবার জরুরি হয়ে উঠেছে। আমরা এপর্যন্ত আত্মমুগ্ধতার আবেশে তথাকথিত 'বিভাজিত বোধে'র (dissociation of sensibility) পক্ষে অনেক মনোরম্য উক্তি উচ্চারণ করে এসেছি। ফলত মনন এবং মনের বিচ্ছেদ আজ আমাদের কাছে একটি স্বস্তিকর অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'অভ্যাস মানেই মৃত্যু' এই প্রবচন যদি আমরা পুরোপুরি কবুল না করে নিই তবুও তৃপ্তিমেদুর স্বরচিত প্রথার কবল থেকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে বেরিয়ে আসার ইচ্ছেটুকু অবৈধ নয়। আর এই বৈধ ও বিবেকী বাসনার তাড়নায় যদি কোনো কবি কিছুদিনের জন্য কোনো একটিও কবিতা লিখে উঠতে না পারেন সেটি শুধু ক্ষমার্হ নয় শ্রদ্ধেয় ব'লেও গণ্য করা যেতে পারে। মনে আছে, নিতান্তকলেজি সম্পাদকীয় হঠকারিতায় ভর করে এক দুপুরে জীবনানন্দের কাছে গিয়ে তক্ষুণি-লিখে-ফেলা একটি কবিতা দাবি করে বসেছিলাম, তিনি আমাদের তাঁর হাতে-ধরা টয়েনবির বই থেকে কিছু অংশ শুনিয়ে অনবরত বলে চলেছিলেন এই অদ্ভুত সময়ের মানুষ হিসেবে আমাদের করণীয় কিছু কাজ আছে এবং কবিতারচনা সেই সামগ্রিক কর্মধারায় জটিল একটি অংশমাত্র। দু'দিন বাদে আমাদের পত্রিকার আপিসে পেলাম তার চিঠি : 'নানারকম কাজকর্মের ফাঁকে কবিতা লিখতে চেষ্টা

করেছি, কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারিনি ; সেজন্যে আমি খুব লজ্জিত ও দুঃখিত। কবিতা গদ্য লেখার মত নয়, মাঝে-মাঝে **আয়ত্ত করা** খুব কঠিন হয়ে পড়েঃ (১৮৩ ল্যান্সডাউন রোড, কলকাতা ২৬/১৪.১২.৫১)।' তখনো বুঝিনি তাঁর মতো একজন মহৎ কবির পক্ষে কবিতা লেখার ব্যাপারটি স্বতন্ত্র নিষ্ঠায় আয়ত্ত করে নিতে হবে কেন? তাঁকে আমি বিস্তর ভুল বুঝেছিলাম, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ঋতুপত্রে তাঁকে তিরস্কার করে অসীম আনন্দ অর্জন করেছিলাম। এবং তাঁর অকালমৃত্যুর পর সেই মর্মে বাতাসে বাতাসে মাথা কুটে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম, সেকথা এখনো মনে পড়ে।

এই ঘটনার দু'দশক পরও যে চৈতন্য প্রখরতর হয়েছে, এবংবিধ অসম্ভব অমৃতকথনে রাজি নই। হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'একটি কবিতার জন্ম সমাচার' নিয়ে একটি কথিকাবৃত্তের উদ্যোগ করতে গিয়ে প্রথম মেদুর আঘাত পেলাম অমিয় চক্রবর্তীর কাছ থেকে। তিনি তারগ্রামের মতো পত্রাণু পাঠালেন : বাংলাদেশ ও বিপন্ন বিশ্বের জন্য দায় প্রবল হয়ে উঠেছে, তাই অংশ নিতে পারলাম না (ন্যু পাল্‌ৎজ/২৫ জানুয়ারি, ১৯৭২)'। নানারকম দায়দায়িত্বে ভাগ নিতে গেলে কেন কবিতার কাজে সরাসরি অংশ নেওয়া যাবে না, সেটা উপলব্ধি করতে অসুবিধে হয়েছিল খুব। এখন অবশ্য মেনে নিতে লজ্জা নেই, **সামগ্রিক অংশগ্রহণের জটিল আয়তনের ভূমিকায় কবিতা প্রণয়নের ব্রত একটি অনিবার্য শর্তের সঙ্কেত বহন করে আনে।**

ঐ সময়েই বিষ্ণু দে-কে আচম্‌কা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর এপিকপ্রতিম 'জল দাও' কবিতার অন্তিম মন্ত্র 'জল দাও আমার শিকড়ে' হপ্‌কিন্সের 'send my roots rain-এর প্রতিধ্বনি কিনা। এর উত্তরে, অনুমিতির সমর্থনে তিনি আমাকে লেখেনঃ 'কবিতার এবং মনের মিলিত যন্ত্রণার ঘোরেই কবিতাটি লিখিত হয়।' এই বাক্যের প্রথম শব্দটি নিঃসন্দেহে মেধা / মনন / অভিজ্ঞতার সমার্থদ্যোতক হিসেবে উচ্চারিত। বিষ্ণু দে, এই যন্ত্রণার পটভূমি হিসেবে একই চিঠিতে '১৯৪৭-এর অগস্ট নাগাদ .সেই রাজনৈতিক হিংস্রতা'র কথা উল্লেখ করেন। চিঠির দ্বিতীয় অংশে জাগর হয়ে আছে তাঁর তাৎক্ষণিক কর্মযোগের অঙ্গীকার :

"বাড়ির পাশের নির্জনপ্রায় কবরখানাতে বোধহয় পনেরোই তিনটি খুদাইখিদমদ্‌গার এসে উপস্থিত, হাতে শান্তির ইঙ্গিত কংগ্রেস পতাকা নিয়ে হাত জোড় ক'রে, প্রায় বাদ্‌শা খানের মতোই দীর্ঘকায় তিন পাঠান। তাঁদের দুজন আমাদের বাড়ির কাছে আসবার আগেই অদূরে নিহত হন। একজন তা সত্ত্বেও করজোড়ে শান্তির নিশানাটি ধরে এগিয়ে আসতে লাগলেন। এদিকে দেড়শো দুশো লোকের উত্তেজনা, কয়েকজনের চেঁচানি বৃথাই, ইঁটপাটকেল বর্ষণ চলল। আহত হয়ে পাঠানটি সামনের পুকুরে

ঝাঁপিয়ে পড়ে করজোড়ে পতাকাটি তুলে ধরে রাখতে চেষ্টা করলেন.... এবং ভূমিশায়ী মৃতপ্রায় অসহায় মানুষটিকে যখন নীরদ মজুমদার এবং লেখক মাথা আর হাঁটু ধরে নিয়ে যেতে গেল কাছের কংগ্রেস আপিসে প্রাথমিক চিকিৎসার আশায়, তখন জনতা ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্তপ্রায়। মনে আছে এক গোয়ালার বংশদণ্ড মুমূর্ষুর দেহে না প'ড়ে পড়ল লেখকের কাঁধে। মারবার নেশার জোরটা বুঝলুম যখন কংগ্রেস অফিসের দ্বার আহতটিকে নিলে না আমরা লজ্জায় ফিরে এলুম। স্নান করবার জন্যে যখন গেঞ্জিটা খুলতে গেলুম, তখন দেখি বাঁ হাতটা তুলতে পারছি না, আমার স্ত্রী বললেন, কী হলো ? জল দাও কবিতার প্রথম আরম্ভ দানা বাঁধতে লাগল এর পর থেকেই (রিখিয়া / ২১।২।৬২)"

এই প্রতিবেদনের পাশাপাশি রেখে কবিতাটি পড়লে অবাক হয়ে যেতে হয়। কবির বর্ণিত আরম্ভের আভাসটি এরকম ঃ

> ফাল্গুন আরম্ভে তার
> এক হিসাবে অবশ্য মাঘেই
> কিংবা তারও আগে
> ও বছরে—বা আর বছরে
> বছরে বছরে দীর্ঘ প্রকৃতির কর্মসূত্রে অথবা নিয়মে

এই প্রবর্তনার সূত্রপাত কোথায় সেই সন্ধিৎসায় তৎক্ষণাৎ ব্রত হয়ে ওঠেন সংবেদশীলিত পাঠক। এবং লক্ষ্য করেন 'প্রথম আরম্ভে'র পিছনে রয়ে গিয়েছে আরো কয়েকটি 'প্রথম আরম্ভে'র পটভূমি, দেশকালসন্ততির সঙ্গে যাদের যোগযুক্ততা অমোঘ। এ ঠিক-সেই রোমান্টিক অলংকারশাস্ত্রের স্বাভিমানী লালিত্যমসৃণ 'সমাহৃত আবেগের সমাহিত অভিব্যক্তি' শীর্ষক কাব্যমীমাংসা নয়। আমি এখানে এরকম কোনো উদ্ভট থীসিস উত্থাপন করতে চাইনে যে রোমান্টিক নন্দনতত্ত্ব আধুনিক প্রবণতার কাছে খারিজ হবার যোগ্য। পক্ষান্তরে, অনপব্যয়ী রোমান্টিকতা আজকের মানসের পক্ষে অনিবার্য একটি আশ্রয়ভূমিকা, সেকথা জোরগলায় বলতে দ্বিধা নেই। কিন্তু সেটাই সম্ভবত আমাদের এষণার একমাত্র বিষয়মান। **আমাদের আরাধ্য হওয়া উচিত প্রথানুগত কাব্যমীমাংসা ভেঙে একটি অজস্রমুখী কাব্যজিজ্ঞাসার নির্মিতি।** 'জল দাও' কবিতাটি এবং কবির মেধাবী বেদনায় আক্রান্ত পত্রনিবন্ধ সেদিকেই আমাদের অভিনিবেশ আকর্ষণ করছে।

এই কাব্যজিজ্ঞাসার একটি বড়ো ঝোঁক নিঃসন্দেহে **কবিস্বভাবের রূপান্তর।** কবি, জায়মান কবিতার চাহিদায়, নিজেকে ভেঙে নতুন করে গড়ে তুলবেন,' এবং নিজের মানসিকতাকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখতে থাকবেন যতক্ষণ না ঐ আত্মা-অতিক্রান্তি সাধিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় কবি তাঁর বিপরীত

মেরুর সতীর্থের কাছেও অধমর্ণ হতে পারেন, ভক্তি-কবি হপ্‌কিন্সের কাছ থেকে ছিনিয়ে-আনা ধ্রুবপদের পুনর্ণব প্রয়োগে তাই প্রগতিবান কবি বিষ্ণু দে-র চিত্তে কোনো সংকোচ পোষণের কারণ ঘটেনি। দুই কবিব্যক্তিত্বের এই রহস্যময় আত্মীয়তার মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে 'জল দাও' কবিতার রচয়িতার একটি অনবদ্য ব্যক্তিস্বরূপ যার সঙ্গে নিছক ব্যবহারিক স্তরে সংঘটিত ব্যক্তিত্বের কোনো যোগ নেই।

এইখানেই, মনে হয়, সমীপকালীন বাংলা কবিতার গহনগ্রন্থি। আমার বিনীত ধারণা, পঞ্চাশের কবিরাই প্রথম প্রকাশ্যত সত্তার এই ধরনের স্বাধীনতাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। কোনোরকম পূর্বধার্য চারিত্রিক / তাত্ত্বিক অনুশাসন তাঁরা মানেন নি। শুরুর দিকের 'শতভিষা' ও 'কৃত্তিবাসে'র পাতা উল্টে গেলে আজ চোখে পড়বে কবিচরিত্রের নিঃশর্ত নিরীক্ষা ও দুর্মর ভাঙাগড়ার কী অপরিমাণ আলোড়ন তখন চলছিল। রাতারাতি কবিপ্রকৃতির কোনো অতিনিরূপিত আদল তৈরি করে নেওয়ার জন্য কেউই তৎপর হয়ে ওঠেন নি তখন। তার মানে এই নয় যে তাঁরা যখন-তখন যে-কোনো আবেগের বশে পংক্তির পর পংক্তি রচনা করে চলেছিলেন। এঁদের আবেগ ছিল সেই অভিজ্ঞতার নিকটে সংগৃহীত যেখানে মেধা ও বেদনা ছিল পরস্পরস্পর্শী। সেই সময়ের অন্যতম অগ্রণী কবি উৎপলকুমার বসু-র লেখা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট এক-একটি পদান্বয় অনুধাবন করতে গেলে মনে হতে পারত, এ বুঝি 'প্ল্যানশেট'-এর লক্ষণাক্রান্ত, যেন অতিশায়ী আত্মার সঙ্গে কথোপকথনের শ্রুতিলিখন। সৌভাগ্যত, বাংলা ভাষায় বিশ্বকবিতার একটি সংগ্রহ সাজিয়ে তুলতে গিয়ে—সহযোগী ছিলেন শঙ্খ ঘোষ—ঠাহর করতে পেরেছিলাম উৎপল কীভাবে বিশ্বশিল্পের (কবিতা ঃ ছবি : গান) উত্তরাধিকারকে সচেতনভাবে তাঁর ভাষাশিল্পে কাজে লাগাচ্ছেন। ঐ সময়ে আমাকে অসংখ্য চিঠি লিখে নিজের এক-একটি তর্জমাকে তিনি নাকচ করে দিচ্ছিলেন এবং তাঁর ঐ স্ববিবেকী সৃষ্টির প্রবাহ, বলা বাহুল্য, আমাকে মুগ্ধ করেছে। পরবর্তী-কালে যখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে (২৬/২৭ এপ্রিল ১৯৮৮) 'কবিতা ও কবিকথা' শীর্ষক প্রদর্শনীর আয়োজন করি, তখন আমার সময়ের আরো কয়েকজন উজ্জ্বল স্রষ্টার খসড়া ভালো ক'রে দেখবার ও দেখাবার সুযোগ পেয়েছিলাম। ঐসব প্রকীর্ণ স্বরলেখমালায় উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে আত্মতৃপ্তির অপূর্ব অনটন।* বিষ্ণু দে তাঁর চিঠির শেষে যাকে 'প্রথম আরম্ভ' ব'লে চিহ্নিত

---

* এখানে শুধুমাত্র কাটাকুটি-লাঞ্ছিত পাণ্ডুলিপির পরাক্রমের কথা সগৌরবে বলতে চাইনা। সৃজনী প্রক্রিয়ায় সচেতনতার ভূমিকা যে অপরিহার্য, সেটাই বক্তব্য। উল্লিখিত ঐ প্রদর্শনীতে জীবনানন্দের একটি আপাত-মাঝারি কবিতার খসড়া উপস্থাপিত করেছিলাম। এই কবি সম্পর্কে এক মহলে এজাতীয় অনুযোগ এখনো অপ্রচল নয় যে ছন্দ তথা শব্দশিল্প সম্পর্কে তিনি

করেছেন সেই ধরনের নানান্ সূচনা ও তাদের অন্তরালবর্তী আরো অনেক সূচনার অনুক্রম ঐ সমস্ত পাণ্ডুলিপিতে উচ্চারিত হয়ে আছে। এঁদের মধ্যে অনেকেই সেদিন তাঁদের এক-একটি দিগন্ত প্রসারিত করে নিতে চেয়েছিলেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চূড়ান্ত অভিজ্ঞানপত্র অর্জন করে দেশান্তরে পাড়ি দিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে নতুন শক্তি আহরণ করে এনেছিলেন। শঙ্খ ঘোষ, দীপক মজুমদার, প্রণবেন্দু—এঁরাও সবাই (শেষোক্ত দুজন তুলনাশ্রিত সাহিত্যের পাঠ শেষ করে) সেদিন ভাষার স্বদেশ ও বিশ্বদেশের দ্বৈতাদ্বৈতের টানে ছুটে গিয়েছিলেন নতুন দেশে। যদিও হয়তো কখনো-কখনো কোনো-না-কোনো ব্যক্তির উপলক্ষ সেই সব অভিযাত্রায় মিশে

তেমন নাকি সজাগ ছিলেন না। প্রদর্শিত কবিতাটির প্রথম স্তবকের মূল পাঠ ও অন্তিম রূপান্তরের দিকে দুবার তাকালে সেই অভিযোগের ভিত্তি টলে যাবে।

শেষ পাঠ ঃ

> সন্ধ্যা হয়—চারিদিকে শান্ত নীরবতা
> খড় মুখে নিয়ে এক শালিখ যেতেছে উড়ে চুপে ;
> গোরুর গাড়িটি যায় মেঠো পথ বেয়ে ধীরে-ধীরে
> আঙিনা ভরিয়া আছে সোনালি খড়ের ঘন স্তূপে

প্রথম পাঠ ঃ

> সন্ধ্যা হয়—চারিদিকে মৃদু নীরবতা
> খড়কুটা মুখে নিয়ে এক শালিখ যেতেছে উড়ে চুপে
> গোরুর গাড়িটি যায় মেঠো পথ বেয়ে ধীরে (ধীরে)
> আঙিনা ভরিয়া আছে সোনালি খড়ের স্তূপে

পাঠভেদের কোলে অরণ্যময়তা এখানে নেই। কিন্তু একথা না মেনে উপায় নেই যে 'মৃদু' বিশেষণের পরিবর্তে যে-মুহূর্তে 'শান্ত' শব্দটি এল, কবিতার অন্তঃশরীরে বৈপ্লবিকতা সাধিত হয়ে গেল। কে না জানে জীবনানন্দের কবিতায় 'শান্ত' কতো বিপজ্জনক একটি শব্দ। দ্বিতীয় পংক্তিতে বর্জিত হলো 'কুটা', আঁটো হয়ে এল পয়ারের আয়তন। তৃতীয় পংক্তিতে সীমান্তিক বন্ধনীমোচন এবং সর্বশেষ ছত্রে 'ঘন' বিশেষণের সংযোজনও পয়ারের কাছে কবির একটি সুভদ্র আনুগত্য সূচিত করছে।

পঞ্চাশের কবিদের কাছেও আমরা—যেমন পরবর্তী দু-তিনটি পর্বের পরিণত প্রস্বর-প্রণেতাদের কাছ থেকেও—স্বানুভূতি ও বিবেচনার স্বপক্ষে এই ধরনের অনুশীলনের পর্যাপ্ত চিহ্নরেখা পেয়েছি। আধুনিক কবিতার রূপগত বিবর্তনের ইতিহাসে তাদের মূল্য নগণ্য নয়।

ছিল, তার ফলে যাত্রীর কোনো আত্মাবমাননা ঘটেনি কোথাও। সকলেই পাঠ নিতে চেয়েছিলেন, বৃহত্তর অর্থে ঘরানা-বদলের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে, উৎপল একদিন অতিথি-শ্রোতা হিসেবে সুধীন্দ্রনাথের ক্লাস করতে এসেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ সেদিন ক্লাস নিতে আসেন নি, তাই ফিরে যাওয়ার মুখে তিনি রীতিমতো সন্তাপ প্রকাশ করেছিলেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো প্রতিভাও সেদিন তুলনাশ্রিত সাহিত্যের শিক্ষার্থী হয়ে শিখিয়েছিলেন, কবিকে তাঁর জীবদ্দশায় অহরহ পাঠ দিতে হবে।

এঁরা প্রত্যেকেই, মনে রাখতে হবে, শুধু স্রষ্টাই নন্, উঁচু দরের অনুবাদকও। **অনুবাদকের কাজ প্রারব্ধ ও পুরুষকারের মধ্যে একটি সংগত সম্পর্ক রচনা।** এই কাজে আমার পর্বাঙ্গের অধিকাংশ কবি শিক্ষণীয় উদাহরণ স্থাপন করেছেন, একথা বলতে পেরে আমার অহংকারের সীমা নেই। একই নিশ্বাসে একথাও বলতে চাই সৃষ্টি ও ভাষান্তরের মধ্যে—এখানে 'ভাষান্তর' শব্দটিকে বৃহত্তম তাৎপর্যে জর্জরিত করতে আমার এতটুকু লজ্জা নেই—কোনো গুণগত ব্যবধান মেনে নিতে একেবারেই রাজি নই আমি।

একথা বলার উদ্দেশ্য, **পরিগ্রহণ ও সৃজনের ভিতরে একটি অবিচ্ছেদ্য অন্তরঙ্গতা বিদ্যমান।** আজকের বাংলা কবিতার দিকে তাকালে অন্যোন্য এই প্রাণময় ও জঙ্গম টানাপোড়েন আমি সর্বত্র খুব স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিনা, একথাও এইসঙ্গে বলতে চাই। সমাজতাত্ত্বিকের চোখে আমার এই দ্বিধান্বিত মূল্যাংকণের অক্ষমতা এভাবে নির্ণীত হতে পারে: এই যুগপর্বের 'সামাজিক কার্যকারণপুঞ্জ ও বাস্তবতার নির্মিতি'র ধরনটিকে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। আমি এরকম সম্ভাব্য অপবাদ এই মর্মে অগ্রাহ্য করতে চাই যে বাংলা ভাষায় আজ যাঁরাই কবিতা লিখছেন তাঁদের সবার ভিতরেই—তাঁদের এক-একজন যতোই ভাবাপিত বা পরিপার্শ্বমুখর হোন না কেন—সমাজের এই মুহূর্তের বিশেষ চেহারা অধ্যয়ন বা অনুশীলনের বিভাব। সমস্যাটা সেখানে নয়। যাকে পশ্চিমের পরিভাষায় Literaturbetrieb বা সাহিত্যসংস্থান বলা হয় আমাদের অঞ্চলে আজ তারি অনুরূপ একটা ধরন দাঁড়িয়ে গিয়েছে, সেখানেই বোধহয় আসল ঝামেলা। গত শতকের গোড়ার দিকে—নবীনচন্দ্র সেন তাঁর মজাদার আত্মজীবনীতে তার বিশদ্ পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন—সামাজিক পরিস্থিতির চাপে 'খণ্ড কবিতা' ব'লে একরকম রফানিষ্পত্তির পথে কবিরা পা বাড়িয়েছিলেন। সাম্প্রতিক বাংলা লিরিক কবিতার বৃহদংশে এরি পুনরাবর্তনের অকপট প্রয়াস চোখে পড়ছে। আমাদের রেডিয়োতে নিত্য-নৈমিত্তিক প্রভাতপ্রহরের রবীন্দ্রসংগীত যেমন সহৃদয়জনোচিত বিনোদনের একটি প্যাটার্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, সাধারণভাবে দেখতে গেলে এই মুহূর্তের বাংলা পদ্যপ্রস্তাবগুলির ক্ষেত্রেও সেইরকম জৈব উদ্যোগের একটি একাকার দৃশ্য

নজরে আসে। যে-কোনো সদ্যোজাত বঙ্গভাষাভাষীর পক্ষে তাই সুখপাঠ্য একটি শ্লোক লিখে ওঠা আজ আর তেমন দুরূহসাধ্য নয়। অদীক্ষিত পাঠকের পক্ষে এই সমস্ত রচনার যথার্থ ও অলীক অংশের মধ্যে বিভাজন যতোই দুরূহ হোক, যে-কোনো সৎ কবির কাছেই এর আভ্যন্তর গোলমেলে উপসর্গ ধরে ফেলা সহজসাধ্য। ঈষৎ তলিয়ে দেখলেই বুঝে নেওয়া যায়, এই প্রণেতারা কোনোরকম ঝুঁকি নিতে চান না। তাঁদের হাতের কাছে রয়েছে **আচরিত হৃদয়চর্যার একটি নিরাপদ নক্‌শা।** সেটির আয়তনেই প্রধানত চলেছে পরিমিত শিল্পায়নের খেলা। কবিতার দ্বারা কোনোদিনই সমাজের কাঠামো বদলানো যায় না, কিন্তু সীমাবদ্ধ এই কৌম পরিসরের মধ্যে আমাদের যাবতীয় আবেগের অপব্যয় প্রতিবেশের স্নায়ব শরীরে স্বভাবতই কোনো প্রাণিধানযোগ্য অভিঘাত রচনা করে উঠতে পারছে না। এটাই আক্ষেপের বিষয় হয়তো।

প্রশ্নটা তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে, আপাতত নতুনতর মাধ্যমের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর সান্নিধ্যের এবং কবিতায় তার বৈপ্লবিক অভিক্ষেপের। এরকম কয়েকটি দৃষ্টান্তও কিছু দেখা যাচ্ছে। 'দূরত্ব' নামক কথাচিত্র যিনি নির্মান করেছেন, প্রথমেই সেই কবিকে এই সূত্রে নন্দিত করি। তরুণতমদের মধ্যে আরো কয়েকজনকে দেখতে পাচ্ছি যাঁরা ছবি / অভিনয় / সমালোচনা / গদ্যকল্প ইত্যাদি নানাবিধ মাধ্যমের সম্ভাবনা যাচাই করে নিয়ে কবিতার সঙ্গে তাদের অন্তর্বর্তী অধিত্যকার ব্যবধান ঘুচিয়ে দিতে চাইছেন। এঁরা অনুভব করতে পেরেছেন, কবিতা রচনা শুধুমাত্র অপ্রাসঙ্গিক অর্থে কোনো শীর্ণ সাম্প্রদায়িক বিলাসিতার নামান্তর নয়।

অনুলেখ

'আজকালে'র বন্ধুরা আমার কাছে প্রজন্মশোভন অনুযোগ তুলেছেন, 'তিরিশ দশকের পর সে অর্থে বাংলা কবিতায় কোনো পরিবর্তনই সূচিত হয়নি।' আশা করছি আমার স্বগতসন্দর্ভে এই সংশয়ের একটি অংশের সঙ্গে মোকাবিলা চেষ্টা করেছি। পরিবর্তন নানভাবেই সূচিত হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহের সুযোগ নেই। তবে এই সব পরিবর্তনের পরম্পরা এক-একটি বলয়ের মধ্যে আধারিত হয়ে আজ ঘুরপাক খেয়ে মরছে, এই অবলোকনও অবান্তর অথবা মিথ্যে নয়। **অর্জন ও সৃজনের নিরন্তর সামীপ্যময়তায় এই সংকটের অবসান এবং আরেক অধ্যায়ের প্রস্তাবনা সম্ভব ব'লে মনে হয়।** তার বদলে সুবিধাজনক শ্রোতার দিকে তাকিয়ে শুধুমাত্র সপ্রতিভ আত্মখননের খেলা কোনো উত্তরণের স্বরলিপি কখনোই আমাদের বাৎলে দেবে না। আপনাদের আরেকটি শুভেচ্ছাবিদ্ধ প্রশ্নের ('এসময়ে কবিতা কীরকম লেখা

হয়ে উঠতে পারত বিস্তারিতভাবে সেসম্পর্কে আমাদের জানান' / নৈহাটি / ১১. ১১. ৭৮) কোনো আশুতোষ নিরসন আমার কর্তব্যর বহির্ভূত ব্যাপার। সেই দক্ষযজ্ঞে একজন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সিদ্ধকাম হতে পারেন।' বাংলা কবিতার সবসময়ের দৃপ্ত আনন্দের বিষয়, আমাদের মধ্যে কোনো সুরেশচন্দ্র কিংবা মোহিতলাল নেই। এখন, এখনই, কবিকে তাঁর নিয়তির সঙ্গে নির্মমরকম বোঝাপড়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। নইলে, কে জানে, কখন আবার কোত্থেকে কোন্ মূকবধির সেন্সরের বিধিনিষেধ এসে জুটবে সত্তা ও শিল্পের অনন্ত মুক্তির চত্বরে!

প্রতীতি ও সুন্দর

একটি কবিতা লেখা হবে, তারজন্যে চতুর্দিকে তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছিল ; বজ্রবিদ্যুৎ ঝড় একযোগে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। নির্মীয়মান সেই কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে আমরা দেখতে পাই মুক্তিযজ্ঞের অগ্নিহোত্র একদল তরুণ বেপরোয়া শ্লোগান তুলে মিছিলবন্ধ হয়ে এগিয়ে চলেছে, নতুন এক পৃথিবীর দিকে তাদের মৃত্যুত্তীর্ণ অভিযাত্রা, একটি কবিতা লেখা হয় তার জন্যে। এতক্ষণে আমরা ধরতে পারলাম, কবিতার জন্যে বিশ্বসমগ্র ঘটছে না, কবিতা বস্তুত আপেক্ষিক, কালান্তরের মানুষের একটি মাধ্যম মাত্র।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই প্রতীতিদৃপ্ত প্রকল্পের প্রায় একযুগ পরে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা একটি কবিতায় দেখছি মাধ্যাকর্ষ কবিতারই দিকে। কবি আমাদের ন'লাইনের একটি প্রবহমাণ মন্দ্রে (সপ্তম পংক্তির শেষের পূর্ণচ্ছেদ আসলে একটি নান্দনিক প্রতিভাস, ওখানে সেমিকোলন বা কমা বসালে ক্ষতি ছিলনা তেমন) এই মর্মে বিশ্বাস করাতে পেরেছেন, শুধু কবিতার জন্য নশ্বর মানুষের গোটা অস্তিত্বের তাৎপর্য, নারী ও সেই শিল্পের মাত্র-একটি নৈবেদ্য। মনুষ্যত্ব, মানবজীন, এ সমস্তই তার নিছক উপচার।

এই দুটি কবিতাই কবিতা-প্রেমিকদের কণ্ঠস্থ এবং আপাত দৃষ্টিতে পরস্পরকে যেন ছুঁয়ে আছে। কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টিপাতে বোঝা যায় তাদের মধ্যে সাদৃশ্যের চেয়ে ফারাকটাই বেশি। প্রথম কবিতা থেকে পরবর্তী কবিতার সঞ্চারপথে বাংলা কবিতার কেন্দ্রীয় মাত্রা কতো বদলে গিয়েছে। তফাৎটা, একটু বড়োমাপে দেখলে, যেন টলেমি ও কোপার্নিকাসের দুটি স্বতন্ত্র বিশ্ব ধারণার মতো : টলেমির প্রত্যয়ে এই পৃথিবীই ছিল তাকে ঘিরে আবর্তমান সূর্য-গ্রহ-তারার কেন্দ্র, আর কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) আমাদের দ্ব্যর্থলেশশূন্য ভাষায় জানালেন এই পৃথিবী সুদ্ধ যাবতীয় গ্রহ নক্ষত্র, প্রকৃত প্রস্তাবে, সূর্যকে

ঘিরেই পরিক্রমারত। এই প্রেক্ষিতে কবিতাই, এখন যাঁরা কবিতা লিখছেন, সূর্য প্রতিম হয়ে উঠেছে আজ।

তাই সুনীল যখন তাঁর কাব্যসংগ্রহের ভূমিকায় বলেন 'কোন স্থির কাব্য আদর্শ তাঁর নেই', তিনি হয়তো বলতে চান কাব্যাতিরিক্ত কোনো আদর্শ তাঁর নেই, অর্থাৎ কাব্যই তাঁর আদর্শ। 'নারীর ভিতরে নারী, রূপের ভিতরে বিষাদ, জলের মধ্যে জল-রং, গাড়ি-বারান্দার নিচে উপবাসী মানুষ, শ্রেণী বৈষম্যের বীভৎস প্রকাশ আমাকে যে কোন সময়ে বিচলিত করে—এই সব বিষয়ই কখনো প্রশ্নে, কখনো বিষাদে, কখনো ব্যাকুলতায়, চিৎকারে আমি নানারকম ভাষায় প্রকাশের চেষ্টা করি। কবিতা মানে এই সবই, এ ছাড়া আর কি'—তাঁর এই স্থাপনের ভিতরকার কথাটা খুবই স্পষ্ট, সমস্ত জগৎটাই কবিতার বিষয়ীভূত কবিতার মধ্যে সব-কিছুই অনুস্যূত হয়ে যেতে পারে, এবং তা সত্বেও কবিতা অতিশায়ী, স্বয়মপূর্ণ সত্তায় সমুজ্জ্বল।

এই কাব্যধারনায় কোনো অমূর্ত আবেগের অন্বেষা নেই। কবিতার প্রতিমা যে দস্তুরমতো শিল্পসুঠাম, সেই ব্যাপারটাই আমরা ঐ পর্যায়ে এবং আজও সুনীলের উদ্দিষ্ট কবিতায় ঠাহর করতে পেরেছি। 'তিনজন তরুণ কবি—একটি গ্রোটেস্ক' শীর্ষক তাঁর তৎকালীন একটি আট স্তবকের কবিতার কথাই ধরা যাক না কেন। 'হাওয়ার নির্দেশেই ঐ তিনজন তরুণের কথা বলা, অনির্দেশ্য তাদের সতেজ বোহেমিয়তা। এবং এই তিনটি নীলকণ্ঠের চিন্তাধারাও বেশ জটিল। কিন্তু প্রতিটি চৌপদীই সুসংবদ্ধ। শিল্পের কাছে এখানে ভাবনা উৎসর্গিত। অনেকটা একই বিভাব নিয়ে—এখানে প্রভাবের কোনো প্রশ্ন ওঠে না—কালীকৃষ্ণ গুহ-র 'চারজন বধির যুবক' কবিতাটি ('অলিন্দ,' শারদ সংকলন, ১৩৯৬) রচিত হয়েছে। প্রথমে দেখছি 'বোবা যুবকের ক্রোধে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তিনজন বধির যুবক'। এরা চারজনই 'জন্মসূত্রে বন্ধুত্বে আবদ্ধ হয়ে আছে।' ভ্রষ্ট সভ্যতার মধ্যে এরা খুব নিঃসহায় বোধ করছে, এবং সেই অসহায়তার ভিতরেই বোবা ও বধির দুই মেরুর মধ্যেও একরকম নান্দনিক সমঝোওতা তৈরী হয়ে গিয়েছে। এবং সেই সমঝোওতার মাধ্যমেই নির্মিত হয়েছে একটি পরিণামী সুন্দর মুহূর্ত : 'আসন্ন বসন্তকাল ছেয়েছে তাদের।' স্তবকসম্মিতি বা সুপরিকল্পিত প্যাটার্ণের দিকে না গিয়েও ক্ষণসাম্প্রতে উদ্যত ঐ অন্তিম, প্রায় বিচ্ছিন্ন পংক্তির বিচ্ছুরণে এখানে রণিত হলো আরেকরকম সৌন্দর্য।

এভাবেই জীবন, সমাজ বা সভ্যতার সাত-সতেরো প্রত্যয় বা মূল্যবোধের প্রতি অবমাননা বা অতিরিক্ত স্বীকৃতি ছাড়াই এখন কবিতা লেখা হচ্ছে। এক-এক দশকে এক-এক মতামতের প্রস্থানভূমিকায় এক-একজন কবি লিখতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু এখন, কবিতায় এই মোহনামুহূর্তে তাদের প্রায় সবারই এষণা এই দিকেই চলেছে। ব্যক্তিজীবনে একটি বিশেষ প্রগতিশীলিত আদর্শবাদে

বিশ্বাসী সিদ্ধেশ্বর সেন কিংবা রক্ত-মজ্জায় শিল্পের রূপশুদ্ধি অক্ষুন্ন রাখার প্রতিজ্ঞায় একব্রতী দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় কেউই আজ কবিতাকে পূর্বধার্য ধ্যানধারণার শামিল করে দেখতে চাইছেন না। কোনো শ্রদ্ধেয় শুভার্থী যদি শ্রীঅরবিন্দের দোহাই তুলে আজকের কবিতায় কেন 'সক্রিয় বীক্ষা' (effective vision) বা অধ্যাত্ম চরিত্র (spiritual character) ব'লে কিছু নেই সেই সূত্রে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন, তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া চলে, ঐ সাধক কবিতার বীক্ষার কার্যকারিতা প্রসঙ্গে 'মনস্তাত্ত্বিক (psychic) চারিত্রের কথাও বলেছেন। উদাহরণত, সুভাষ ঘোষাল এক অর্থে অরবিন্দপন্থী হিসেবেই আধ্যাত্মিক কবিতা লিখেছেন এবং এখন তিনি, ঐ মার্গ থেকে সরে না গিয়েও, আত্মিক-মনস্তাত্ত্বিক ঝোঁকে কবিতা লিখছেন। এরকম আত্মিক-মনস্তাত্ত্বিক প্রবর্তনা থেকেই, ধ্রুপদী 'নীলাম্বরী'র আঙ্গিকপ্রেমী কবি দেবীপ্রসাদ এখন এ ধরনের বিদ্যুৎস্পৃষ্ট লহরী প্রণয়ন করতে পারেন ঃ

> কাগ ঝটাপটি করছে হরপের কালো ছত্রখান করে। কাঁটাবেড়ার
> ফাঁকে ফাঁকে লোহা আর খোয়া আর কিউ-বাঁধা লোকের পায়ে পায়ে
> আঁত খুলে ভেসে ওঠে হাজা-খাওয়া মাটি,
> তাপ দিয়ে ঘুরে ওঠে গন্ধক বারুদ। ('জিগীষা', কার্তিক ১৩৯৬)

আমার কাছে এই ক্ষিপ্র পংক্তিন্যাসের আবেদন তাঁর পূর্ববর্তী কবিতাবলির চেয়েও অভিঘাতময়। এখানেও কি অণুবীক্ষণের কারসাজিতে এক ধরণের বীক্ষা উৎসারিত হয়ে গেল না সামাজিক স্তরে অনুশীলিত একায়তনিক নানারকম মতবাদের চেয়েও যার মহিমা কোনো অংশেই কম নয়? এই কবিতার নাম 'পূর্ণ"। কিন্তু কোন্ পূর্ণতা কবির ঈপ্সিত? প্রায় নিজের ও পাঠকদের অগোচরেই দ্বিতীয় স্তবকে কবি যেন অনামিকা-আঙুল দিয়ে সেই পরমার্থকে আলতো ছুঁয়ে বলে উঠেছেন ঃ 'পূর্ণ'! এক মিনিটের পূর্ণ'।' এখানে আমরা মনস্তত্ত্ব-ভিত্তিক যে-নন্দনতত্ত্বের আভাস পেয়ে যাচ্ছি, সেদিকেই বুঝি সাম্প্রতকালের কবিতার অভিমুখিতা।

শিল্প বা দর্শনের দিক থেকে এবংবিধ দৃগ্‌ভঙ্গির দ্যোতনা হয়তো কিছু নতুন নয়। হিউম প্রমুখ অনেক দার্শনিকের বক্তব্যেই তার পূর্বাভাস রয়ে গিয়েছে। কিংবা 'কবি' ('বিভাব,' বিশেষ শারদীয় সংখ্যা ৮৬) নামক দৃপ্ত কবিতায় সুধেন্দু মল্লিক যখন উচ্চারণ করেন 'আজ তোমার স্খলিত চরিত্র গরীব কবি / আকাশ আর সমুদ্রের সেতু হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। / তার মুখে পড়েছে সূর্যাস্তের আলো। কবি!', তার তাত্ত্বিক পূর্বপট নিশ্চয়ই কীটসীয় 'অ-নিয়ন্ত্রিত শক্তিসামর্থ্য'র (negative capability) সেই প্রবর্তনায় নিহিত। যা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, প্রচলিত অর্থে কবির (সামাজিক) কোনো চরিত্র নেই, সেইটেই কবিচরিত্র। কিন্তু সুধেন্দু তাঁর নিবিষ্ট প্রস্বরে পরিচিত সেই ঘরানাকেই নতুন করে বাজিয়ে দেন, সেখানেই তাঁর মৌলতা।

ব্যক্তিত্বময় এই কবি আস্তিক্যবাদী, কিন্তু সেই সত্য এখানে কবিতার চরিত্রে করক্ষেপ করছে না, কবিতাকে অন্যনিরপেক্ষ স্বাধীনতার দিকে বরং এগিয়ে যেতে দিচ্ছে।

কবিতার ক্রমমুক্তি এখন এমন একটি স্বতঃসিদ্ধ ঘটনা যাকে মেনে নিতেই হবে। চরাচর এখন, এই মুহূর্তে কবিতায় কবিতার শর্তে ঝুঁকে এসেছে। এমন কি অলংকারশাস্ত্রের কাব্যানুশাসন দিয়ে তার উপর সেন্সর জারি করা চলবে না। কোন স্থায়ী ভাব নিয়ে একটি কবিতা লেখা হবে অথবা কোন ছন্দে তার বিন্যাস ঘটবে এসব বিবেচনার দিন বিদায়োন্মুখ। অলংকারশাস্ত্রে পারঙ্গম আমার বন্ধু দীপংকর দাশগুপ্ত ঐ শাস্ত্রে সমকক্ষ তাঁর কন্যা মৌ (জ. ১৯৬৮) 'অলিন্দ'র পূর্বোল্লিখিত সংখ্যায় প্রকাশিত 'মথ' দীর্ঘায়ত কবিতায় আখ্যায়িকা ও লীরিক জড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, গদ্যবন্ধ ও বিভিন্ন ছন্দ দ্রুতগ তুলির টানে সমীকৃত করে যে ভাবে মিশ্রকল্প গড়ে তুলেছেন ক'দিন আগে পর্যন্তও সেরকম দুঃসাহসিক দৃষ্টান্ত আমরা তেমন দেখিনি। ঐ কবিতায় একটির পর একটি মুহূর্তের জগৎ উন্মোচিত হয়ে চলেছে এবং তাদের দাবিতেই এমন আয়োজনের প্রাসঙ্গিকতা আছে। শেষ পর্যন্ত কবিতাটি যে তার শেষাদ্রি-চূড়ায় পৌঁছতে পারেনি, তার কারণ কবিতার একেবারে শেষ দিকে শ্রীমতী মৌ আচমকা অনেকক্ষণ ধরে, অর্থস্পৃহ পাঠকের কাছে সুবোধ্য হয়ে ওঠার তাগিদে, একটি বিশেষ বক্তব্যের কাছে কবিতার মুক্তিকে গচ্ছিত করেছেন। কিন্তু তাঁর অন্যান্য কিছু মিতায়ত কবিতায় মুক্তির বলয় আরো সার্থকভাবে তৈরি হয়েছে বলে যেন মনে হয়। প্রতিষ্ঠিতদের মধ্যে সুরজিত ঘোষ-মল্লিকা সেনগুপ্ত-মৃদুল দাশগুপ্ত থেকে শুরু করে জয়দেব বসু-বাপী সমাদ্দার-দুর্গা দত্তের কবিতায় কবিতার এই মুক্তিবোধের অনিমাসিদ্ধি ব্যাপ্ত হয়ে আছে।

ঠিক সুস্থায়ী ভাবনা বা সংস্কার নয়, সঞ্চারী প্রবণতায় আজ কবিতার প্রবাহ গতিরূপময়। একথার পরামর্শ আদপেই এরকম নয় যে এই স্রোতের দাপটে লেখা অধিকাংশ কবিতাই উত্তীর্ণ হচ্ছে। এ কথা বলার প্রণোদনা শুধু এটুকুই, সুন্দরের সন্ধানে প্রতীতি আজ আগের চেয়ে আরো নম্র হয়ে এসেছে। এরি মধ্য থেকে নতুনতর সুন্দরের প্রত্যয় জায়মান। সেই প্রক্রিয়ায় ব্যাকরণ বা প্রকরণের প্রস্তুতি সম্পন্ন ক'রে তবেই তাদের নিয়ে আরো ভাঙাচোরা করলে কোনো অসংগতি দেখিনা। সেই কাজে তরুণতম কবিদের পক্ষে পটভূমিকে আরো তনিষ্ঠভাবে জরিপ করে নিয়ে তারপর সঞ্চারীগুলিকে নিয়ে নিঃশর্ত খেলাটাই জরুরি। কিন্তু এই মুহূর্তে আরো জরুরি আর্তি বোধহয় এই যে, সাম্প্রত-কবিতার বিদগ্ধ সমালোচকেরা যে তাঁর পূর্বার্জিত তামাম বর্গ বা ক্যাটিগরিগুলি কিছুটা শমিত রেখে এই কবিতার সমালোচনার নতুন ভাষা অর্জন করে নেন। কেননা, আজ আমাদের যেটা প্রকটভাবে চোখে পড়ছে সেটা কবিতার সংকট নয়, কবিতার সমালোচনার ছন্ন দশা!

স্রোত ও শিকড় : একটি সংলাপ

শিকড় সংলাপ

কালীকৃষ্ণ ঃ···সম্প্রতি যে কথাটা আমরা আলোচনা করতাম নিজেদের মধ্যে যে 'আধুনিক কবিতা' এই শব্দবন্ধ এখনো আর ব্যবহার করা উচিত হচ্ছে কিনা। এ প্রশ্ন করার কারণ হচ্ছে যে, আমরা তো বাংলা ভাষায় বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সময় থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত অনেক কবি, অনেক ধরনের কবিতা, অনেক ভাবধারা, ব্যক্তিগত কবিতা, অবজেক্‌টিভ কবিতা, নানা ধরনের মিলেমিশে রয়েছে দেখছি···সমস্ত ব্যাপারটাকে 'আধুনিক কবিতা' বলে আর কতখানি ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে ?

অলোকরঞ্জন ঃ এই প্রশ্নটার দুটো দিক আছে। একটা হচ্ছে যে 'আধুনিক' শব্দটা প্রযোজ্য কি না, কিংবা কবিতার সঙ্গে এই লেবেলটা এখনো চলে কি না। আজ এটা একটা থিয়োরিগত প্রশ্নই বটে। এর সঙ্গে প্রযুক্তিগত প্রশ্ন ঃ যা লেখা চলছে তাকে আধুনিক বলা যাবে কি না। আমার মনে হয় এখন এই পর্বে যা লেখা হচ্ছে তাকে আমি 'আধুনিক' ছাড়া অন্য কোনো অভিধায় চিহ্নিত করতে পারছি না যেহেতু আর কোনো বিকল্প পাচ্ছি না। এখন এটা ঠিকই যে আধুনিক শব্দের দ্যোতনা অনেক পাল্টেছে। রঙ্গলাল যখন এই শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, বোদলেয়রের সময় যখন এই শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছিল, কল্লোল যুগে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অথবা চল্লিশের দশকে যে অর্থে ব্যবহার ঘটেছে, এই সমস্ত অনুষঙ্গের সমবায়ে এই শব্দটার ভেতরে ভেতরে আমরা একটা বিবর্তমান ব্যাপার লক্ষ্য করি···এই শব্দটা আমার মনে হয় মূলত জঙ্গম থেকে গেছে। এবং যেমন প্রেমচন্দ ভারতীয় সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এটা খুব মোটামুটি ব্যাপার বলেছেন, গ্রাহ্য হয়তো নয় তবু

সংজ্ঞাটি আমার খুব ভাল লাগে—যা কিছু ভারতবর্ষে আজকে লেখা হচ্ছে তাই ভারতীয় সাহিত্য। ঠিক তেমনি আমি বলব যে এখন যা লেখা হচ্ছে তাকে আমি আধুনিক সাহিত্য বলতে পারি এই অর্থে যে যদিও, ব্যক্তিগত রচনা বা অন্যান্য ভাবগত রচনা এমন কিছু লেখা হচ্ছে যা আধুনিকতার মূল সূত্রের হয়তো কখনো কখনো পরিপন্থী। কিন্তু আমার এই অর্থে মনে হয় আমরা যে সময় যাপন করছি কোনো না কোনোভাবে কবিরা তারই অংশীদার হিসেবে নিজেদের অভিজ্ঞতা বিচ্ছুরিত হতে দিচ্ছেন। কেউ কেউ তাই 'একালের কবিতা' বা 'সাম্প্রতিক কবিতা' বলে এই কবিতাগুলিকে চিহ্নিত করছেন। মারাঠি ভাষায় একটা খুব সুবিধা আছে যেমন সাম্প্রতিক এবং সমকালীন সাম্প্রতিক এবং আধুনিক এই শব্দগুলি অনেক সময় পরস্পরস্পর্শী হয়েছে। আমাদের এই সুবিধে নেই। আমরা সাম্প্রতিক শব্দটিকে ভাবগত একটা তাৎপর্য দেওয়ার চেয়ে কালগত তাৎপর্য বেশি দিয়েছি। সেখানে আমরা যদি 'আধুনিক' শব্দটাকে ভাবগত এবং রূপগত এই দুটি দিকের একটা সমন্বয় হিসেবে দেখি তাহলে আমি বলব যে এই শব্দ আমাদের গ্রহণ করা ভাল, যে অর্থে ডে-ল্যুইস বা ম্যাকলিশ করেছেন, রবীন্দ্রনাথও সেই দিকে গিয়েছেন। চিরদিনের আধুনিকতা অর্থাৎ এখন যা লেখা হচ্ছে এর মধ্যে থেকে নিশ্চয়ই একটা বাছাই হয়ে উঠছে। এই বাছাই আরো যখন হতে থাকবে উত্তরকালে তখনই বোঝা যাবে যে এর কতোটা অংশ বিয়োগফল হিসেবে আধুনিক, যথার্থভাবে আধুনিক থেকে গেছে…আমি এখনও পর্যন্ত এই শব্দের কোনো প্রতিকল্প পাচ্ছি না যার সাহায্যে আমি বুঝিয়ে দিতে পারি এই দ্বন্দ্ববিধুর যুগে যা রচিত হচ্ছে, যেখানে মধ্যযুগের সেই অখণ্ড উত্তরাধিকারটা আর নেই, যেখানে আমরা প্রত্যেকেই খণ্ড বিশ্ব কিছু তৈরি করছি যে অর্থে শিলার সেই প্রাকৃত এবং ভাবার্পিত কবিতায় একটা পার্থক্য করেছিলেন—আগে এরকম পার্থক্য করা দরকার, অবজেকটিভ এবং সাবজেকটিভ নাইভ এবং সেন্টিমেন্টাল সেই জায়গায় প্রাগ আধুনিক, আধুনিক। এই শব্দগুলো এখনো ব্যবহার করা হচ্ছে কিন্তু আমাদের একটু সতর্ক হতে হবে যে এই ব্যাপারে অন্তত একটি কালগত নিশানা…প্রস্থানভূমিটাকে বেঁধে দেওয়া, যখন আমি বলছি সুধীন্দ্রনাথ আধুনিক শব্দটিকে ব্যবহার করেন এবং তারাপদ মুখোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা কবিতা শব্দবন্ধ ব্যবহার করেও ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়ান। তখন আমাদের বলতেই হবে, 'না, থামো সুন্দর মুহূর্ত' ইত্যাদি।

কালীকৃষ্ণ : …এক সময় এই শব্দ ব্যবহার করা ছাড়া আমাদের উপায় ছিলনা যেহেতু রবীন্দ্র-অনুসারী কবিরা তখনও যে ধরনের কবিতা লিখছিলেন

এবং তার পাশাপাশি মারাত্মক অন্যধরণের কবিতাও জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে এঁরা এমনভাবে লিখছিলেন যখন এঁদের কবিতা 'আধুনিক কবিতা' এটা বলে আমাদের বোঝানো ছাড়া উপায় ছিল না আমরা কোন কবিতার কথা ভাবছি···কেননা তখন পাশাপাশি রবীন্দ্র-অনুসারী কবিতা একধরনের বলা যায় কিছুটা অক্ষম কবিদেরই হাতে চলছিল। এখন অমাদের এই ৪০/৫০ বছর কেটে যাওয়ার পর, এখন আর সেই-রকমভাবে কন্‌ফিউজ করবার কোনো সুযোগ নেই এবং যেহেতু সুযোগ নেই সেইজন্য আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে 'আধুনিক কবিতা'র জায়গায় আমরা শুধু 'কবিতা'-ই বলি, এবং এখনো সেই সমস্ত প্রবলেমু রয়েছে অর্থাৎ কারো কবিতা র‍্যোমান্টিক, কারো কবিতা অ্যান্টি-রোম্যান্টিক, কারো কবিতা সাবজেকটিভ্‌, কারো কবিতা অবজেকটিভ অর্থাৎ আগে যে সমস্যাগুলো ছিল সেই সমস্যাগুলো এখনো এসে যাচ্ছে। সেইজন্যে এই সমস্ত টার্মগুলো ব্যবহার করা ছাড়া আমাদের কোনো উপায় থাকছে না। শুধুমাত্র 'আধুনিক' বলে আমরা সমস্ত ব্যাপারটাকে বোঝাতে পারছি না। এই জন্য আমাদের 'আধুনিক গান'-এর মতো বিশেষ করে 'আধুনিক কবিতা' ব্যবহার করতে মাঝে মাঝে সংকোচ হয়।

অলোকরঞ্জন : আমি জানি আমাদের হয়তো মাঝে মাঝে একটুকু সংহত হতে হবে। এখানে আমার একটা কথা আছে, যেমন, আমরা যদি লোকসংগীত এই শব্দটাকে নিই বা 'ঢোকুরা শিল্প' তার যে একটা ধারা চলছে সেই ধারাটাকে, মোটামুটি সেই ধরনের একটি ধারাকে আমরা চিহ্নিত করছি। 'আধুনিক কবিতা,' ধরুন 'আধুনিক গান,' শব্দটা এখনো চলছে। 'রম্যগীতি' শব্দটি এখনই ঝরে গেছে এটা লক্ষ্য করছি। 'আধুনিক' গান এখনো চলছে···ভাগ্যিস অতি আধুনিক শব্দটা এখন বাদ গেছে···এখন আমরা লক্ষ্য করছি এর আগেও তো যে ভাগগুলি ছিল, বর্গীকরণগুলি ছিল···এজ্‌রা পাউন্ড একরকম লিখছেন, ইয়েট্‌স আবার একরকম লিখছেন···এগুলো ছিল···সেই তারই মধ্য দিয়ে আমরা এখন একটা মানদণ্ড প্রয়োগ করতে পারি যে যদি আমাদের সময়ের কারো-কারো কবিতায় এই ব্যাপারটা ঘটে যায় এবং যেটা মাঝে মাঝে ঘটছে হয়তো—যে আধুনিক মাত্রা এবং মনন আসে তাকে আমরা যদি প্রাগাধুনিক বা অনাধুনিক বলে শনাক্ত করি—তাতে একটা সুবিধে আসে—সেই সুবিধা হলো তাতে আমরা—সমালোচনার একটা শর্ত-কোণ ব্যবহার করলাম কিন্তু এর অভাবে আমরা যদি এই মুহূর্তেই, আমি জানিনা সে সময় এসেছে কিনা—তার অভিধায় অন্তর্গত করি তাহলে কিন্তু এখন যা লেখা হচ্ছে তাকে একটা চিরায়ত সম্মান দিয়ে দেওয়া হয়। কবিতা বললে কিন্তু আমার

মনে হয় অনেক সময় পদ্যকল্প রচনা-কেও একটা গুরুগম্ভীর মর্যাদা দিয়ে দেওয়া হয়। তাহলে মনে হয় যে চিরায়ত ধারায় দান্তে, গ্যোয়েটে কিংবা হাইনে কিংবা হ্যোল্ডারলিন, কিংবা মধুসূদন কিংবা রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দ লিখে এসেছেন সেই ধারার মধ্যে বোধ হয় এখন যেটা লেখা হচ্ছে সেটা অন্তর্গত হয়ে গেল। কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা 'আধুনিক কবিতা' বলছি সেই মুহূর্তে অন্তত বড় একটা বিরোধাভাসের চেহারা আমরা পাচ্ছি। আমার মনে হয় প্রতিটি শব্দই সমালোচনার একটা ধরিয়ে দেওয়ার সূত্র মাত্র। কিন্তু আমারও নিশ্চয় একটা পক্ষপাত আছে একে 'কবিতা' বলার···অন্তত আজকে এই চল্লিশের যুগের কবিতা যা এখন বুঝতে পারছি যা থেকে গেছে তাকে যদি আমরা বলি, যেমন অরুণকুমার সরকারের কোনো-কোনো কবিতা আমরা যদি ধরি যা থেকে গেছে···তাঁর সব কবিতা নয় কোনো কোনো কবিতা থেকে গেছে···সেই কবিতাগুলি যদি আধুনিক বলি এবং যে কবিতা থাকেনি তাকে আমরা 'কবিতা' বলে চিহ্নিত করতে পারছি কিনা সে প্রশ্নও আসবে···কাজেই এই চিহ্নায়ন সমালোচনার···সমালোচকের কতগুলো বর্গের সুবিধের জন্য এইগুলি—যেমন দশক বিভাগের ব্যাপারটাও আর কি।

কালীকৃষ্ণ : তাহলে বলছেন এর প্রয়োজন আছে···

অলোকরঞ্জন : অন্যতর উপায় এই মুহূর্তে নেই আমাদের···

কালীকৃষ্ণ : আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা এই প্রশ্ন থেকে অন্য প্রশ্নে আসি। আমাদের এখনকার প্রশ্ন হচ্ছে, এক ধরনের পারসোনাল পোয়েট্রি যাকে অনেকে প্রাইভেট পোয়েট্রি বলেন বা 'ব্যক্তিগত কবিতা' যদি বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—এই কবিতা লেখার প্রতি একটা মারাত্মক ধরনের ঝোঁক দেখা যাচ্ছে···বাংলা কবিতায় আমরা অন্তত কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছি...আপনারা লক্ষ্য করেছেন কি না জানি না—বিদেশেও আছে কি না জানি না···আমি তো বিদেশী কবিতা ততোখানি পড়ি না···তা এটা কি—এটার পক্ষে এবং বিপক্ষে দু'ধরনের দাবী আছে—একদিকের দাবিটা হচ্ছে এই যে এই কবিতা আরও মর্মান্তিক-ভাবে একটা উপলব্ধির জগতে নিয়ে যায় এবং নিজের মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারটা থাকে। আর এর বিরুদ্ধে যেটা যুক্তি সেটা হচ্ছে যে এই কবিতায় কবির দেখার পরিসরকে কমিয়ে এনে এনে একেবারে ব্যক্তিগত জগতে চলে যাচ্ছে এবং কবিতার কাজ করার সীমাটাকে কমিয়ে আনছে এবং এটা মারাত্মক ক্ষতিকারক হচ্ছে। এ ব্যাপারে একটু কিছু বলুন।

অলোকরঞ্জন : কবি-অভিজ্ঞতার প্রধান ভিত্তিই তো ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা। এখন আমাদের দেখতে হচ্ছে এই, যেটা আমাদের অলংকারশাস্ত্রের একেবারে

ক্লিশে-কলুষিত দুটো শব্দ ব্যবহার করছি…ভাব কোথায় রস-এ পরিণত হচ্ছে। এবং…কথাটা প্রায় অ্যাকাডেমিক শোনাচ্ছে কিন্তু যেখানে হচ্ছে না সেখানে সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভার যদি ঝরিয়ে না দেওয়া যায় তাহলে কবিতার উত্তরণ হতে পারে না। এখন এটা খুবই সত্যি যেমন অনেক কবিতাই ব্যক্তিগত পর্যায়ে লেখা হচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত অভিব্যক্তিগত হচ্ছে না। নিশ্চয় 'ব্যক্তি' কথাটার মূল মানেই তো প্রকাশ, ব্যক্তি কথাটার মধ্যে অভিব্যক্তি কথাটা রয়েছে যে প্রকাশমান একটা সত্তা—প্রথম থেকেই সে অর্থে হয়তো, সেই দিক থেকে হয়তো, থেকে যাচ্ছে জৈব…জৈব বলতে আমি শুধুমাত্র বিশেষ ধরনের অভিজ্ঞতার বলয়ের কথা বলছি না যা মানুষ তার প্রাত্যহিক জীবনের প্রাঙ্গনে যার সঙ্গে মোকাবিলা করে। কিন্তু আমি বলছি এই অর্থে যে, যেখানে তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়…যদি প্রকাশ ঘটে যায়। আমি অধোরেখ রাখছি 'প্রকাশ' শব্দটাকে—তাহলে কোনো আপত্তি নেই। আর, তা নইলে যদি কোনো কবি শুধুমাত্র তার কতগুলি মর্জি-মুহূর্তকে আন্তর্জাতিক করে তুলতে চান বা সার্বজনীন করে তুলতে চান তাহলে আমাদের আপত্তি আছে এবং করবার জন্য অন্তত তার দৃষ্টিকোণের একটা দরকার আছে, সেইটে অনেক ক্ষেত্রেই থাকছে না। এখন বিদেশেও আমরা লক্ষ করি যেমন এনৎসেনসবার্গার বা গুন্টার গ্রাস এই কবিরা তাঁদের জীবনের বিপন্ন অভিজ্ঞতা, আনন্দের অভিজ্ঞতা, সংগ্রামের অভিজ্ঞতা আশ্চর্যভাবে ব্যবহার করেছেন কবিতায়। কিন্তু সেখানে ব্যক্তিগত ভাবাতিরেক ঝরিয়ে দিয়েছেন। আশ্চর্যভাবেই ঝরিয়ে দিয়েছেন। এইজন্য নয় যে সেটা অবৈধ, সেটা ভিত্তি। আর প্রত্যেক ভিত্তিরই একটা দুরবগাহ গোপনতা থাকে। এবং সেই গোপনতা যখন প্রকট হয় তখন যদি নান্দনিক ভিত্তিতে সেটা না হয় তাহলে সেটা অনুত্তীর্ণ হতে বাধ্য। এখন প্রশ্ন, আমার প্রশ্ন নয়…আমার অনুমান হচ্ছে এইরকম যে, এই ধরনের ব্যক্তিগত কবিতা যা আমাদের এই মুহূর্তে প্রচুর লেখা হচ্ছে, যার ফলে আমার মনে হয়, কবিতার মান…ব্যক্তিগত কবিতার মান নিঃসন্দেহে ম্লান হচ্ছে। এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই…এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই কবিতাগুলি হয়ে উঠছে প্রাকৃত—প্রাকৃত, ভাবার্পিত নয়। এইটা হচ্ছে ব্যাপারটা…ঘড়ির কাঁটাটা ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি বলছি একটা সময় এসেছিল যখন এ নিয়ে খুব তর্কাতর্কি 'শতভিষা'র আগের দিকে হয়েছিল যে সেই মোহিতলালের কর্ষিত দেহাত্মবাদ এখনো কাম্য কিনা—(এক একটা 'থীম' ধ্রুবপদের মতো ঘুরে আসে) পূর্ব বাংলার বাউলদের কবিতা পশ্চিম বাংলার বাউলদের কবিতায় আগে এবং পরে, দেহাত্মবাদ এবং

দেহতত্ত্ব তো এসেইছে এবং কায়াতত্ত্ব যা চর্যাপদে ছিল সে সমস্ত এসেছে, তবে একই থীমের সঙ্গে প্রস্বরের তফাতে তো আশ্চর্যভাবেই ঘটে গেছে…এবং সেখানে আমার বক্তব্য, কবিতায় এই প্রস্বর না থাকলে যে প্রস্বর বিষয় এবং বিষয়ীকে মিলিয়ে দেয়, দ্রব ক'রে দেয় একটা মেরুমুহূর্তে সেইটে যদি না ঘটে তাহলে আমার মনে হয় আমাদের খুব দৃঢ়ভাবে বলা উচিত : আর যাই হোক তোমরা যা করছো সেটা কালোচিত নয়, কারণ কবিতার বয়স হয়েছে, সেই জায়গা থেকে সবাইকে শুরু করতে হবে। এবং সে কথাতো অনেকেই বলে গেছেন…এটা কোনো নতুন কথা নয়।

কালীকৃষ্ণ : আমার মনে হয় ব্যাপারটা একধরনের আত্মমণ্ডুকতায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছে…

অলোকরঞ্জন : এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

কালীকৃষ্ণ : এবং এর ফলে অনেক পাঠকও চাইছেন না যে শুধু মাত্র একজনের বিষাদের পেছনে ছোটা তাঁরা চাইবেন যেন তাদের চারপাশের পৃথিবীকে ঠিকভাবে দেখানো হয়…

মৃণাল : রিপ্রেজেণ্ট করে…

অলোকরঞ্জন : হ্যাঁ হ্যাঁ

কালীকৃষ্ণ : আমার মনে হচ্ছে আপনি এরকমই বলতে চান…

অলোকরঞ্জন : হ্যাঁ, তাই।

কালীকৃষ্ণ : তাহলে এই প্রশ্নের চমৎকারই উত্তর পাওয়া গেল।

মৃণাল : কবিতা নানারকমেরই লেখা হচ্ছে। আমাদের চারপাশের বর্তমান সামাজিক বৈষম্য, স্বেচ্ছাচারিতা, দমনমূলক নীতি, রাজনৈতিক সচেতনতা ইত্যাদি নানারকম প্রতিক্রিয়া থেকেও কবিতায় আহরণ করবার অনেক কিছু আছে, অনেকে তা করেছেনও হয়তো। ব্যক্তিগত কবিতার পাশাপাশি কষ্টকল্পিত কবিতা এবং স্বভাব কবিত্বময় কবিতাও ঢের লেখা হচ্ছে, দেখতে পাই। চার পাশের পৃথিবীর ছায়া তাতে কতটুকুই বা প্রতিফলিত হচ্ছে? কবিতায়, এখনকার কবিদের রচনায় বিশেষত, সেই সময়ের কথা কতটুকু থাকছে যে সময়ের মধ্য দিয়ে সে বেঁচে থাকছে, প্রতিদিন যার অস্তিত্ব বিপন্ন, কণ্ঠরুদ্ধ, বিচ্ছিন্নতার বোধে ক্লান্ত, অসহায়, পর্যুদস্ত, একনায়কত্ব আর স্বেচ্ছাচারিতার শিকার যাকে হতে হয় প্রতিমুহূর্তে, একজন প্রকৃত অর্থে সৃষ্টিশীল কবি এসব কিছুকে এড়িয়ে চলতে পারেন না কখনো (রবীন্দ্রনাথ পারেননি, ইয়েটস্ পারেননি —পারেননি জীবনানন্দ পর্যন্ত) অর্থাৎ আমার মূল প্রশ্ন সামাজিক উপকরণ বা সোশাল কনটেণ্ট তথাকথিত প্রগতিবাদী দাবি না হয়েও নান্দনিকভাবে কবিতার মধ্যে সঞ্চারিত হতে বাধ্য এরকম প্রতিক্রিয়া বা উপকরণ আপনাদের পঞ্চাশের অনেকের কবিতায়ই প্রায় দুর্লভ—এই

অভিযোগ আমি অনেকের কাছেই শুনেছি…আলাদাভাবে আপনার প্রসঙ্গেও…এ বিষয়ে কিছু বলুন।

কালীকৃষ্ণ : এইসব ব্যাপারে বেশি করে রিয়্যাকটেড হচ্ছেন যাঁরা এবং যাঁদের কবিতায় আমরা সোশাল কনটেণ্ট অনেক বেশি পরিমাণ পাচ্ছি…বা সমাজের দিকগুলো পাচ্ছি—তাদের কাছে পাচ্ছি আবার অনেকের কাছে কম পাচ্ছি দুভাবেই কবিতা হচ্ছে। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে কোন্‌টা বেশি স্বাস্থ্যকর অর্থাৎ কোন্‌টার প্রতি আমাদের সমর্থন থাকবে…

অলোকরঞ্জন : প্রশ্নগুলির বিস্তার এতো হয়েছে…আমি খুব সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি আমার বিশ্বাস আমার সমকালীনদের মধ্যে অনেকের মধ্যে তো বটেই…যখন ভিয়েৎনাম নিয়ে ব্যাপারটা শুরু হলো…যখন হো-চি-মিনকে আমাদের দেশে সত্যিই দেবায়িত করা হলো…তারপরে তো মাও-সে-তুং এলেন, এমারজেন্সি ঘটলো…এই সমস্ত পর্বের সঙ্গে আমি বিনীতভাবে যুক্ত থেকেছি…আমার ছেলেবেলায় নিশ্চয় পার্টি বলতে কমিউনিস্ট পার্টি বোঝাতো…তখন সেই যোশি-রণদিভের সময়; সে সময় আমি নিতান্ত কিশোর হিসেবে যুক্ত থেকেছি এবং এটা ঠিকই যে যখন আমি 'ডাস্‌ কাপিটাল' পড়ে উঠেছি তখন আমার মনে হয়েছে এর পুরোটাই ঠিক আমার রাস্তা নয়। খুব শ্রদ্ধেয় উদাহরণ আছে… হোল্ডারলীনের কবিতায়গোপন বিদ্রোহ ছিল—তাঁর সঙ্গে মার্কসের জানা শোনাও ছিল…কিন্তু তা সত্ত্বেও কবিতাকে একটা জায়গায় নিঃসন্দেহে আলাদা করতে হয়…যেমন কবিতা শুধুমাত্র তত্ত্বভিত্তিক হয় না, ডাইডাক্‌টিক হয় না তেমনি কবিতা অনেক সময় খুব ভালো রাজনৈতিক কবিতাও apolitical…অ-রাজনৈতিক হয়ে যায়, তাকে হতে হয়, এটা আমরা লক্ষ্য করেছি। এখন তো এরিশ ফ্রীড যিনি সব থেকে বড়ো বিশ্বের রাজনৈতিক কবি হিসেবে নন্দিত তিনি বলেন, 'একটি প্রেমের কবিতার ভিতরেও রাজনীতির ব্যাপারটা আশ্চর্যভাবে লুকিয়ে থাকতে পারে।' এখন আপনারা লক্ষ্য করবেন বিশেষ ক'রে এই জিনিসটা ঘটেছে বাংলা সাহিত্যে এমার্জেন্সির সময় থেকে যে, কবিতার একটা সামাজিক রাজনৈতিক মাত্রা খুব উচ্চারিত হয়েছে এবং আপনারা আমার বন্ধু হিসেবে বোধহয় এটা জানেন…সে সময় একমাত্র আমিই ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে একটা মোকাবিলায় নেমেছিলাম এবং সেই মোকাবিলার অনেক অভিঘাত ঘটেছে… আমার নিজের কবিতাতেও তার ফল ফলেছে বলে আমার মনে হয়। আমার 'গিলোটিনে আলপনা' থেকে বিশেষ করে আমি লক্ষ্য করি যে আমার কবিতায়…শাশ্বত হতে চাওয়া কবিতাগুলির পাশে বিশেষ করে সামাজিক অঙ্গীকারের কবিতা স্পষ্ট সেই ধারাটা চোখে আমার পড়ে, আমি যতোদূর জানি। এখন, তা

সত্ত্বেও আমি চেষ্টা করেছি আজকে সম্ভব নয় নজরুল-সুকান্তের মতো করা…একমাত্র আমাদের পূজনীয় মানুষদের মধ্যে বীরেনদা সেটা ক'রে আসছেন তিনি তাৎক্ষণিককে ধরে রাখছেন সমস্ত কবিতাতেই প্রায়। আমার মনে হয় এ যুগের যখন সমস্ত ইতিহাস মুছে যাবে, তার পৃষ্ঠাগুলি হারিয়ে যাবে, বীরেনদার কবিতাগুলি এই যুগের দলিল হয়ে থাকবে। এখন বীরেনদার কবিতা সম্পর্কেও, খুব শ্রদ্ধা নিয়ে বলছি, অনেক কবিতারই দলিল-মূল্য যতো থাকবে, শিল্প মূল্য তত থাকবে না। এবং সেখানেই আমার মনে হয়…আমি বীরেনদার কবিতার সম্প্রতি ইংরাজি অনুবাদ করতে গিয়ে দেখেছি…আমাকে অনেক কবিতা বাদ দিতে হয়েছে পৌনঃপুনিকতায় জর্জরিত কবিতা… বীরেনদাও সে বিষয়ে নিতান্ত সচেতন। কারণ তিনি অত্যন্ত আত্মসচেতন কবি…এখানে আমার একথাটা মনে হয় যে বিজ্ঞপ্তির স্তরে না এনে কবিতাকে এক একটা বাক্যাংশের ভেতরে, চূর্ণ বাক্যাংশের ভেতরেও আমরা যে সমসাময়িক জীবন-যাত্রার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, আমি শুধু বাইরের কতগুলি ক্রাইসিস বা সংক্রান্তির কথা বলছি না… মানুষ যে সর্ব পৃথিবীর মানুষ আজ যে আয়ারল্যাণ্ডের বিষয়ে আমরা কালী-কৃষ্ণর কবিতাটি পড়লাম আমি চমকে গেছি, আমি নন্দিত হয়েছি এই কবিতায়…কালীকৃষ্ণ ছাড়া কেউ লেখেনি ?

মৃণাল : কালীকৃষ্ণ ছাড়া, সত্যিই আয়ারল্যাণ্ডের অনশনরত সোনালি চুলের কয়েকজন যুবকের এই মৃত্যুবরণের কথা এবং দুর্ঘটনা এমন শিল্প-সম্মতভাবে আর কেউ লেখেনি…অন্তত আমার চোখে পড়ে নি—

অলোকরঞ্জন : হ্যাঁ…আমার মনে হয় আজকে যে আশংকাটা হচ্ছে…আপনারা জানেন…যেমন আমি ব্রেশ্‌ট থেকে শুরু করে ব্রোৎস্‌, বীয়ারমান এঁদের রচনা অনুবাদ পাশাপাশি করেছি, করে রাখছি এইজন্য যে এই ধারাটাও—এরা প্রতিবাদের কবি, অঙ্গীকারের কবি—কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। আমি যে মুহূর্তে ব্রেশ্‌ট অনুবাদ করেছি সে মুহূর্তে আবার সুরদাস করেছি। কেন? আমাকে অমিতাভ (গুপ্ত) এই প্রশ্ন করেছেন। এর উত্তর খুবই সোজা… আমাদের যতো ভক্ত কবি তাঁরা আবার ভয়ংকরভাবে বিপ্লবের কবি। এঁরা সমাজের সমস্ত বর্ণস্তর ভেঙে চুরে, চুরমার করে দিয়েছেন এবং কিন্তু…সমস্ত দিক থেকে করেছেন। এঁরা সত্যিকারের সমাজবিবেকী ছিলেন…অ-সামাজিক ছিলেন,…এঁরা সত্যিই আশ্চর্য-ভাবে আধুনিক মানুষ। এখন কথাটা হচ্ছে…এসব বাদ দিয়েও বলছি …আমি যেন কমিটমেণ্টের কানাগলিতে পর্যবসিত না হই…। আমার প্রিয় অগ্রজ একজন শিল্পী মৃণাল সেনের যে দশাটা হয়েছে…ভয় হয়

…আমি 'একদিন প্রতিদিন' পর্যন্ত দেখেছি…কিন্তু দেখতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে 'ভুবন সোম'-এর স্পর্শ কেন কোথাও নেই। আমার মনে হয়েছে যে শেষ মুহূর্তটাকে শয়নে স্বপনে প্রেমে অপ্রেমে সব সময়ই তাঁকে অঙ্গীকারের কথা বলতে হবে। আমরা জানি, বিশ্বের বিপ্লবীদের ইতিহাস পড়েছি আমরা। আমরা পাবলো নেরুদার আত্মজীবনী পড়েছি, ব্রেশ্‌টের প্রেমের ইতিহাস জানি। আমরা বিশ্বের বিপ্লবীদের আত্মবিবরণী পেয়েছি—কোনো বড় বিপ্লবীই জীবনের সমগ্র প্যাটার্ণ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন নি এবং এর মধ্যে অনেকেই কবিতাও লিখেছেন। এবং সেই কবিতার ভিতর থেকে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে কোথায় সেই অতিরিক্ত মাত্রাটা থাকছে যেটাকে কীট্‌স…আবার সেই পুরোনো কীট্‌স্‌-এর কথাই বলছি…ফাইন এক্‌সেস্‌…একটা সূক্ষ্মতর অতিরেক কোথায় থাকছে…। এখন আমার প্রসঙ্গে ফিরে আসি আমার কথা বারবার বলতে হচ্ছে। এ ছাড়া কোনো উপায় নেই যে, তা সত্ত্বেও আমি এই মর্মে নিদারুণভাবে সচেতন যে আমি এই সময়েরই বাসিন্দা। এই সময়ে জন্মেছি বলে আমি ভাগ্যবান। এই সময়ে প্রতিটি দিন আমি যাপন করতে পারছি বলে ঈশ্বরের কাছে আমি আজানু কৃতজ্ঞ। এবং এই সময়ের প্রতিটি অমীমাংসিত সমস্যার সঙ্গে আমাকে মোকাবিলা করতে হবে এবং এই কারণে আমার প্রথম দিকের রচনার আত্মতৃপ্তির সঙ্গে যে বিশ্বাস জড়িয়ে ছিল তার দুর্গ থেকে আমার মনে হয় বেরিয়ে এসেছি এবং এখানে আমার একটা আত্ম-উত্তরণের চ্যালেঞ্জ রয়েছে এবং সেখানে সামাজিক অঙ্গীকারের অভাব বোধহয় আমার কবিতায় নেই। আমি আমার পরের বই-এর উপনাম যেটা রেখেছি—কাজ চালানো নাম…সেটা হলো 'এ এক সময়।' এখানে সামাজিক অঙ্গীকারের কবিতাই বেশি। আমি কিছু ছাঁটাই করছি, ক'রে কতগুলি মাত্র রাখছি। কেননা এখানে তো শুধুমাত্র বিষয়ের তালিকা দিয়েই নয় যেমন বিষ্ণু দে-রও—এতো বড়ো কবি—তাঁরও কবিতায় অনেক সময় ভয়ংকরভাবে বিষয় জর্জরিত সত্যেন্দ্রীয় তালিকা—যেমন বিশ্বচেতনার কথা বলতে গিয়ে জায়গাগুলির নাম শুধু এনেছেন এর তো কোনো দরকার নেই।

মৃণাল : লিস্ট আমরা চাই না…

অলোকরঞ্জন : লিস্ট আমরা চাই না…কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি বলি আমার বন্ধুদের কাছে, শুভার্থীদের কাছে, মনে হয় যে আমার কবিতায় সামাজিক অর্থে বাগদত্ত হবার ক্ষমতাটা ক্ষীণ, তাহ'লে সেটা নিশ্চয় আমারই দুর্বলতা, নিশ্চয়ই সেটা পৌঁছয় নি…

কালীকৃষ্ণ : তবে এই সঙ্গে একটা কথা আমি বলবো, আমাদের যে

political changes-এর ওপর বা পলিটিক্যাল ব্যাপারের ওপর একটা stand নেওয়া বা একটা জিনিসকে বড়ো ক'রে দেখানো এটা যেমন আছে···আবার যেটা অন্যদিক সেটাও সমান পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ··· সেটা হ'চ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সম্পর্কগুলো যে কিভাবে গড়ছে, কিভাবে ভাঙছে, সেটাও একটা social content-এরই দিক এবং এই দিকটা তো আপনার কবিতায় মারাত্মকভাবে আছে···বরং···যাকে খেলার ছলে আপনি নানাভাবে দেখছেন। যেমন 'আগম নিগম' কবিতাটাই ভাবা যাক যে, 'বুড়োরা খেলছে শিশুরা দেখছে', এটাও তো বারবার ক'রে আপনি দেখিয়েছেন···। এখন অন্য প্রশ্নে একটু আসি···সেটা হ'চ্ছে ইদানিংকালে আমাদের কিছু বন্ধুরা বারবার ক'রে বলার চেষ্টা করছিলেন সাহিত্যের ইতিহাস আঙ্গিকের ইতিহাস'। এটা একজন বড়ো কবির উক্তি···নেরুদা বোধহয়···নাকি··· ?

মৃণাল : অনেকেই বলেছেন একথাটা, অনেকে আবার বলছেন আজকাল—

কালীকৃষ্ণ : এখন এই কথাটার উপর তাঁরা খুব ঝোঁক দিচ্ছেন তাদের ঝোঁকের কারণটা হ'চ্ছে তারা বলছেন, যা-কিছু আমাদের বলার সব বলা হ'য়ে গেছে। এখন শুধুমাত্র আঙ্গিক পাল্টানো এবং আঙ্গিক পাল্টালেই সাহিত্য নতুন হয়। এই কথাটা শুনে আমার নিজের মাঝে মাঝে খুব বিস্ময় লাগে যে আমাদের কথাও আসলে ফুরোয় নি এবং কথারও বিবর্তন হ'চ্ছে···আমাদের মূল্যবোধের বিবর্তন হ'চ্ছে···সেইজন্য শুধমাত্র আঙ্গিকই নয়, ভাবধারারও ব্যাপার আছে···

অলোকরঞ্জন : এটা ভারি একটা চমৎকার প্রশ্ন। আমার খুব ভালো লাগছে। এক সময়ে একথাটা ভালেরির টানে অনেকেই বলেছেন···

কালীকৃষ্ণ : মালার্মেও বলেছেন

অলোকরঞ্জন : মালার্মে ঠিক এইভাবে বলেন নি

কালীকৃষ্ণ : ওয়ার্ডস···

অলোকরঞ্জন : হ্যাঁ···কিন্তু আজকে আমাদের মনে হচ্ছে এ কথাটা পর্যাপ্ত নয়, অন্তত যেভাবে দেখা হয় তার অনেকটাই ঠিক। কেননা শুধু যদি আঙ্গিক পাল্টাবার ব্যাপারই থাকে তাহলে সেই কবিতা কখনো মহত্বে আক্রান্ত হতে পারে না। আমরা অনেক সময় জীবনানন্দের আকাঁড়া কবিতা সমস্ত যেগুলো আমরা দেখি, যেখানে আমরা এই ধরনের পঙ্‌ক্তি পাই : 'পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া' এসব অনেক উচ্চারণের মধ্যে আশ্চর্য সমস্ত অমসৃণ পঙ্‌ক্তি রয়ে গেছে তো ? কিন্তু তা সত্ত্বেও পরিণামী যে ব্যাপারটা···সমাপ্তি···যে সমাপ্তিটা ঘটছে শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন আঙ্গিকের জন্য নয়। এখানে আমি একটা কথা

বলতে পারি, তা হ'লো, আঙ্গিক যেন না ভুলি। এখন আমাদের যুগের খুব বড়ো একজন নন্দনতাত্ত্বিক, তাঁর নাম আডর্ণো···তিনি একটি ডায়ালেক্‌টিক্স্‌-এর কথা বলছেন···তাঁর বইটা আমার হাতের কাছে আছে। তিনি form-এর কথা বলছেন, শিল্পরূপের কথা বলছেন··· অমূর্ত শিল্পরূপের কথা বলছেন এবং বলছেন শিল্পের মাধ্যমে সমাজের বাস্তবতা কিংবা বস্তুর বাস্তবতা ডায়ালেক্‌টিকে রূপান্তরিত হ'তে থাকবে কবিতার মধ্যে। কেউ যদি এখন থেকে নিজেকে বিবিক্ত ক'রে নেন, শুধুমাত্র আঙ্গিকের চর্চা করেন···আঙ্গিকের চর্চা করে শুধুমাত্র উপনিষদের কথা, বাইবেলের কথা, গীতার কথা নতুন ভাষায় পরিবেশন করেন সেখানে আমার মনে হয় না আমরা পুনর্ণব কোনো আয়তন পাবো। এটাও ঠিক শুধু আঙ্গিকসর্বস্বতা এক চোরাবালির মধ্যে নিয়ে যায় অঙ্গীকার-সর্বস্বতার মতো।

কালীকৃষ্ণ : যেমন ব্যক্তিগত কবিতাও···

অলোকরঞ্জন : হ্যাঁ, ব্যক্তিগত কবিতাও নিয়ে যেতে বাধ্য। ওই শীর্ণ চারুকলার অনুশীলনে আমার মন একেবারেই সায় দেয় না। সেজন্য আমি এখন মনে করি কবিতার ওই আয়ত-সমগ্রতা কখনো কখনো একটু অনুশীলিত ছেলেমানুষি ধরনে ভেঙে দেওয়া মাঝখানে ফর্মের বৃত্তের একটি জানালাকে খুলে দেওয়া গেল···হাওয়া আসবে, আলো আসবে, অন্ধকার আসবে···সারা জগতের কতগুলো অনির্ণীত সমস্যা ঢুকে যাবে প্রকরণের ভিতর—এই ব্যাপারটা আমার মনে হয় রাখার খুব দরকার এখন।

কালীকৃষ্ণ : এই কথাটা আপনাকে জিজ্ঞাসা করার কারণ আমার এই যে, আঙ্গিকের ব্যাপার বলতে যা বোঝায় তা তো চূড়ান্তই আছে আপনার মধ্যে এবং একই সঙ্গে আছে বস্তুত content-এর দিক। স্বভাবতই আপনি আঙ্গিককেও exhaustively কাজে লাগিয়েছেন এবং কখনোই আপনার ভাবধারা বা দৃষ্টিকোণ প্রতিক্ষেত্রেই সেগুলোতে সিরিয়সলি আর্ত থেকেছেন···

অলোকরঞ্জন : আমার উত্তর কি পর্যাপ্ত হয়েছে ?

কালীকৃষ্ণ : নিশ্চয়। আমাদের সঙ্গে তো মিললো কিন্তু আমরা যারা আঙ্গিক-টাঙ্গিক নিয়ে খুব বেশি কাজ-টাজ করি নি আমরা একটু confused হতাম। এখন অন্য একটা প্রশ্নে আসি। এখন কবিত্ব বর্জিত কবিতার সপক্ষে আবার একটা প্রচার···নানা দিক থেকে নানা ধরনের প্রচেষ্টাই তো হ'চ্ছে···এখন এই anti-poetry এটা নাকি এখন একটা শেষ আধুনিক ব্যাপার···কিভাবে এর সূত্রপাত এ বিষয়ে একটু বলুন—

অলোকরঞ্জন : এই anti-poetryর ব্যাপার আমার মতে এর একটা উৎস

রয়েছে। এটা ডাডাইস্টদের মধ্যেও ছিল। ডাডাইস্টদের কবিতা এইজন্য থেকে গেছে যে এতে আশ্চর্য চিত্র-সম্ভারও ছিল। anii-poetryর নানা রকম আমরা দেখতে পাই। এর প্রচার, এর প্রবর্তনা বারে বারেই ঘটেছে, প্রত্যেক দশকেই ঘটছে নানানভাবে···আমার মনে হয় এটা যতোটা বেশি euo-anglian কবিতার মধ্যে এসেছে আমাদের মধ্যে ততোটা বেশি সংক্রামিত হয়নি···যেমন যদি আমরা বলি হাংরিদের মধ্যে কিছুটা এই না-কবিতা বা প্রতি-কবিতার ব্যাপারটা ছিলো। এখন এই ধরনের কবিতা কি খুব বেশি লেখা হচ্ছে? আমি জিজ্ঞেস করছি আমাদের মধ্যে যারা লিখছেন, সজল ইত্যাদি, এঁদের কবিতা কি আপনি anti-poetry বলবেন?

কালীকৃষ্ণ: সজলের থেকেও বেশি বলবো···

অলোকরঞ্জন: পুষ্কর তো এখন লেখে না···

কালীকৃষ্ণ: আমি বলবো বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর কথা।

অলোকরঞ্জন: হ্যাঁ···হ্যাঁ···বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত···বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত আমার মনে হয় একেবারে হাড়ে-মজ্জায় রোমান্টিক কবি·· এটা একটা তার সাময়িক মুদ্রা ব'লে মনে হয় যেটা প্রমাণ করছে তার ছবিগুলো। আমার মনে হয়, অন্যের কি ম'ন হয় জানি না, আমার মনে হয় এটা একটা অভিনীত মুদ্রা। anti-poetry ব'লে কিছু থাকতে পারে না, anti-prose ব'লে তো কিছু নেই! কবিতা, আমার মনে হয়, এই গ্রহের জন্মদিনে এসেছিল এবং আমার মনে হয়, এই গ্রহের মৃত্যুদিনেও থাকবে। anti-poetry ব'লে কিছু থাকবে না। আর anti-poetryতে আমি আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করছি content-এর ব্যবহার প্রসঙ্গে এই কথাটার ব্যবহার হ'চ্ছে না'···এটা লিরিকের ব্যবহার প্রসঙ্গে anti-poetryটা আসছে। সাজানোর ভেতরে anti-poetryর আদল আসছে। যেমন আগেও করেছেন হান্স আপ বা এরকম কোনো কোনো বড়ো কবি। কিন্তু ফিরে এসেছেন···যেমন পাউন ক্লে ক'রেছেন তিনি চিত্রী কবি। ক'রেছেন, কিন্তু ফিরে এসেছেন পরক্ষণে ওই অচলায়তনের মধ্য থেকে, যেহেতু ওই অচলায়তন সত্য নয়—চিরন্তন কবিতার দিকে।

[কালীকৃষ্ণ: সুন্দর উত্তর পাওয়া গেল। তবে anti-poetry-র কথা যাঁরা বলেন তাঁরা emotion ব্যবহারের যে রীতি তাঁরা সেই emphasis-টাকে একটু পাল্টাতে চান···যেন কোনো tense অবস্থায় বা কোনোরকম আবেগ-তাড়িত হ'য়ে লিখছেন না···তারা যেন খুব ঠাণ্ডা মাথায় একটা বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর সম্পর্ক দেখাচ্ছেন···সেটা যেন কবিতাই নয়।

এইভাবে তারা শুরু করেন, আসলে তাঁরা কবিতাই লেখেন এবিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই।

অলোকরঞ্জন : এখানে একটা কথা বলতে পারি কি ? যদি তাই করেন তো imagist-রাও তাই করেছিলেন এবং এটাও কোনো নতুন চাল নয়। এটা হ'লো অনেকটা ক্রিস্টালাইন কবিতা বা পরিশ্রুত কবিতা। কাজেই এটাকে আমরা প্রতি-কবিতা ব'লে মেনে নেবো কেন ? এটা আমি বলবো একটা প্রচ্ছদ মাত্র···আর কিছু না।

কালীকৃষ্ণ : যাক, এবার একটা অন্য প্রশ্নে আসি···আমার এক বন্ধুর সঙ্গে কালকেই কথা হচ্ছিল···সে বললো (এটা যে আমার খুব মনে হ'য়েছে তা না)···কথাটা হ'লো 'যৌবনবাউল'-এ আপনার যে—একটা নম্র মরমী, একটা অতন্ত আবেগী ব্যাপার ছিলো তা থেকে পরবর্তীকালে আপনার কবিতা abruptly change করেছে। এই change করার পেছনে কী কী কারণ থাকতে পারে—যদি আপনি পরিবর্তনকে স্বীকার করেন···মেনে নেন···

অলোকরঞ্জন : আমার নিজের মনে হয় না যে যৌবনবাউলের কবিতার পরবর্তী বিবর্তন আকস্মিকতায় আক্রান্ত···এখন এই প্রশ্নটা হ'তে পারে যেমন অনেকেই জানেন ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, জেমস জয়েসের সেই যে মগ্ন চেতনা-প্রবাহ তার অনুষঙ্গে একটা উপমা ব্যবহৃত হ'য়েছে যে জীবনে যে সমগ্রতা তা অলাত-চক্রের সমগ্রতা···একটা অগ্নিমশালকে ঘোরালে মনে হয় একটা বৃত্ত আছে কিন্তু এতে বৃত্তের প্রতিভাস আছে, বৃত্ত নেই। সে মুহূর্তে প্রতিমুহূর্তের বাস্তবতাই কিন্তু একটা সমগ্রতা নিয়ে আসে এবং লিরিক কবির ক্ষেত্রে এটা তো ভীষণভাবে সত্যি যে, একটা মুহূর্তে যা বলছেন, পরের মুহূর্তে তা বলছেন না। আমরা দেখি—আমাদের যিনি খুব বড় কবি—সন্ধ্যা-সঙ্গীতে যা বলছেন প্রভাত-সঙ্গীতে তা বলছেন না। আমাদের সব থেকে বড় কবি 'রোগশয্যায়' যা বলছেন 'আরোগ্য'তে তা বলছেন না। সব সময় একটা অ.অপ্রতিবাদের ঐক্য রচনা করছেন। রবীন্দ্রনাথের কথা থেকেই আমি বললাম। তিনি এই শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছেন আত্মপরিচয়-এ। এই মুহূর্তে যা বলছি তার প্রতিবাদ করা। Do I contradict myself? Yes, contradict myself. I Contain multitudes. এ কথাটা হুইটম্যান বলেছিলেন। ব্যক্তির মধ্যে অনেকগুলো বিশ্ব আছে। এইদিক থেকে আমার মনে হয় যে যৌবন-বাউলের কবিতা যখন প্রকাশিত হ'য়েছিল তখন খুব ধিকৃত হ'য়েছিল। যখন 'রক্তাক্ত ঝরোখা' প্রকাশিত হয় তখন 'রক্তাক্ত ঝরোখা' খুব ধিক্‌কৃত হয়েছিল অ্যাকাডেমিক মহলে। এরকম প্রত্যেক সময় আমি দেখেছি যে

সেই সময়…আমি কথাটা একটু বলবো…এতে আমার আপাত-অহংকারের হয়তো একটু ছাপ থাকবে…কথাটা, কখনোই পৃথিবীর শিক্ষিততম পাঠক ও অশিক্ষিততম কবিরও সমকালীন নয়। একজন পাঠকের সমসাময়িক কালের কবিতাকে ধরতে পাঁচ দশ বছর অপেক্ষা করতে হয়। আমার নিজের মনে হয় আমি নিজে চেষ্টা করেছি কোনো কবিতার কথা পরবর্তী কোনো কবিতায় পুনরুক্ত না করতে। এই জন্য যদি মনে হয় আমার কবিতার বিবর্তনে আকস্মিকতা এসেছে তাহ'লে আমি বলবো তাঁরা আমার কবিতার বহিরঙ্গ বক্তব্য দিয়েই আমার কবিতা-কে সনাক্ত করতে চেয়েছেন। এই থিসিসটা আমি আগে রেখেছিলাম—বক্তব্যে কবিতা হয় না, কবিতারই বক্তব্য…যেমন আমরা একটা বক্তব্য নিয়ে লিখতে শুরু করি, যেমন দুঃসময় কবিতাটা…কিরকম একটা অদ্ভুত মুড্-এ শুরু হয়েছিল যা একেবারে বিপরীত মুহূর্তে রূপান্তরিত হ'য়ে গেল লিখবার সময়। যেমন স্ত্রী একটা ডায়রীতে বলছেন, আমার স্বামীর মন আজ ভীষণ ভালো, তিনি একটা দুঃখের কবিতা লিখবেন। কবির নিজের সঙ্গে নিজের একটা আড়াআড়ি খেলা সবসময় চলছে…একটা কনকমিটেন্ট ভ্যারিএশন। একটা সমকালীন বৈপরীত্যের একটা ব্যাপার…এই খেলাটা চলছে। তিনি নিজেকে নানান ভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেন—স্কোপের মতো। এই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখার মুহূর্তে যদি মনে হয় তিনি বিবর্তিত হ'চ্ছেন না…একটা ছদ্ম-নাটকীয়তায় শুধুমাত্র নিজেকে পরিবর্তিত করছেন তাহ'লে আমার মনে হয় একটু অবিচার করা হয়। কিন্তু যদি ভিতর থেকে দেখা হয়, আমার মনে হয় আমার কবিতার মধ্যেও একটা ধুয়া, একটা ধ্রুবপদ আছে। জীবনের প্রতি বিশ্বাস, শোয়াইৎজীর যাকে বলেছেন জীবন-প্রতীতি, লক্ষণ বোধহয় আমার কবিতায় কখনো নষ্ট হয়নি…যদি এইভাবে একটা সারমর্মের আকারে বলা যায়। এ'ও ঠিক আমি প্রতিটি কবিতায় একটা নতুন জগৎ তৈরী করতে চেয়েছি। এবং তার মধ্য থেকে একটা পারম্পর্য আবিষ্কার করার দায়িত্ব আমি ইস্কুল-মাস্টারের মতো সেটা ব'লে দেবো না…মনে হয় আমার সংবেদী পাঠক একদিন না একদিন আবিষ্কার ক'রে নেবেন। এখন কালীকৃষ্ণ…

মৃণাল : আমিও মনে করিনা কোনো কবিরই একেবারেই আকস্মিকভাবে পরিবর্তন ঘটে…একটা যোগসূত্র থাকেই। একটা ধারা ঠিকই থেকে যায় এবং তা পূর্ববর্তী রচনাগুলি থেকেই পাওয়া যায়।

অলোকরঞ্জন : একটা সেতু থাকবেই…

মৃণাল : ফর্মের কিছু কিছু পরিবর্তন দেখে বলা উচিত না এটা একেবারেই আকস্মিক…আলাদা

অলোকরঞ্জন : যদি আমার স্বরায়ণ না থাকে তাহলে প্রশ্নটা উঠতে পারে···

মৃণাল : উঠতে পারে, অবশ্যই পারে—

অলোকরঞ্জন : এবং স্বরায়ণ মানে কি সবসময় আমাকে একইভাবে কথা বলতে হবে ? বদলের মধ্যেও একটা স্থিরতার সূত্র থাকবেই···

মৃণাল : সেটা খুঁজে নেবার বা বুঝে নেবার দায়িত্ব কবির নয়

অলোকরঞ্জন : সেই আমার মনে হয়···

কালীকৃষ্ণ : একটা কথা, অনেক গুরুত্বপূর্ণ কবি বা প্রধান কবিও বলেন, সেটা হলো যে, একজন আধুনিক কবি'—(এই শব্দটাই ব্যবহার করছি)—যেহেতু নিজস্ব একটা জগৎ থেকে লেখেন সেইজন্য তার পক্ষে বার বার পাল্টানো বা মারাত্মকভাবে পাল্টানো প্রায় অসম্ভব এবং তিনি নাকি সেই শর্তেই বারবার একই জায়গায় থেকে যাওয়া, একই কেন্দ্রে থেকে যাওয়া···এটা তার নিয়তি। এবং যেহেতু তিনি একটি কেন্দ্রে থাকবেন সেইজন্য তাকে বার বার রিপিট করতেই হয়। আপনি কি মনে করেন এই তত্ত্ব ঠিক নয় ?

অলোকরঞ্জন : প্রশ্নটা আমার কাছে খুব স্পষ্ট হয়নি, তবু বলছি। কেন্দ্রতো আছেই এবং এই কেন্দ্র থেকে সরে যেতে হয় তাকে। এই সরে যাওয়াটা ফিরে আসার একটা অছিলাও বটে। এবং সেদিক থেকে আমার মনে হয় যে, তাহলে আমরা যেমন, রবীন্দ্রনাথের ছবি ছাড়া আজকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বুঝতে পারিনা···আমরা কি বলবো রবীন্দ্রনাথের ছবিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কেন্দ্র থেকে সরে গিয়েছেন ? আমরা একথা বলতে পারিনা। বা রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্বের কবিতায় তাঁর সমগ্র কবিতা থেকেসরে গিয়েছেন। অমিয় চক্রবর্তী ও বুদ্ধদেবেরমধ্যে এই নিয়ে অনেক তর্ক লক্ষ্য করেছি। আমি সেই সবতর্কের সাক্ষী। যেখানে কেউবলছেন শুধু প্রথম পর্বের কবিতা ভালো, কেউ বলছেন দ্বিতীয় পর্বের কবিতা ভালো। এ বিচারগুলো প্রায় ভাবগত বিচার। এবং এর মধ্যে আমি একটি আমার প্রিয় উদাহরণ দিচ্ছি, যেমন আলোক সরকারের কবিতা। আলোক প্রথম দিক থেকে আজ পর্যন্ত নিজের ভঙ্গির কাছে, মুদ্রার কাছে বিশ্বস্ত থেকে গেছেন। কিন্তু এটা অনেকে লক্ষ্য করেন নি যে আলোক তাঁর 'আলোকিত সমন্বয়' থেকে আশ্চর্যভাবে গদ্যের যে জগৎ, শুধুমাত্র পল্লীগ্রামীণ জগৎ নয়, কিংবা আশ্রম নয়, তপোবনের জগৎ নয়, কিংবা মেটাফিজিক্যাল জগৎ নয়, যে জগৎ প্রাত্যহিক তার জগৎ···এটা আশ্চর্যভাবে চারপাশের রাস্তার সংসার, তার বেদনা, তার ক্লেশ এ সমস্ত ব্যাপার, প্রসঙ্গ, আলোকের পরবর্তীকালের কবিতায় আসছে। বাইরে থেকে ফর্মটা অনেক সময় এক বলে মনে হয়। কিন্তু সেখানেও দেখতে পাচ্ছি আলোকের কবিতার sprung-rythm যেটা

ছিলো, 'চর্টজলদি' ছন্দ, অবনঠাকুরের ভাষায় যদি বলি—সেটাও দেখছি তখন Prose-এর সঙ্গে বিবাহিত হচ্ছে। আবার কাছে এটা খুব স্বাস্থ্য কর লক্ষ্যণ বলে মনে হয়। যাঁকে নিয়ে এই প্রশ্নটা আমরা চূড়ান্তভাবে তুলেছিলাম—অরুণ মিত্র যাঁকে নিয়ে বারবার এই প্রশ্নটা উঠেছে···অরুণ মিত্রের কিছু অপ্রকাশিত কবিতা আমি পড়েছি—সেখানে লক্ষ করেছি তিনিও তাঁর আত্মবলয় থেকে বেরিয়ে আসছেন। এই বেরিয়ে আসার মানে কি? আমাদের কেন্দ্রটা তো শুধু আমাদের মধ্যে নেই, তা নিজের বাইরেও রয়েছে। এবং আমরা একসময় যে কেন্দ্রটাকে অর্জন করেছিলাম সেই অর্জিত কেন্দ্রটাই যদি আমাদের একমাত্র কেন্দ্র হয়, জায়মান কেন্দ্রটা কোনো কিছুই না নয় তাহলে আমার কিছুই বলার নেই। আমার মনে হয় প্রত্যেক কবিই জায়মান কেন্দ্রের উপাসক।

কালীকৃষ্ণ: এবার আপনার প্রসঙ্গ একটু বলি। ছন্দের প্রসঙ্গটা মৃণাল হয়তো আরও ভালো বলবে···আমার মনে পড়ছে আপনি 'যৌবনবাউল'-এর উৎসর্গে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন 'ছন্দ ছাড়বো না' এবং ছাড়েনও নি। কিন্তু পরবর্তীকালের অনেক কবি ছন্দ না জেনেও বা জেনে হোক, ছন্দকে অবহেলা করেছেন···তা আপনার কি মনে হয় এইসব কবিতা পুরোটাই ব্যর্থ হয়েছে···নাকি এই কবিতাও কিছু কাজ করতে পেরেছে? আমার যেটা বক্তব্য তা হলো ছন্দোহীন কবিতা বা গদ্য-কে আপনি অপছন্দ করেন কি না···

অলোকরঞ্জন: ছন্দোহীন কবিতা কিংবা গদ্য-কবিতা এক নয়। গদ্য কবিতারও ছন্দ আছে। সেই একটা বিখ্যাত মার্কিনী উক্তি আছে 'নেট্ না টাঙিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলা যায় না'—রবার্ট ফ্রস্টের কথা। ঠিক তেমনি ছন্দ না বিন্যস্ত ক'য়ে কবিতা লেখা সম্ভব নয়। ছন্দ শব্দটার মূল অর্থটা যদি নিই···আচ্ছাদন করার ব্যাপার—আরেকটা মনে হচ্ছে তার প্যাটার্ণ, নক্সা···একটা-না একটা নক্সা বা বাক্-স্পন্দের ব্যাপারটা থাকতে হবেই কবিতায়। তা নইলে আমরা তাকে গদ্য থেকে আলাদা করতে পারবো না। তাহলে তা গদ্য হবে। গদ্য কথাটার একটা মানে ···গ্রীক অর্থে···এলোমেলো ব্যাপার। আমাদের মঙ্গলকাব্যের যুগে গদ্য কথাটার মানেই ছিলো: 'হেন কথা গদ্য করি কহিলা যুবতী' অর্থৎ তরুণী ঠাট্টা করলেন। ঠাট্টা কেন? তার ফর্ম নেই বলে। কবিতার মধ্যে কিন্তু···গদ্য কবিতার মধ্যে ফর্ম থাকতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতার বা পরবর্তীকালে গদ্যকবিতা লিখিত হতেদেখেছি···যেমন অরুণ মিত্রের কিছু কিছু কবিতায়···তা তাঁরা কাব্যছন্দটিকে আরো অনেক-খানি বিস্তারিত করে দিয়ে গদ্যের মধ্যেই একে লুকিয়ে রাখছেন। গদ্য কবিতার আমি সেদিক থেকে পক্ষপাতী। গদ্যকবিতা মানে একটা

আত্ম-মন্থনের বিন্যাস নয়—একটানা স্বগতোক্তির উল্লাস নয়, গদ্য কবিতার মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ব্যক্তি বিশ্বের সঙ্গে বস্তু-বিশ্বের একটা মোকাবিলা তার মধ্যে হয় এবং গদ্য কবিতা এই দিক থেকে ভালো আরও হতে পারে আমার মনে হয় এই কারণে···যেটা আপনাদের মধ্যে···কারো মধ্যে আমি লক্ষ্য করেছি যে গদ্য কবিতার মধ্যে প্রাত্যহিক কথ্য বুলি অনায়াসে তুলে আনা যায়···আর আত্ম-অতিক্রান্তি হয় তারি মধ্যে একটা ছন্দ আছে···যেটা আমরা এখনো সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পরবর্তী কোনো কোনো কবিতায় পাই, যদিও তিনি কখনো কাব্যছন্দ থেকে বেরিয়ে আসেন নি। এবং মুক্তির দিক থেকে আমি বলবো সত্যিই গদ্য কবিতার একটা দরকার রয়েছে। নইলে পয়ারে কথা বলতে গিয়ে কি যেন 'কেবলই জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়'···আত্মকেন্দ্রিকতাটা বেড়ে যায়, কেননা আমার সামনে এতোগুলি মডেল আছে···সেইজন্য···

মৃণাল : অনেক সময় আমার মনে হয়েছে তার যেন একটা লিমিটেশন থেকে যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে পাকা ছন্দ জানেন এমন কবির এক্সপোজারটা গদ্যে ভালো হয়েছে···গদ্য কবিতা তাঁরাই ভালো লিখতে পারেন বা পারছেন যাঁরা ছন্দটাও অত্যন্ত ভালো জানেন।

কালীকৃষ্ণ : এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমার মনে হয় যেটা যে, যে ছন্দ বোঝে না তার পক্ষে গদ্যে লেখা প্রায় অসম্ভব, কিন্তু সব সময়ই যে অসম্ভব তা নয়। এমন হতেই পারে যে একজন লোক এক সময় সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা বা মারাত্মক আবেগ থেকেও এমন একটা জিনিস এলোমেলোভাবে লিখলো যে তার মধ্যেও এমন কবিত্ব থাকতে পারে যে তা মারাত্মক নাড়া দিতে পারে।

মৃণাল : সাধারণত যারা নতুন কবিতা লিখছেন অনেকেই ধরেই গদ্যে লিখছেন তাদের ছন্দে লেখার অনুশীলনটাও পর্যন্ত নেই দেখা যায়···ফলে ছন্দোজ্ঞানহীন গদ্যচালের exposureটা কিন্তু কখনোই আমার কাছে গ্রহণীয় মনে হয়নি।

কালীকৃষ্ণ : অনেকেই ছন্দের চর্চা না করে, না জেনে এবং ছন্দ জানার দায়িত্ব নেই এটা ভেবেও গদ্যে লিখছেন। তাদের লেখালেখি কি একেবারেই সব ব্যর্থ হয়েছে?

অলোকরঞ্জন : নিশ্চয় ব্যর্থ হচ্ছে না। কিন্তু তাহলে কি আমি বলবো কমল কুমার মজুমদার একজন কবি? অ্যামিয়েলের জার্নাল-এর অ্যামিয়েল কি একজন কবি বা প্রুস্ত কি একজন কবি? এঁরা নিঃসন্দেহে মহৎ কবিত্বে আক্রান্ত, কিন্তু কবিতা এঁরা লেখেন নি। এখানে একটা তফাৎ আমাদের করতে হচ্ছেই। না করে উপায় নেই আমাদের।

কালীকৃষ্ণ : আচ্ছা এবার আমি যে প্রশ্নে আসছি অলোকদা তা হচ্ছে যে আপনি গত ১০।১২ বছর, প্রায় এক যুগ ধরে বিদেশে আছেন···আপনার বিদেশ বাস বা বাস্তুতা···এবং আপনি সবকিছু গ্রাস করে নিচ্ছেন আপনার কবিতার স্বার্থে···এটা ভাল লাগছে। এখন আমার যেটা প্রশ্ন : আপনার বিদেশে থাকার জন্য—অবশ্য আপনি বিদেশ স্বীকার করেন কিনা জানি না – অন্য পরিবেশ, অন্য ধরনের জীবনযাপনের জন্যে আপনার লেখা কতখানি পরিবর্তিত হচ্ছে বা অন্য রকম হচ্ছে কি না এ বিষয়ে আপনি একটু কিছু যদি বলেন—

অলোকরঞ্জন : এই প্রশ্ন আমাকে অনেকেই করেছেন 'তোমার বাস কোথায় হে পথিক ? দেশে কি বিদেশে···।' আমার কাছে এই কথা শুনলে ঠিক এই লোড-শেডিং এর মুহূর্তে এটা খুব অবাস্তব লাগবে। তবু কালীকৃষ্ণ, মৃণাল আপনারা আমার ভায়ের মতো। 'মতো' শব্দটা ব্যবহার করলাম বলে অপমানিত হবেন না, কেননা এগুলো গদ্যের কতগুলো সীমাবদ্ধতা তবু আপনাদের কাছে আমার কতগুলো কথা কবুল করা ভাল। আমি মনে করি, কবিরা সর্বত্রই প্রবাসী-এবং স্ববাসী। এবং আমার কাছে এখন দেশ-বিদেশ দুটো একাকার হয়ে গিয়েছে। আমি জানিনা এমন কোনো কবিতা আছে কিনা যেখানে দেশ-বিদেশের এই সীমারেখাটা আছে। এটা হতে পারে আমি যে স্কুলে পড়েছি রবীন্দ্রনাথের তৈরি করা স্কুল—সেই স্কুল থেকেই হয়তো বিশ্বচেতনার ছিটেফোঁটা আমি পেয়েছি। খুব বড়ো মানুষ, আমাদের আলোচনায় আমি নামাচ্ছিনা তাঁকে, গ্যোয়েটে সম্বন্ধে বলা হয় 'বিশ্বকিশোর'······শব্দটা তাঁরই তৈরী। আমার মনে বিশ্ববীক্ষার একটা বুভুক্ষা চিরদিনই ছিলো। এবং সেই সূত্রে আমি বিদেশে দিশি মতনই চলি। দেশে কখনো কখনো আমার চলনবলন বিদেশি মনে হতে পারে···এখন অনেক 'দেশজ' মূল্যবোধ অনেক সময় আমার বিদেশী বলে মনে হয়···গত কয়েক বছর ধরে আমি লক্ষ্য করছি, আমাদের দেশে বা তৃতীয় বিশ্বের কোনো কোনো অঞ্চলে দেশ-বিদেশের সীমারেখাটাকে এস্টাব্লিশমেন্টের দৌলতে চিহ্নিত করা হচ্ছে। আমার কাছে মনে হয় কবিতার অক্ষাংশের পাশাপাশি দ্রাঘিমার একটা দিক রয়ে গেছে। কয়েক বছর আগে আলোককে বলেছিলাম বাংলা ভাষায় বিশ্বকবিতা লেখা হবে। আলোক এ নিয়ে খুব উত্তেজিত হয়েছিলেন। পরে আলোক স্বীকার করেছিলেন। তার মানে এই নয় অন্যান্য ভাষায় যা লেখা হচ্ছে তাকে নকল করে লিখতে হবে······আদৌ তা নয়। এইজন্য যে বাংলা কবিতার দিগন্তকে প্রসারিত করবার জন্য ওই যে কতগুলো বিধিবদ্ধ উপকরণের মধ্যে ঘুরছে···এটাকে আমি বলি মুক্তপদস্পৃক্ততা—আমি মুক্তপদস্পৃক্ততা

কথাটা ইচ্ছে করেই ব্যবহার করছি না যা শুধু নিজের মুখ দেখে নার্সিসাসের তৃপ্তি। এমন কি মৃণাল, আজ মারাঠি ভাষায় যে আশ্চর্য কবিতা লেখা হচ্ছে···এমনকি আমাদের বহু ধিকৃত হিন্দি কবিতায় 'অজ্ঞেয়' যেসব কবিতা লিখেছেন আমরা সেইসব কবিতার সঙ্গে পরিচিত হতে চাই না। আমি বাদ দিলাম ইওরোপের কবিতার কথা। এখন প্রশ্নটা উঠছে যদি আমার কবিতার ভেতরে ভারতীয়তার মাত্রা না থাকে —খুব একজন বিরাট কবির কথা বেছে নিচ্ছি—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর অনেক কবিতায় লক্ষ্য করি ইয়োরোপীয় মেজাজ প্রকাশ্যত বিচ্ছুরিত হয়েছে। সমর সেনের কবিতাও লক্ষ্য করি, এমন একটা urbanity, এমন একটা নাগরিকতা যা সত্যিই আন্তর্জাতিক···তার মধ্যে হয়তো ডেকাডেন্স বা অবক্ষয়টা বেশী ছিলো। আমি মনে করি, একটা মুহূর্তের কবিতা যখন উত্তীর্ণ হয় তখন তা দেশকাল উত্তীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু, এই কবিতার শিকড় থাকে দেশকালের ভিতরে। আমি মনে করি, আমি দেশকালের নাগরিক এবং আমার কবিতার যেসব পরিবর্তন বা বিবর্তন ঘটেছে গত দশ বারো বছরে, সেই কবিতাগুলি সম্পর্কে যদি এই প্রশ্ন তোলা যায় যে তা দেশকালের প্রসাদগুণ থেকে বঞ্চিত, যদি এটা প্রমাণিত হয়, আমি নিশ্চয় প্রতি-প্রমাণ রাখতে যাবো না—আমি শুনবো সে কথা। কিন্তু হয়তো মানবো না। মাটির সঙ্গেই আমার যে যোগ তার বিজ্ঞাপন কিভাবে দেবো? যদি তা আমার চর্চার মধ্যে না প্রকাশ পায় তাহলে তার কোনো মানে নেই। আমি জানি আমি যখন এখানে থাকি বা ওখানে থাকি—দুটো থাকার মধ্যে যদি কোনো বিভাজন দেখতে পাই তবে আমি এ প্রশ্নটা করবো। প্রত্যেকেই তার নিজের জায়গায় বাস করে। যেমন কালীকৃষ্ণ তার কলকাতায় বাস করে, মৃণাল তার বড়ো বন্ধু হওয়া সত্বেও তার নিজস্ব কলকাতায় বাস করে। প্রত্যেকেই যে দেশকালেই থাকুক তার নিজের মতো করেই সেখানে থাকে। আমি জার্মানিতে প্রথানুযায়ী জীবনযাত্রার মধ্যে থাকিনা···আমার বিনীত থাকার যে ইতিহাস সেখানে আমরা পুরো দিশি ভাবেই থাকি। আমাদের স্বদেশ থেকে প্রচুর মানুষ তাঁরা যান—আমাদের যে-ডেরা সেখানে সম্পূর্ণভাবেই শুধু দিশি ব্যাপার, অনেকেই আমাদের প্রশ্ন করেন, 'একি তোমাদের কিছুই —এখানকার স্থানীয় কিছুই নেই কেন?' এখন প্রশ্ন, যদি আমি একটি মুহূর্তের জন্য কলকাতার মাড়োয়াড়ির একটা গদি আঁকড়ে বসে থাকতুম-তাহলে কী হতো?

কালীকৃষ্ণ: আমার প্রশ্নটা আপনি অনেক উচ্চতা নিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন—এতে লাভই হলো। আমাদের কাছে সত্যিই বিদেশ আছে বেদনা

আমরা চিরকাল এদেশে আছি এবং থাকবো। স্বভাবতই আমাদের কাছে ইওরোপ বিদেশ-ই। যদিও একথাও ঠিক যে আমরা শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথ পড়ে বা জীবনানন্দ পড়ে কবিতা লিখছি না—আমরা পাশাপাশি কাফ্‌কা পড়েছি এবং তাঁর কাছেও আমাদের ঋণ কিছু কম নয়। এলিয়ট বা যে কোনো কবির কাছেই আমাদের ঋণ। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার যেটা সামান্য প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে বিদেশে থাকার জন্যই আপনার পরিবর্তন কিছু হচ্ছে কি না। এটা নিশ্চয়ই আপনি প্রিভিলেজ হিসেবেই ব্যবহার করছেন…এই মুহূর্তের জার্মান কবিতা, এই মুহূর্তে বিশ্বব্যাপারের চিন্তা এবং ইয়োরোপের অন্যান্য ভাষার কবিতা বাংলা কবিতার পাশাপাশি পড়তে পারছেন। এতে নিশ্চয় আপনার লাভই হচ্ছে।

মৃণাল : যেমন এই প্রসঙ্গে আমি আপনার 'মুক্তি' কবিতাটির কথা বলতে পারি—কবিতাটির নিহিত তাৎপর্য ও বাস্তব পরিণাম যতোটা ব্যক্তিগতভাব দেখার ও প্রকাশ করার সুযোগ ঘটেছে তা কী সম্ভব হতো এদেশের মাটিতে বসে, কল্পনায় ?

কালীকৃষ্ণ : আরবের মরুভূমির ওপর দিয়ে উড়ে না গেলে নিশ্চয় 'মুসাফির' কবিতাটি লিখতে পারতেন না।

অলোকরঞ্জন : এটা শুনে খুব ভাল লাগছে। এটা তো আমারও অর্জন হয়েছে।

মৃণাল : এবং ধরুন 'লোপামুদ্রা' কবিতাটি। সম্ভব হতো কী যদি না পটভূমি হিসাবে ইওরোপ বা বিদেশ-বাস আপনার মূল্যবোধে বৈচিত্র্য বা বৈপরীত্য না ঘটাতো ?

অলোকরঞ্জন : পারতাম না, ওটা এখানে লিখতে পারতাম না। আমি এখানে একটা কথা যোগ করি, যদি আমি কোনো মুহূর্তে বুঝতে পারতাম আমার তথাকথিত বিদেশ-বাস আমার কণ্ঠরোধ করছে আমি সেই মুহূর্তেই সেই মাটি ছেড়ে চলে আসতাম। আমি দেখলাম মৃণাল, গত কয়েক বছরে আমার একটা মানসিকতা এসেছে, যেটা অনেকটা সেই কবীরের কবিতা পড়লে হয় না…আমি কেন ভয় করব ? আমারতো কারুকে ভয় পাবার নেই! আমার রাষ্ট্রকে ভয় নেই, বড় বড় কর্তাদের ভয় নেই। যদি কেউ হঠাৎ আমার সমস্ত অধিকার কেড়ে নেয় তবু আমার কথা বলার অধিকার থাকবে। এই ব্যক্তিস্বাধীনতার ব্যাপারটা ওদের খুব প্রবল। ওখানে যেমন এস্টাব্লিশমেণ্টকে সমালোচনা করতে দেওয়া হয়, এদেশে তেমন হয় না। এর সঙ্গে একটা কথা আছে, আমি যে কাজগুলো করতে পারছি, গ্যোয়েটে ও রবীন্দ্রনাথের ওপর যে কাজ আমি করতে পেরেছি—আপনারা দেখেছেন কিনা জানিনা—সে কাজ

আমি দেশে থেকে করতে পারতুম না। সেই কাজের যেসব উপকরণ পেয়েছি তা আমি এখান থেকে হাজার চিঠি লিখেও পেতাম না। সেখানে আমি সেই লাইপৎজিগের লাইব্রেরিতে বসে যে দলিল তুলে এনেছি সে কি দলিল! গ্যোয়েটের ভারতীয় দলিল যেখানে তিনি বলছেন 'আমি যদি বুদ্ধ হতাম তাহলে বেঁচে যেতাম।' শুনে তো জন্মান্তর ঘটে যায়।...এখন এটা ঠিকই; বিদেশের তারে বিশ্বদেশের বা স্বদেশের রাগিণী বাজতেই হবে। তা যদি না বাজে তাহলে আমি নিশ্চয়ই মেনে নেবো ওই প্রশ্নটাকে মাথা নিচু করে।

কালীকৃষ্ণ ঃ যদি আপনি এমবারাসড না হন তো বলি, পঞ্চাশের কবিদের কি মূল্যায়ণ করার সময় এসেছে? যদি সম্ভব হয় তাহলে তাদের অবদান বা ব্যর্থতার দিকগুলি যদি বলেন।

অলোকরঞ্জন ঃ ...আচ্ছা—বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'কালের পুতুল' যখন লিখেছিলেন সেই সময় তাঁর সমকালীন কবিদের মূল্যায়িত করেছিলেন। মৃণাল...এটা ঠিকই যে আমাদের মধ্যে অনেকেই যেমন শঙ্খবাবু, বা আমি সমসাময়িক কবিদের নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের ধারাভাষ্যটা দিয়েছি—আমরা জড়িয়ে আছি তো এর সঙ্গে সেইজন্যে দিয়েছি। আমার মনে হয় আরো বেশি আমাদের দেওয়া উচিত ছিল সমসাময়িক কবিদের পরিচয়। কিন্তু আরো নিবিড়ভাবে বলা, সংস্কারমুক্তভাবে বলা এটা আমাদের মধ্যে, শ্রদ্ধেয় বন্ধুদের ধরেই বলছি, কেউ বুদ্ধদেবের মতো বলেন নি। এটা আমার মনে হচ্ছে, পঞ্চাশের দশকের কবিদের একটা মূল্যায়ন করবার সময় হয়েছে। এই প্রশ্নটা এজন্যই উঠেছে একটা বেশ বড় মহলে এই কবিদের অবমূল্যায়িত করা হচ্ছে—যেটা আপনারা করেননি। আমার মনে হয় এই কবিদের defend ক'রে, কিছুটা আত্মরক্ষার্থে, কিছু কথা বলার সময় এখনতো এসেইছে। এখনতো তরুণ কবি বলতে কোনো প্রবীণ সমালোচকের বইতে এখনো হয়তো দেখবো সুভাষ মুখোপাধ্যায়, উদীয়মান কবি বলতে সমর সেন। এই সব হচ্ছে। ও দেশে এই ব্যাপারটা অন্যরকম। হান্‌ড্‌কের মতো একজন তরুণ বয়সী কবিকে গ্যোয়েটের পাশে বসিয়ে দেখা হচ্ছে। বাংলা কবিতার ইতিহাস লিখতে গিয়ে কেন জয় গোস্বামী এ পর্যন্ত আসা হবে না? আমি এটা জানি না যেজন্য শ্রীকুমারবাবু সম্পর্কে জীবনানন্দকে ওই কবিতা লিখতে হয়েছিল 'বরং নিজেই তুমি লেখোনাকো একটি কবিতা'...কারণ অধ্যাপক সমালোচকরা এই জগৎ থেকে ভয়ংকর দূরে সরে আছেন। যাঁরা ছান্দসিক তাঁরাও এখনকার কবিদের ছন্দ বুঝতে পারেন না।

একবার মনে আছে, বর্ধমানের একটা সেমিনারে একজন কল্যাণী

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশ্ববিখ্যাত ছান্দসিক বলছিলেন 'মোহিতলাল যতীন্দ্রনাথের পর তো আর ছন্দের ব্যবহার নেই বাংলা কবিতায়…' আলোক সরকার ছিলেন সেই সভায়…আলোক আর আমি তো থরথর ক'রে কাঁপছিলাম।

মৃণাল : আচ্ছা একটা কথা, বুদ্ধদেববাবু কি মনে করতেন আপনাদের কবিতায় ছন্দের গোলমাল আছে।

অলোকরঞ্জন : হ্যাঁ, অনেক সময় মনে করতেন। বলতেন, 'আমার কানে নিলে না।' এই নিয়ে ও'র সঙ্গে অনেক তর্ক হয়েছে—যখন প্রাত্যহিক বাক্যাংশ ঢুকিয়ে দেওয়া হতো তখনই এরকম হতো—উনি মাপতেন প্রায় চোখ দিয়ে, চাহনির নিক্তি দিয়ে ওজন করে নিতেন। সংস্কৃত কবিতায় যেভাবে ছন্দটাকে দেখা হতো। ছন্দটা একেবারে মাপা যাচ্ছে অক্ষরে, তার বিজ্ঞানটা। বুদ্ধদেব আগে ঐরকম ছিলেন। কিন্তু যখন 'যে আঁধার আলোর অধিক' লিখলেন তখন আর এটা ছিল না ··এখন আমার সময়ের কবিরা, বলা বাহুল্য আমার প্রিয় কবি। এখন তাদের কবিতার দুর্বলতার দিকগুলো ধরা আমার পক্ষে মুশকিল যেমন ভাই বন্ধুদের দুর্বলতাগুলি ধরা খুবই মুশকিল হয়। আমি যদি হঠাৎ বলে উঠি 'শক্তি দেবদত্ত প্রতিভা' আমি জানি এক জায়গায় বলেছিলাম, নৈহাটির 'আজকাল'-এ এবং তাঁরা আক্রমণও করেছিলেন। এখন এটা যদি সত্যি পুরোপুরি না হয় আমি মিথ্যে বলিনি এইদিক থেকে যে এটা আমার মনে হয়েছে—আমি জড়িয়ে আছি বলেই তো মনে হয়েছে। এখন দুর্বলতার থেকেও বড় কথা এ'রা তো এখনো লিখে চলেছেন এবং তাদের লেখার মধ্যে আত্মপরিচয়ের একটি স্বরলিপি থাকছেই। এরপর কোন রচনাটি চূড়ান্ত উত্তীর্ণ, কোনটি উত্তীর্ণ নয় সেটা দ্বিতীয় প্রশ্ন, প্রাথমিক প্রশ্ন নয়। দ্বিতীয়ত, আমাদের নিশ্চয় আপেক্ষিক দুর্বলতা একটা আছে। সেই দুর্বলতাটা…যদি সুনীলকেই ধরি… সুনীলরাই প্রথম সাহিত্যের সাহিত্যিকতাটাকে ঘুচিয়ে দিয়ে কথ্যতাটাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন কৃত্তিবাস-এ, ওই অর্থে যদি তুলনা করি তার পরবর্তী সময়ের সঙ্গে—আমি আপনাদেরও ধরছি না, তারও পরবর্তীকালে… আমাদের সময়েও একটা কাব্যানুশাসন ছিলো…সুনীলের কবিতারও একটা বড় অংশ স্টাইলাইজড…, এমন কি যেখানে ও'র একটা চূড়ান্ত আবেগের ব্যাপার আছে সেখানেও কিন্তু সুনীল একটা শিল্পসদনের মধ্য থেকে কথা বলছেন। ছান্দসিকের প্রস্বর সেখানে থাকছে। ওর গদ্যের মধ্যেও তাই এবং ফিনিশ্‌ড লেখা। এইটে হয়তো আমাদের গুণ এবং অপগুণ।

ক্লক : একটা অন্যপ্রসঙ্গে আসি…আপনার কবিতায় [illegible] ফিরে যদি

কিছু বলেন—বিশেষ করে কল্পনা এবং অভিজ্ঞতা—এর কোন্‌টাকে বেশি কাজে লাগানোর ঝোঁক আপনার থাকে।

অলোকরঞ্জন : কল্পনা এবং অভিজ্ঞতা দুটোই, নিশ্চয়ই। কারণ নিজেকে প্রতিমুহূর্তে তৈরী করছি, কাজেই সেই সঙ্গে কবিতাও তৈরী হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমরা এখনো পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের খুব বাধ্য সুবোধ ছাত্র। এক-একটা কবিতা আমাদের জীবন-যাপনেরই রূপান্তরিত দলিল। নির্মিতির এক প্রশ্ন আছেই, কেননা আজকে আমরা কোনো সহজিয়া-কথনকে বিশ্বাস করিনা। আমরা যাই লিখিনা কেন বা যাই ভাবিনা কেন, আমরা আজকে সেই শুদ্ধ-আদিমতার যুগে ফিরে যেতে পারি না। আমাদের শিল্প—আলোক এটা খুব সুন্দর করে বলেন—নির্মিত শিল্প, প্রকৃতির শিল্প থেকে আলাদা ক'রে তাকে দেখতে হবে। এখন নির্মিতির দিক থেকে দুটো ব্যাপার দেখতে হবে। একটা ভিতরের এবং একটা বাইরের। বাইরের দিক থেকে আমি ছন্দের বা রূপকল্পের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। একটি বাক্য বা একটি শব্দও যাতে অতিরিক্ত না হয় সেদিকে আমার একটা প্রলোভন। বিশেষণ-জর্জরিত যেন না হই সেদিক থেকে সচেতন যেমন থাকি, তেমনি অন্যদিক থেকে কবিতার কারুকর্ম বিষয়ে কালীকৃষ্ণর ভাষায় হয়তো 'সর্বগ্রাসী' নয়। অর্থাৎ কবিতার যে আন্তর-রূপকল্প—প্রত্যেকটা কবিতাই আমার কাছে নতুন ফর্ম নিয়ে নতুন রূপকল্প নিয়ে আসতে চায়। আমি মেটাতে পারি কিনা আমি জানিনা। আমি জায়মান, নির্মীয়মাণ যে নির্মিতি তাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করি—সেটা আমার বরাবর মনে হয়েছিল। আমি ক্রমশ মানুষের আরো কাছাকাছি আসছি, এসে পড়ছি যেখানে আমি শিল্পরূপকে জীবনের মধ্যে ভেঙে ছড়িয়ে দিতে চাই। রূপকল্প নিঃসন্দেহে কবিতাকে চিনিয়ে দেয় এর মানে এ নয় যে রূপকল্প সর্বস্বতার দিকে কখনো ঝুঁকেছি আমি।

কালীকৃষ্ণ : আচ্ছা এখন অন্য একটা প্রশ্নে আসি যা অনেকের কাছে খুবই জরুরী। আপনি কি ঈশ্বরবিশ্বাসী? অর্থাৎ এরকম মনে করেন যে বস্তুজগতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় এমন কোনো শক্তি আমাদের জীবনকে পরিচালিত করছে? যদি এ বিশ্বাস আপনার থাকে তাহলে আপনার কবিতা বা জীবন যেরকম হয়েছে তা না থাকলে কি অন্যরকম হতো?

অলোকরঞ্জন : এ প্রশ্ন মৃণালও আমাকে করেছে—

মৃণাল : হ্যাঁ এটা আমারও মনে হয়েছে…'যৌবনবাউল' যখন বেরিয়েছিল আমি আর পবিত্র (মুখোপাধ্যায়) দাগ দিয়ে দাগ দিয়ে পড়েছিলাম মনে আছে। তাই যাতেই সম্ভবত ঈশ্বর বিশ্বাস ও চেতনা খুব তীব্র

ছিল। 'ঈশ্বর থাকেন মগডালে' এরকম লাইন ছিল—ঠিক ঠিক সব এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না লাইনগুলো—

কালীকৃষ্ণ : 'বন্ধুরা বিদ্রূপ করে তোমাকে বিশ্বাস করি ব'লে'—

মৃণাল : পরবর্তীকালে এই ঈশ্বরচেতনা, ভাবনা ততটা তীব্র নয়—এটার কারণ কি বিশেষ যুগ, দেশকাল বা সময়ের সংঘাত ?

অলোকরঞ্জন : খুব সুন্দর প্রশ্ন। আমার প্রথম পর্যায়ের কবিতায় ঈশ্বর উচ্চারিত, কখনো কখনো তীব্র বিজ্ঞাপিত। অনেক সময় হয় না, যে প্রবন্ধ বা থিসিস্ লিখতে গিয়ে প্যাডিং-এর দরকার হয়—অর্থাৎ অনেক সময় বে-কায়দায় পড়ে ঈশ্বরকে টেনে এনেছি। ঈশ্বরবিশ্বাস নিয়েই আমি বেঁচে আছি। মার্কসবাদ বা অন্যান্য আধুনিক মতবাদের প্রতি আমার দুর্বলতা সত্ত্বেও ঈশ্বরবিশ্বাসই আমার অস্তিত্বের ভিত্তি। দুটো দিক থেকে ব্যাপারটা দেখা যেতে পারে। প্রথম যে একটা কথা একইভাবে বারবার বলা হলে তার মধ্যে একটা রামপ্রসাদী পুনরাবৃত্তির ক্লিশে এসে যায়। আমার মনে হয়েছে 'যৌবনবাউল'এর পরের থেকেই —এবং তার সঙ্গে মৃণাল একটা ভারি সুন্দর শব্দের চাবি আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন দেশকালের যে ব্যাপার তা তুলে…ঈশ্বর আজকে… আপনারা দেখবেন লাতিন আমেরিকায়, তৃতীয় বিশ্বে বা ভিয়েৎনামে যে ইতিহাস ঘটে গেছে—আপনারা দেখবেন প্রত্যেকটি বিপ্লবের মধ্যেই ঈশ্বর জড়িত, কিভাবে ? না, গোপন আন্দোলনের মতো—আন্ডারগ্রাউন্ড মুভমেন্টের মতো। ঈশ্বর আজকে, আমরা জানি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ঈশ্বর আর নন। আমার আগের কবিতায় যে প্রাতিষ্ঠানিক ঈশ্বরের বন্দনা ছিল—আজকে আমার ঈশ্বর আরো আমার কাছে নেমে এসেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপারগুলো সম্পর্কেই আজ আমার বিশ্বাস চূড়ান্তভাবে ভেঙ্গে গেছে। আমার একেবারে সর্বশেষ বই— তার এই কবিতাটা 'উত্তর কলকাতা—এক ফাল্গুনের ভোরে' এতে লক্ষ করবেন 'কেন হলো, মনে করো তারে/তার পাশে তুমি আমি যুগ্মক মন্দিরা/তার পাশে একটি মন্দিরা একটি মন্দিরা একটি মন্দিরা/ মাঘোৎসবের হিম ভেঙে ঢল নামে বৈতালিক'—আমি মনে করিনা যে এখানে ঈশ্বরের কথা নেই। ঈশ্বরের কথা এখানে আমি অনেক তির্যকভাবে বলি। প্রতিষ্ঠান থেকে ঈশ্বরকে সরিয়ে নিয়ে আসতে চাই। আজ বিকেলেই আমার একটি কবিতা ওল্টাচ্ছিলাম। কবিতাটির নাম 'অপ্রতিষ্ঠ।' আপনাদের অনুমতি নিয়ে পড়ছি

কবিতাটি (পাঠ) : 'বালি দিয়ে ধুয়েছিলাম শরীর / শিরায় জলের খৃস্টান লোকেরা বলে ও কী আর, মুসলমান! / গিয়েছি অচিন্ পটুয়ার কাছে মন্দার ফুলে সদ্য-খোদাই-করা / যীশুর মূর্তি চাই, / পটুয়ার মতো

পৃষ্ঠপোষক বলে দিল 'খৃস্টান'! /…কালীমন্দিরে যাইনি জননী তেরেসার নির্মিত/মুমূর্ষুদের আশ্রয়ে গিয়ে অর্চনা সেরে যখন আসছি ফিরে/লোকেরা বলল 'হিন্দু না, ওকে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে/জলে গোর দিলে ভয়ানক ভালো হতো।' মানুষ কি তবে এতোই প্রতিষ্ঠান? —এটাই আমার এই প্রশ্নের উত্তর। ঈশ্বর-কে আমি প্রতিষ্ঠানের থেকে এনে তাকে আমার গোপনতম প্রেমিকে পরিণত করেছি। …রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রেমের গানইতো পুজোর গান, পুজোর অনেক গানই প্রেমের গান।

কালীকৃষ্ণ: তাহলে স্পষ্টত দাঁড়ালো যে আপনি ঈশ্বর-বিশ্বাসী। এর ব্যাখ্যা অনেক রকম আছে। এ বিশ্বাস আপনাকে আবদ্ধ করে রাখে না। আরো মুক্ত করে। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপারকে অস্বীকার করলেও স্পষ্ট করে জানা গেল যে আপনি নাস্তিক নন।…এরপর দীর্ঘকবিতা লেখার যুগ ফুরিয়ে গিয়েছে…কি যায় নি, এ প্রশ্ন অনেকেই তোলেন। আমি আপনার খুব দীর্ঘ কবিতা পড়িনি, 'তারা দেবী তোমার মন্দিরে' ছাড়া —যদি ওটাকে দীর্ঘ কবিতা বলা যায়। এ বিষয়ে বলুন…

অলোকরঞ্জন: আপনারা হয়তো লক্ষ্য করবেন যে ইদানিং আমি বেশ কিছু দীর্ঘ কবিতার—দীর্ঘায়িত কবিতার দিকে গেছি…জানি না আমার 'অনাথপিণ্ডদ' কবিতাটি আপনারা পড়েছেন কিনা। এখন দীর্ঘ কবিতা এবং দীর্ঘায়িত করিতার মধ্যে একটা তফাৎ করা ভাল। অনেকেই দেখি যে খুব বড়ো কবিতা লেখার চেষ্টা করেন। তার মধ্যে বাগ্মিতার বৃত্তান্তটা একটু বেশি থাকে। দীর্ঘ কবিতার মধ্যে নিশ্চয় একটা ব্রেক-জার্নি থাকে, যেমন কোলরিজ লিখেছেন, ওয়র্ডসওয়র্থ লিখেছেন…

কালীকৃষ্ণ: এলিয়ট লিখেছেন…

অলোকরঞ্জন: বা এলিয়ট লিখেছেন…সেই মর্মে দীর্ঘ কবিতা লেখার দরকার এই জন্য আছে যে এতে লিরিক কবিতার ব্যক্তিগত মেজাজ থেকে একটা মুক্তির ব্যাপার আছে। কবিকে বারবারই দীর্ঘ-করিতা লিখতে হয় হাতে গীতিকবিতা থেকে ন্যারেটিভ্-এ পৌঁছানোর একটা ব্যাপার থাকে। আপনারা হয়তো, কালীকৃষ্ণ-মৃণাল, লক্ষ করবেন আমার বেশির ভাগ দীর্ঘ কবিতার মধ্যে একটা ন্যারেটিভ মেজাজ থাকে— আমি তার মধ্যে একটা আখ্যান বুনে দিই। কিন্তু এটাও ঠিক আমি আখ্যান বুনে দিতে গিয়ে উপন্যাস ঠিক লিখি না, হয়তো কবিতার মধ্যে একটা ছোট্টগল্প আমার ঢুকে যায়—আর যেহেতু আজকের যুগে আমরা সবাই সংবেদনশীল বলে নিজেদের দাবী করি—একটাও অতিরিক্ত কথা তার চেয়েও বড় অবৈধতা আর কিছু হতে পারে না কবিতার ক্ষেত্রে।

তবে সচেতন থাকতে হবে যে দীর্ঘ কবিতায়—যেভাবে এতোকাল চণ্ডীমঙ্গল বা মনসামঙ্গল লেখা হতো সেরকম কাণ্ড যেন না ক'রে বসি। অথবা আত্মপুরাণের অছিলা নিয়ে আমরা যেন আত্ম-কথিকা তার মধ্যে না ছড়িয়ে দিই। সেইখান থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারটা আমার মনে হয় দরকার আছে। শুধুমাত্র আত্মজৈবনিক দীর্ঘ কবিতা—সেটা বোধহয় ঠিক নয়। বস্তুবিশ্বের কাছে আসবার জন্যই দীর্ঘ কবিতার প্রয়োজন। ছোট কবিতা থেকে বেরিয়ে এলেই তাকে যে দেহলির মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেখানে বাইরের পাড়াপড়শীর কাছে দাঁড়াতে হয় —তাকে ঘরের কথা ফাঁস করে বলে দিতে হয় এবং তাকে ঘরের মধ্যে টেনে আনতে হয়। এই বারবার বেরিয়ে আসা, চৌকাঠ ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসা, এই পারাপারটা চলতে থাকে—তখনই দীর্ঘ কবিতা জন্ম নেয়। এবং যতোই কবি যুগ-জাগর হন দীর্ঘ কবিতা, যেহেতু, দীর্ঘ কবিতা সতীর্থ নশ্বরের কাছে মানুষের একটা সাক্ষ্য সেই সাক্ষ্যের দিক থেকে দীর্ঘ কবিতার খুবই দরকার আছে বলে আমি মনে করি।

কালীকৃষ্ণ : অন্য একটা প্রশ্ন করি স্পষ্ট প্রশ্ন···সেটা হলো আপনার এখনো পর্যন্ত প্রকাশিত বইগুলির মধ্যে আপনি কোন্ বইটিকে শ্রেষ্ঠ বই মনে করেন?

মৃণাল : এটা আমারও প্রশ্ন।

অলোকরঞ্জন : জিদ-ও এই প্রসঙ্গ তুলেছেন শ্রেষ্ঠ আবার কী? শুদ্ধ। পাঠক অনেক সময় একটা বই-কে বর্জন ক'রে অন্য বই-কে নির্বাচন করেছেন। আমি প্রথমত 'শ্রেষ্ঠ' শব্দটাতে বিশ্বাস করিনা, আর এও নয় যে কবিতার ক্ষেত্রে আমি তথাকথিত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। যদি প্রতিটি বইয়ের মধ্যেই শুদ্ধতা থাকে—সেই শুদ্ধতার আমি পক্ষপাতী। আমি এটাও মনে করি না যে আমি যা লিখতে চাই সব কথা আমি লিখতে পেরেছি। আমি শুধু দেখি আমার কবিতাকে বিবর্তমান আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে। এবং আমার এই বিবর্তমান চেতনা বা সত্তা, তারই অভিজ্ঞান কবিতার মধ্যে—এই দিক থেকে আমি কবিতাকে ধরবার চেষ্টা করেছি। আমি সত্যিই কোনো বইকেই শ্রেষ্ঠ বই বলে ভাবতে পারিনি। যদি ভাবতে পারতাম, আপনাদের বলতে পারতাম। এধরনের বিচারে আমি বিশ্বাসী নই যে একটা বইকে বেছে নিয়ে অন্য বইকে নস্যাৎ করতে হবে। এইজন্য অজিত দত্ত খুব সাফার করেছেন। বলা হয়েছে 'কুসুমের মাস'-এর পর অজিতবাবু নাকি কিছু লেখননি বা 'পারাপার'-এর পর অমিয় চক্রবর্তী নাকি কিছুই লেখেননি। আমার মনে হয় 'নষ্ট চাঁদ' বাদ দিলে অজিত দত্ত-কে বোঝা যায় না, তেমনি 'পালা-বদল'কে বাদ দিলে অমিয়বাবুকে বোঝা যায় না। এখানে নিশ্চয়ই এ প্রশ্নটা

আসছে যে বোঝার ব্যাপার নয়—ব্যাপারটা হলো কোথায় পৌঁছলো, কোথায় রয়ে গেল কালের দরবারে। আমার মনে হয় এ বিষয়ে কবির কোনো কথা বলা উচিত নয়—যদিও কীটস্ মনে করতেন, কবিই বলে দেবেন তাঁর কোন্ বইটা শ্রেষ্ঠ বা কোন্ কবিতাটি শ্রেষ্ঠ। সেই বিচারটা কিন্তু করবে—আবার পুরোনো কথা বলছি—উত্তরকালের পাঠক।

কালীকৃষ্ণ : হ্যাঁ উত্তরকালের পাঠক হিসেবেই আমার মনে হয়েছে জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ বই 'সাতটি তারার তিমির' যদিও তাঁর প্রায় প্রতিটি বই-ই আমার কম-বেশি প্রিয়। সেইভাবে, আপনার 'রক্তাক্ত ঝরোখা' আমার সব থেকে প্রিয় বই, যদি আমাকে একজন উত্তরকালের পাঠক হিসেবে ধরেন। …ওই বইতে অনেক বিদীর্ণভাবে ভিতরের অনেক প্রশ্নের এক্সজসটিভ্ অ্যানালিসিস্ পাই…ওটাই আমার কাছে এখনো শ্রেষ্ঠ কবিতার বই।

অলোকরঞ্জন : 'রক্তাক্ত ঝরোখা' থেকে আমি এখন যে ধারায় এসেছি সেই ধারার সঞ্চারটা অন্তত অংশত 'রক্তাক্ত ঝরোখা' থেকেই এসেছে, অর্থাৎ নিজেকে দীর্ণ দীর্ণ করে দেখা। কিন্তু, এই প্রসঙ্গে বলি, 'রক্তাক্ত ঝরোখা'-র যেসব সমালোচনা আমার কাছে আছে—আমার সহধর্মীদের —তা অত্যন্ত ধিক্কার ব্যাঞ্জক। সেই 'চতুরঙ্গ' পত্রিকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় অ্যাকাডেমিক মহল শুধু না রীতিমত শিল্পীমহল থেকেও অজস্র গঞ্জনা আমাকে সহ্য করতে হয়েছে। এমনকি ছন্দেও লেখা হয়নি, এরকম বলা হয়েছে।

কালীকৃষ্ণ : এর কারণ হচ্ছে, অলোকদা, যে 'রক্তাক্ত ঝরোখা' এতোই বিশিষ্ট, এতোই আলাদা ধরনের একটা সংযোজন যে routine readers বা সাধারণ পাঠক, তাদের পক্ষে এই বইটাকে নেওয়া খুব মুশকিল ছিলো …এবং তারাই কলম হাতে নিয়ে কাগজ সামনে নিয়ে ব'সে থাকেন সব জায়গায়। স্বভাবতই, এর দ্বারা কিছুই প্রমাণ হয় না।

অলোকরঞ্জন : আমার মনে হয় নিরীক্ষাধর্মী বিবেক যে কবির নেই তার এ মুহূর্তেই ছেড়ে দেওয়া উচিত কবিতা লেখা।

কালীকৃষ্ণ : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন, 'আমার লেখার কথা যদি ফুরিয়ে যায় তাহলে আমি লিখবো না, বা ছেড়ে দেবো…' এবং ছেড়ে দিয়েছেন এমন লোকও আছেন। আপনি কি কখনো এরকম ভাবেন যে বলবার কথা ফুরিয়ে গেলে ছেড়ে দেবেন বা ফুরিয়ে যাবে এমন কোনো আশংকা… আপনার কি কখনো হয়?

অলোকরঞ্জন : সুধীন্দ্রনাথের ওই 'যা বলার ছিলো কবে হয়ে গেছে বলা সে'— এইটে তাঁকে বলতে হয়েছিল—এমন নয় যে তাঁর তখন বক্তব্য ছিলো না।

আপনারা জানেন আমি তাঁর একজন অনুজপ্রতিম সতীর্থ ছিলাম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। অনেকবার তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। তাঁর কবিতা যখন নতুন বাঁক নিতে শুরু করেছে 'দশমী'র পর, যখন তিনি নতুনভাবে সময়ের কাছ থেকে দীক্ষা নিচ্ছেন,—তরুণ কবিদের দিকে তাকাচ্ছেন, তাদের লেখা পড়ছেন…নিজের যে তৈরি একটা আইসোলেশন ছিলো, যে ধর্মবিভাজনের মধ্যে ছিলেন, তার থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। এমনকি তিনি আবৃত্তি প্রতিযোগিতার বিচারক হবার জন্য তখন স্বপ্ন দেখতেন। বলতেন, 'আমাকে তোমরা নিয়ে যাবেনা ?' এইসব…তখনই তাঁর মৃত্যু হলো। এরকম অকালমৃত্যু আমি কল্পনা করতে পারি না। সুধীন্দ্রনাথের কথা ফুরিয়ে যায়নি আমরা জানি। তাঁর ভাণ্ডার ছিলো অনিঃশেষ। ওটা একটা বিনয়ের ব্যাপার। আমি দেখি, আমাদের কবিতাপাঠকদের এই অদ্ভুত একটা ব্যাপার আছে যে কবির ছদ্ম-উক্তিকে, সুইডো স্টেটমেন্টকে, ধরে নেন ওটাই তাঁর একমাত্র কথা। অনেক মহৎ কবি বলেন, 'এখন আমি কিছু লিখতে পারছি না।' অমনি পাঠক বলবে, 'ওই দ্যাখো, বললো তো!' দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, কবিতায় কথা বলার যদি না থাকে সেদিন লিখবো কিনা। এর দুটো দিক আছে। হাজার কথা বলার থাকলেও যেমন ভালেরির কুড়ি বছর সময় নিয়েছিলো, না লেখার মধ্যেও লেখা হতে থাকে। আমাদের দিনের মধ্যে অনেক লাইন তৈরী হতে থাকে যাকে আমরা স্থান দিই না কবিতায়…প্রত্যেকদিন অজস্র লাইনের জন্ম হয়, অজস্র চিত্রকল্প এসে মাথা খোঁড়ে চৈতন্যের চৌকাঠে, কিন্তু সেগুলিকে আমরা গ্রহণ করিনা। কাজেই বক্তব্য ফুরিয়ে কখনো যায় না। বা বক্তব্য ফুরিয়ে গেলেও কেউ যদি কবিতা লেখা সাময়িক স্থগিত করেন, সেটা মনে রাখতে হবে, পরবর্তী প্রকাশের নির্মিত হিসেবেই তাকে দেখতে হবে। এখন এটাও ঠিক—আমি আবার ডেকে আনছি সেইসব বন্ধুদের—সেই কীটসের কথা যে, কোনো বড় কবিও বলতে পারেন না যে কালকেও তিনি কবিতা লিখতে পারবেন। কারণ, কবিতা একটা constellation-এর ব্যাপার—একটা অতীন্দ্রিয় সন্নিবেশের ব্যাপার। নিশ্চয়ই ইন্দ্রিয়লোককে বাদ দিয়ে নয়। এবং এই যে পরিণামী সন্নিবেশ, তা যদি না ঘটে যেমন বলি, বিষ্ণু দে-র সাম্প্রতিকতম লেখাগুলি আমার কাছে পাংশু মনে হয়…যদি তিনি তাঁর লেখা একটাও আর প্রকাশ না করেন,—আমি তাঁর একজন রীতিমতো ভক্ত পাঠক হিসেবেই বলবো মনে করব যে, ঠিক আছে, বিষ্ণু দে-র কাজ শেষ হয়ে গেছে। আত্ম অতিক্রান্তি না হ'লে আমার মনে হয়, যে কবি থামিয়ে দেন। আরও একটা কারণ থাকতে পারে কবিতা যতো বড়ো

হোক, জীবন তার চাইতেও অনেক বড়ো। কবিতা আমার কাছে সৃষ্টি ও সংস্কৃতির চূড়ান্ত বাহন। হয়তো এই শতকের সবচেয়ে বড়ো বাহন হচ্ছে ফিল্ম। পুশ্‌কিনের কবিতাও বলা হচ্ছে ফিল্মের উপাদানে আক্রান্ত। যেমন, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ বলেছিলেন, উপন্যাসের মধ্যে সমস্ত রূপকল্পের মিলন আছে, কবিতার মধ্যেও আমার মনে হয় সমস্ত রূপকল্প মিশে আছে। কবিতাই হচ্ছে শিল্পের প্রথমতম উৎস এবং শেষ পর্যন্ত কবিতাই থাকবে। কিন্তু কোনো কবি, অনেক সময় আমরা দেখি যে সাধু হয়ে যান কবিতাকে ত্যাগ ক'রে। তাঁকে তিরস্কার করা যায় না। কোনো কবি পুরোপুরি জীবন-যাপনের যজ্ঞে ঢুকে যান—এই যজ্ঞ ছাড়া কবিতা লেখার কোনো মানে নেই। কবিতার মধ্যে আমরা একটা রিচুয়ালাইজেশন দেখি—'পার্বণীকরণ' এই শব্দটা যদি আপনারা গ্রহণ করেন। এই পার্বণে যদি কেউ যেতে চায়—রবীন্দ্রনাথের সেই চন্দ্রহাসের মতন…জীবন সরকারের মতন…যদি সে বাঁচতে, বাঁচাতে মানুষকে সাহায্য করে…যদি সেই মর্মে সে একদিন কবিতাকে ছেড়ে দেয়—সেই ছেড়ে দেওয়াটা পরিত্যাগ করা নয়, নিজের প্রেমিকাকে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্জন করা।

মৃণাল ঃ অনেক আলোচনাই হলো, অলোকদা, এবার একটু আপনার কবিতার ছন্দ নিয়ে আলোচনা করা যাক। ছন্দের ব্যাপারে আপনি যে কত নিপুণ ও সিদ্ধহস্ত তা আমরা সবাই জানি। এ নিয়ে আপনার সঙ্গে বিতর্ক বা আলোচনায় নামাটাই একটা ধৃষ্টতা। অনেক সময় আপনার কবিতা পড়তে গিয়ে কানের কাছে ছন্দ ঠিক লেগেছে, কিন্তু বিজ্ঞানের বা নিয়মের দিক থেকে unconventional মনে হয়েছে। যেমন ধরুন 'ছো-কাবুকির কাব্য' বইটির 'নিসর্গ নার্সারি' কবিতাটি। পড়ছি ঃ 'তাল গাছের ছায়ায় আছে বেহুঁশ ছেলেমেয়েরা / লুডো খেলার চতুরঙ্গে মেতে / ওরা সবাই তোমার শিশু আহাহা তুমি রাগ কোরো না / ওদের কজন তোমার নিজের / কজন তোমার মেজো জায়ের'…এই কবিতাটি, এর মধ্যে আমার কখনো কখনো মনে হয়েছে স্বরবৃত্তের বা ছড়ার ছন্দের একটা ঝোঁক বা টোনু আছে এবং আছেই…কিন্তু কোথাও কোথাও পাঁচমাত্রার মাত্রাবৃত্ত, কোথাও ছয় মাত্রার। ছয় মাত্রা যখন accurately থাকছে তখন স্বরবৃত্তের সঙ্গে মেলাতে পারছি না। অথচ টোটাল কবিতাটি পড়তে কোনো অসুবিধে হয় না। আমার প্রশ্ন, আপনি একে স্বরমাত্রিক ছন্দই বলবেন তো? তাহলে কেন দুয়ের মিশ্রণ?

অলোকরঞ্জন ঃ এটা একরকম স্বরমাত্রিক ছন্দই বলা যায়—একে স্বরবৃত্ত হিসেবে পড়া যায়, মাত্রাবৃত্ত হিসেবেও পড়া যায়। যেমন মাত্রাবৃত্তের সুন্দর উদাহরণ দেখেছি নীরেন্দ্রনাথের কবিতায় ঃ 'এখানে কেউ আসেনা

ভালোবাসেনা কেউ প্রাণে'—সেই সময়কার সবক্ষ্মতিধার্য কবিতা। আর স্বরবৃত্তে তো উদাহরণ রয়েছেই। এতে যে গভীরতম কথা বলা যায় রবীন্দ্রনাথই তা প্রমাণ করে গেছেন।...এখন একটা ছন্দের সঙ্গে আরেকটা ছন্দের সম্পর্ক...স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের সম্পর্ক আমাদের কবিতার ইতিহাসে, অন্তমধ্য যুগে, যখন 'ধামালি' ছন্দ লেখা হচ্ছে, যখন বৈষ্ণব কবিতা লেখা হচ্ছে—দুটো এক হয়ে গেছে। প্রাচীন সমস্ত ছড়ার ছন্দে, যেমন 'কাজী ফুল কুড়োতে কুড়োতে পেয়ে গেলাম মালা,' এইসব জায়গায়...যেমন 'যমুনাবতী সরস্বতী' এখানে পাঁচ মাত্রা আসছে এবং এখানে আসছে চার...এইটে রাখার আগ্রহেও বটে এবং দুটো ছন্দের মধ্যে একটা টানা-পোড়েন তৈরী ক'রে—সেটা তো রবীন্দ্রনাথ করেছেন। 'ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি'—এটা একেবারে স্বরবৃত্ত হিসেবেই পড়া যায়।...'ধূ-র্-জ-টি-র' আমরা এভাবে পড়ব না, তাই না? আমরা রেফ্ দিয়েই পড়ি। আবার 'সাগর জলে সিনান করি সজল এলো চুলে'—এখানে আমরা লক্ষ্য করছি এই দুটো মেশানো রয়েছে। কিন্তু যেটা প্রবোধচন্দ্র সেন দেখিয়েছেন 'বিহঙ্গ গান শান্ত তখন অন্ধকারের পক্ষ ছায়'...আমি বলবো মূল ঠাট্‌টা এখানে স্বরবৃত্তের 'এর মধ্যে এক চক্কর পাক'টাকে ঘুরবে চলো/ওরা ভীষণ ঘৃণা করছে/মানে শিশুরা' এখানে 'মানে শিশুরা' আমি পাঁচ মাত্রায় রেখেছি এবং ওটাকে একটা প্যারানথিসিস্-এর মধ্যে রেখেছি। এবং ইচ্ছে করেই...আমার মনে হয় ওই দুটি ছন্দ খুব কাছাকাছি চলে আসে।

মৃণাল : তাহলে আমি যেটা বলছি, এটার মধ্যে স্বরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত...

অলোকরঞ্জন : হ্যাঁ...হ্যাঁ, স্বরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্তের একটা টানা-পোড়েনে একটা ডায়ালেকটিক...

মৃণাল : যেমন ধরুন এই 'আহা হা তুমি,' এটা বিশুদ্ধ মাত্রাবৃত্তের চাল...

অলোকরঞ্জন : ব্যাণ্টারিং-এর একটা ব্যাপার আছে—'একদা তুমি'—এই 'একদা'র ওপর জোরটা আছে বলেই আমি ওটা রেখেছি...এটা অনেকটাই ইচ্ছাকৃত এবং যদি তাতে কানে না বাধে তাহলে বোধহয় আপত্তি থাকবে না। এরপরে যে 'তুষতুষুলি' কবিতাটা—একেবারে একটা ইউনিট-এর কবিতা...যেমন 'শরীরী' শব্দটা...

মৃণাল : এতে কোথাও কোথাও একটা অসামান্য গতি পেয়ে যাচ্ছে। আমরা যারা ছন্দে কবিতা লিখি তারা বুঝি এটা। এখন একজন ছন্দের ছাত্র বা একজন ছন্দের বিজ্ঞানী বলে দেবে স্বরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত একসঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে না।

অলোকরঞ্জন : আমি তাকে বলবো, যখন স্বরবৃত্ত প্রথম শুরু হয়, দুটো ছন্দ পিঠোপিঠি ভাইবোনের মতো অদ্ভুতভাবে কাছাকাছি রয়ে গেছে।

হার্ডার বলেছিলেন, ছড়াগুলো থেকেই শেক্সপীয়রের কবিতার জন্ম (এই ছড়াগুলির মধ্যে আমার মনে হয় আমাদের বোধ-অবচেতনা এমনভাবে লুকিয়ে রয়েছে যে আশ্চর্য), বলা যায় এই মর্মে সাহস পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে—এটাই বড় কথা…

কালীকৃষ্ণ : আমি একটু কেড়ে নিয়ে বলছি—যদিও মৃণাল যতো ছন্দ বোঝে আমি সেরকম বুঝি না বা আপনি তো এ ব্যাপারে মাস্টার—আপনার ওই কবিতাটি : 'পাখিটির মাতৃভাষা চেয়ে থাকা'…। এখন এই কবিতাটি কোন্ ছন্দে লেখা? আমরা অনেক ভেবে…আমি ও পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল—ও ছন্দের ব্যাপার ভীষণ ভালো বোঝে—ঠিক করেছিলাম, এটার ঠাট্-টা মাত্রাবৃত্তের যেহেতু, এটাকে ৯ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত বলা যায় কিনা; যদিও ৯ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত কিছু স্বীকৃত জিনিস নয়। অথবা আমার নিজের বক্তব্য প্রথম শব্দটা 'পাখিটির' অতিমাত্রা হিসেবে পড়ে পরের অংশ পাঁচ-মাত্রার মাত্রাবৃত্ত বলা হবে কিনা…

অলোকরঞ্জন : এই কবিতাটির মধ্যেও মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্তের মিলন অন্যভাবে রয়েছে। 'পাখিটির'-টা অতিপর্ব নয়। ওখানে জোর দেওয়া হয়েছে। এবং একটা শ্বাসাঘাত তৈরী হয়েছে, ক'রে একটা শ্বাসযতি রাখা হয়েছে। ওটা অনেকটা মাদলের ছন্দ। এখানে 'পাখিটির' মূল চরিত্র কবিতাটি। অরুণ সরকার-ও আমাকে বলেছিলেন, 'তখনই পাখিটি-কে চোখে পড়ে যায়।' একদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদর্শনী করেছিলাম আমরা—তখন বলেছিলেন। এখন 'নয় মাত্রার ছন্দ' আমি এভাবে বলবো না। এখন 'ব্যাকুল বকুলের ফুলে / ভ্রমরা মরে পথ ভুলে'—এগারো মাত্রার ছন্দ। এই অর্থে নয় মাত্রা এখানে নেই। এখানে রয়েছে 'পাখিটির' মধ্যে তিনটি স্বরমাত্রা, 'মাতৃভাষা'-য় চার মাত্রা। তিন আর চার-এর চালটা এখানে রয়েছে, আমার মনে হয়। এখানে লাইনটাতো স্পষ্ট স্বরবৃত্তের উদাহরণ।

মৃণাল : এটা পরিষ্কার। কালীকৃষ্ণ আমাকে আজ সকালেই বলেছিল—'এখানে অরণ্য' এটা আপনি স্বরবৃত্তে লিখেছেন। 'সবুজ ডেকেছে বান পাহাড়ের খাদে'—এটার বেলায় ও বলছিল : 'এখানে এসে আমি হোঁচট খাচ্ছি।'

অলোকরঞ্জন : এখানে একটি মধ্যখণ্ডন আছে।

মৃণাল : 'এখানে অরণ্য অরণ্যে শুধু কাঁদে' আমার কাছে ঠিকই লাগছে…। কালীকৃষ্ণ বলছে 'এখানে অরণ্য অ'—এই ব্যাপারটা—

অলোকরঞ্জন : 'এখানে অরণ্য অ/রণ্যে শুধু কাঁদে' এইটে রয়েছে তো? রয়েইছে। এখানে একটা চতুরালি ছিলো। বড় অরণ্যে দেখা যায় গাছ গাছালির

মধ্যে একটা গাছ আরেকটা গাছের মধ্যে ঢুকে গেছে…এই ব্যাপারটাকে আনবার জন্য আমি একটা শব্দকে অরেকটা শব্দের মধ্যে প্রায় ঢুকিয়ে দিয়েছি…

মৃণালঃ এখানে একজন ছন্দের ছাত্র ৮/৬ স্ক্যান করবে, না ৭/৬ করবে?

অলোকরঞ্জন ঃ যদিও 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান' এভাবে ঠিক পড়া যাচ্ছে না। কেনই বা ওভাবে পড়বো? এধরনের কবিতা নীরেনবাবু খুব সুন্দর লিখেছেন ঃ 'মম তুমি কোনোদিকে চেয়ো না চেয়ো না'… এখানেও দুরকম ছন্দ মিশছে। 'আজ ছিল ডাল খালি/কাল ফুলে যায় ভরে'—দুভাবেই তো পড়া যায়।

মৃণাল ঃ মাইকেলেরও রয়েছে এরকম, যেমন মেঘনাদবধ কাব্যে ঃ 'কাটিলা কি বিধি শাল্মলী তরুবরে।'

অলোকরঞ্জন ঃ মধুসূদনই শুরু করেন এই মধ্যখণ্ডনের ব্যাপারটা…

কালীকৃষ্ণ ঃ তাহলে কি শেষ হলো আমাদের কথা?

মৃণাল ঃ আরেকটা প্রশ্ন। প্রশ্নটা এমবারাসিং…আপনার কবিতার কোনো প্রভাব পরবর্তীকালের কবিদের মধ্যে যেমন সুনীল বা শক্তির বিপুল প্রভাব দেখা যায়…সেই অর্থে আপনার কবিতার প্রভাব…যদিও আপনি অনেক স্মৃতিধার্য অসামান্য কবিতা লিখেছেন এবং আমরা কবিতার গুণমুগ্ধ পাঠক…তরুণ কবিদের মধ্যে সেরকম কোনো প্রভাব পাইনা…আপনি কি মনে করেন, এখন না হলেও ভবিষ্যতে আপনার কবিতার উত্তরসূরি তৈরী হবে বা আপনি এই জাতীয় কোনো মতে বিশ্বাস করেন কি না…

অলোকরঞ্জন ঃ শক্তি-সুনীলের দ্বারা বিভাবিত অনেক তরুণ কবি কবিতা লিখেছেন—সেসব কবিতার মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে আমি সার্থকতা দেখেছি…এতে ধরে নিতে হবে এঁদের কবিতার মধ্যে নিঃসন্দেহে মহৎ কবিতার লক্ষণ আছে। এখন আমার কবিতা—এটা অস্বস্তিকর প্রসঙ্গ—প্রভাবিত করেনি…আমার লক্ষ্য তো কখনো ছিল না যে আমার কবিতা প্রভাবিত করে। আমি চেয়েছি আমার কবিতা বিভাবিত করে। আমি জানি না কবিদের কথা, তবে যারা তথাকথিত সাধারণ মানুষ, তাঁদের অনেকের কাছেই আমার কবিতা খুব বিনীত-ভাবে লক্ষ্য করেছি এবং অভিভূত হয়েছি—তাঁদের বাঁচার বিন্যাসে বিভাবনা একটা এনে দিয়েছে। আমি কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা কথা বলবো যে প্রভাবিত করাটা বোধহয় কবির লক্ষ্য হতে পারে না। জানিনা ভবিষ্যতে আমার কবিতা কাউকে প্রভাবিত করবে কিনা। তবে এটা আমি মেনে নেবো না যে আমি একটা স্বতন্ত্র অন্তরীপ হয়েছিলাম। আমি লক্ষ্য করেছি যে আমার অনেক বাক্‌রীতি

পরবর্তী কবিতার মধ্যেআশ্চর্যভাবে ঢুকেগিয়েছে। অনেকের মধ্যেইআমি লক্ষ্য করেছি। প্রভাব বলতে ঠিক বাইরের বা শরীরী প্রভাব আমি খুব দেখি নি। কিন্তু অন্তঃশরীরী প্রভাব আমি অনেকের মধ্যেই দেখেছি। আমার অনেক বাক্‌রীতিই মুখে মুখে চলে এবং লোকে জানে না যে সেগুলি আমার…এবং তাতে আমি অনামিকতার সম্মানে নন্দিত। সেটাই তো শিল্পের একটা বড়ো লক্ষ্য। অজন্তা ইলোরার শিল্পীদের তো, খুব একটা 'সুস্নিগ্ধ স্নবারি' আমি করছি,—নাম-টাম লেখা নেই।

মৃণাল : আরেকটা কথা, আপনাদের পরবর্তীকালের…ষাট…সত্তর… আপনার এঁদের সম্বন্ধে কী জাতীয় ধারণা জম্মাচ্ছে…এ ব্যাপারটা আপনি ঠিক এড়িয়ে যাবেন না…একটু critically বলুন।

আলোকরঞ্জন :…ষাটের কবিরা এখন অনেকেই প্রতিষ্ঠিত এবং তাদের কয়েকজনের প্রতি রীতিমতই সস্নেহ দুর্বলতা আমার আছে। আমি পঞ্চাশের কবিতার সঙ্গে জড়িত তবু আমি সত্যিই কিন্তু ষাটের কবি। মুশকিল হচ্ছে প্রশংসা ছাড়া সমালোচনা করতে গেলে, শুধু প্রশংসা করতে গেলেও একটা মোটিভেশন তার মধ্যে আনা হয়। আমি বিশেষভাবেই মনে করি যে 'ষাট' স্পষ্টই এগিয়েছে। এটা ঠিকই যে আগাছা তৈরী হয়েছে গত কয়েক বছরে বাংলা কবিতায়, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবু সম্প্রতি কোনো কোনো ছোটো ছোটো পত্রিকায় যেমন 'হীনযান'—এর সুভাষ ঘোষালের ভারি আশ্চর্য একটি প্রোডাক্‌শান হয়েছে অঞ্জন সেনের একটি বইয়ের…গণেশ পাইন কাজ করেছেন…এরা কিন্তু চেষ্টা করছে একটা অন্য কোনো প্রকাশভঙ্গি, যেটা পূর্বসূরিদের মধ্যে ছিলো না। এরা চেষ্টা করছে আত্মসন্ধানের মাধ্যম করতে…সব হয়তো সার্থক হচ্ছে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কালীকৃষ্ণর কথায় ফিরে আসি, নিজের হৃদয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ গাহন ক'রে সেই লেখাতো আর চিরস্থায়ী হতে পারে না—এখন একজন দ্বিজ চণ্ডীদাস আর জন্ম নিতে পারেন না। তাকে এ যুগের সমস্ত মন ও মননের সমস্ত শাপলা শিকড় সাঁতরিয়ে সূর্য-কে স্পর্শ করতে হবে। সেজন্য চাই প্রচণ্ড রকম পড়াশুনো…যাকে বলে বইয়ের পোকা হয়ে যাবার যে ব্যাপার। আমিয়েলের জার্নাল না পড়লে রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্র লিখতে পারতেন না। অথচ ছিন্নপত্রের মতো সাবলীল বই আর কিছু আছে? আমি আমার ছুটির অনুষঙ্গী হিসেবে আমিয়েলের জার্নাল নিই না, নিই ছিন্নপত্র। আমি লক্ষ্য করছি সাধারণভাবে বলতে গেলে তরুণতম কবিদের মধ্যে একটা মস্তবড় আপেক্ষিক ত্রুটি এই যে তারা পড়াশুনোটা কম করেন…

তাঁদের সমকালীন যে শিল্পী তাঁদের ছবি দেখেন না, গান-বাজনা শোনেন না ···তাঁরা হয়তো ফিল্ম সোসাইটির একটা ছবি কখনো দেখে এলেন, কিন্তু সব মিলিয়ে পড়াশুনোর একটা পারম্পর্য তাঁদের হয়তো নেই। ফলে তাঁদের কবিতার একটা বড় অংশ বেশ বড়রকম মার খাচ্ছে।

কালীকৃষ্ণ ঃ ···অনেকে ভাল লিখছে, যেমন মৃদুল বা রণজিৎ। অঞ্জনের বইটা উল্লেখযোগ্য যেহেতু গণেশ পাইনের কাজ আছে··· ···আরেকটা কথা বলি, কবিতা লেখাটা এখন আর শুধু কলকাতা শহরকেন্দ্রিক নয়, অনেক মফঃস্বল শহরের কবিরাও লিখছেন ভালো কবিতা এবং পড়াশুনো তারাও করছেন কিছু কিছু—সব থেকে বড় কথা, আমার মনে হয় একটা সচেতনতা এসেছে—'আমি কবিতা লিখি অতএব আমি ছবি দেখবো এবং বুঝবো' এটা কিন্তু আছে। পড়াশুনোও একেবারে করছে না ছেলেরা তা নয়....আড্ডাতেও অনেকটা পুষিয়ে নিচ্ছে।

অলোকরঞ্জন ঃ আপনি যাদের নাম বলছেন তাদের কবিতা ·· রণজিতের এবং আরও কারো কারো কবিতা আমি রীতিমতো মন দিয়ে পড়ি এদের অনেক লাইনও আমার মুখস্ত।....কিন্তু তবু মনে হয় পড়াশোনার যে গভীর বলয়টা তৈরি করা উচিত তা কিন্তু হচ্ছে না। কী পড়াটা হচ্ছে সাধারণতঃ? যা বাংলা কবিতা লেখা হয়ে গেছে সেইটে পড়া। কিন্তু আগেকার কবিতা? সেইটে কতদূর পড়া হচ্ছে আমি জানিনা....বিশ্ব-কবিতা? বিশ্ব-কবিতা শুধু না, যেসব ভাবনা চিন্তার মধ্য থেকে তা উঠে এসেছে....আমি বলছি দার্শনিকতা কবিতায় থাকতে হবে তা না.... কবিতার ভেতর থেকে যে দর্শনটা উঠে আসে সেইটেই কবিতার দার্শনিকতা।....কবিতা ও দার্শনিকতায় আলাদা কোনো ক্যাটিগরি আমি করতে চাইনা....যেটা কোলরিজ খুব সুন্দর বলেছিলেন 'অনুভূত চিন্তন' —felt thought, সেইটেই। সেইদিক থেকে চিন্তনের প্রক্রিয়াটা কিন্তু আমার অনেক সময় চোখে পড়ে না ...অনেক সময় মনে হয় একটা সোনালী উর্ণনাভ নিজেকে ঘিরে একটা জাল বুনে চলেছে....এরা ভয়ংকর বেশি আত্মকেন্দ্রিক....এদিক থেকে মফঃস্বলের থেকে যারা লিখছেন—কলকাতার ঠিক বাইরে থেকে—তাঁদেব সম্বন্ধে দুর্বলতাটা আমার বেশি।

মৃণাল ঃ সব কথাই আলোচনা হলো। এবারে বলুন চল্লিশের কবিদের সম্পর্কে···যাঁরা এখনও লিখে চলেছেন নিরলসভাবে···যেমন নীরেনবাবু, বীরেনবাবু,...অরুণ ভট্টাচার্য প্রমুখ···

অলোকরঞ্জন ঃ অরুণ ভট্টাচার্যকে খুবই অবজ্ঞা করা হয়েছে···

মৃণাল ঃ হ্যাঁ অরুণ ভট্টাচার্য ···আমার মনে হয় অরুণদার assesmentও ঠিক হয়নি ···

অলোকরঞ্জন ঃ এঁদের কাছে তো আমাদের ঋণ আছেই, এঁদের কবিতা আমি পড়ি এঁরা তো পূর্বসূরি। বীরেনদা তো পবিত্র অর্থেই একজন অনিঃশেষ পাগল, প্রায় দিব্যোন্মাদ·· তিনি কবিতা চূড়ান্তভাবে লিখছেন। আমার বীরেনদার শেষ বইটি 'আর এক আরম্ভের জন্য' খুব একটা ভাল লাগেনি—জানিনা ওটাই বীরেনদার সর্বশেষ বই কিনা—হয়তো দেখবো গতকালই একটা বই বেরিয়ে গেছে··· বীরেনদাকে বিশ্বাস নেই···এঁর মধ্যে টপিক্যালিটি এতোই বেশি যে আরো একটু নির্বাচন করলেও পারতেন···তবু ঐ কবিতাগুলির ভাষান্তর ঘটাতে গিয়ে দেখলাম বীরেনদার মধ্যে বড়ো কবির সমস্ত ব্যাপার আছে। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছন্দের যে-মসৃণ জগৎ তৈরি করেছিলেন, সেখান থেকে ভেঙে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন তিনি, নিজেকে নিরীক্ষা-বিক্ষত হতে দিয়েছেন। আরেকটা জিনিস, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে যে ধরনের সমকালীনতা আছে, নীরেন্দ্রনাথের মধ্যে সে ধরনের সমকালীনতা নেই—তাঁর সমীপকালীনতা অন্য ঠামের। আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের নান্দনিক তৃষ্ণা মিটিয়ে দিয়েছেন, আরো অনেকের কবিতাই তেমন মেটায় না। 'সকলেই পাঠক নয়, কেউ-কেউ পাঠক', তাঁর ওই উক্তিটি এই প্রসঙ্গে আমাদের নাড়া দেয়। বাংলা কবিতায় অদীক্ষিত পড়ুয়া তাঁর কবিতা পড়ে পাঠক হয়ে উঠেছেন। তাঁর এখনকার কবিতায় সম্ভবত আবার ভিতরদিকের এষণা নতুন করে দেখা দিচ্ছে। মঙ্গলাচরণ সম্পর্কে আমি অভিযোগও করেছি · উনি থামিয়ে দিয়েছেন, আর পারছেনই না···সমর সেনের মতনই তবে উনি কিছু অসামান্য কাজ করেছেন বাংলা কবিতায়। অরুণ ভট্টাচার্য আমি লক্ষ করছি, গত কয়েক বছরে খুবই জড়িয়ে পড়েছেন বাংলা কবিতায়। যে motto-টাকে উনি ব্যবহার করছেন ঃ 'র‍্যাঁবো নয়, রামপ্রসাদ · তাকে আমার জনসঙ্ঘের মতো জঙ্গী motto মনে হয়েছে ····যদিও ওঁর মতো আশ্চর্য আন্তর্জাতিক মন কম কবিরই আছে ·· তবে ওঁর কবিতার ভেতর একদিকে সামাজিক বোধ বেড়ে গেছে, আর সেই সঙ্গে নিঃসঙ্গ সত্তাটা···উনি খুব শুদ্ধ রয়ে গেছেন বলে আমি মনে করি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক কবিতা আমার কাছে 'বানানো' বলে মনে হয়েছে···দুঃখের সঙ্গে বলছি···এমন কি 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত'-এর মধ্যের একটা ইস্তাহার এসে আমাকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে যায়···এই ব্যাপারটা ছিলো···ট্রান্স ছিলো···মনে হয় ওঁর ঝুলি বোধহয় উজাড় হ'য়ে গেছে···এখন ওঁকে ঝুলি ভরতে হবে।

কালীকৃষ্ণ : সব ছাপা হবে কিন্তু।

অলোকরঞ্জন : নিশ্চয়ই···

কালীকৃষ্ণ : ওঁর 'যাচ্ছি' কবিতাটা পড়েছেন? 'ওগো পানের খিলি, যাচ্ছি' ইত্যাদি।

মৃণাল : বোধ হয় এই কবিতাটি সুভাষদার শেষতম কাব্যগ্রন্থের। কোথায় যেন নিজেকে একধরনের নিবেদনের ব্যাপার আছে···একটা resign করার ব্যাপার আছে....একটা বিদায় নেওয়ার প্রস্তুতি বা ঘোষণা এবং যেন ঈশ্বর বিশ্বাসের একধরনের আভাস, ইঙ্গিত অনুভব করা যায়....ঠিক সুভাষদার মতো একজন মার্কসিস্ট-এর পক্ষে এটা যেন অন্যধরণের একটি উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা···এটা মনে হয় কবিতাটি পড়লে ···একটা compromise করছেন সুভাষদা···

কালীকৃষ্ণ : কেন মার্কসিস্টরা কি resign করতে পারে না?···বা···

অলোকরঞ্জন : কেন এটা হচ্ছে বুঝতে পারছি···। আমি একসময় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের খুব কাছাকাছি থেকেছি। দলের মধ্যে থেকেও উনি খুব একা মানুষ, নিঃসঙ্গ। আমার মনে হয়, সুভাষদার দলের সঙ্গে তাঁর যে বোঝাপড়া···সে জায়গাগুলোতে তাঁর যে অতৃপ্তি রয়েছে তাই ফুটে উঠেছে তাঁর শেষ বইতে···অথচ ওঁর যে ইমেজটা তৈরি হয়েছে 'ফতোয়া দেবার কবি' সেটাকে পুরোপুরি ভাঙতে পারছেন না উনি···এই দুটোর ভাঙাচোরার ভিতর থেকে একটা উত্তরণ নিশ্চয় ওঁর বেরিয়ে আসবে, আসছে···আর তিনি ভয়ংকর কম লেখেন আজকাল এবং কম লেখার এই একটা অসুবিধে যে নিজেকে ভেঙেচুরে দেখা যায় না।

মৃণাল : আজকের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো আরো কিছু প্রশ্ন আসবে যা পরে আবার আলোচনা করা যাবে। আজ এখানেই শেষ করি আমরা···বেশ দীর্ঘ আলোচনা হলো আমাদের।

অলোকরঞ্জন : হ্যাঁ, এটাতো একটা বুনিয়াদ··অনেক শিকড়সংলাপ হচ্ছিল।

———